নব্যভারত

মাসিকপত্র ও সমালোচন।

শ্রীদেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত।

ষষ্ঠ খণ্ড—১২৯৫।

১০।৪ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, নব্যভারত কার্য্যালয় হইতে
সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা

সভাবাজার, ৩৬ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, সমর্থকোষ প্রেসে,
সেন এণ্ড সন্‌স্‌ দ্বারা মুদ্রিত।

প্রভ হয়। মাঝে মাঝে দুঃখ জুটিলে সুখের সৌকীনতা বৃদ্ধি হয়। একটু ছোট ঢেউয়ের পরেই একটা বড় ঢেউ আসে। তাই প্রেমের বিরহ। বিরহ প্রেমের ব্যভিচারী নহে, সানুকূল। সে নবদূর্ব্বাদল শ্যামরূপ এখন আর প্রত্যক্ষ নহে। রূপের পরিবর্ত্তে হরি-নাম রাধার হৃদয়-সিংহাসন অধিকার করিল। ভাবের অভাব পূর্ণ করিতে পূর্ব্ব-স্মৃতি প্রাচীন কাহিনী উত্থাপন করিতে লাগিল—কিছুতেই রাধার প্রাণ ভরে না। যমুনা-পুলিনে সেই বংশীবট-ছায়ায় প্রাচীন কেলী সদনে শ্রীমতী রাধানাথের বংশীরব অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মুরলীর মধুরতা এত দিনে সম্যক অনুভূত হইল, তাই কাঁদিতে লাগিলেন, বাঁশী বাজরে বাজরে। রাখাল-শশী, গুণমণি শ্যাম বিহনে শ্যামসোহাগিনী রাধিকার সযতন-সঞ্চিত কমলমালা শুকাইয়া যাইল। একদিন হরিগিলে পাইয়া সম্যক আলিঙ্গনে বাধা দিবার ভয়ে যে নীলকণ্ঠ হার উন্মোচন করিয়াছিলেন, সে নীলকণ্ঠহার আবার তুলিয়া অঙ্গে পরিলেন—কিন্তু "ফুল ভেল শূল সম, হার ভেল ভার ;"—সকলি বিপরীত হইয়া উঠিল। চন্দ্রকরে সূর্য্য কিরণ, চন্দনে গরল, সিন্দুরে অগ্নি শ্রীমতীর দেহ দাহ করিতে লাগিল। এমন সময়ে যদি এক বার রাধা রাধা বলিয়া বাঁশী বাজিত, যার জন্য অভাগিনী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল, সে যদি একবার ফিরিয়া চাহিত, না হয় দূর বন হইতে একবার বাঁশী বাজাইত।—কেন বাঁশী বাজিল না। শ্যামের সঙ্গে শ্যামের বাঁশী অদৃশ্য হইয়াছে। এখন রাধিকার দিব্যোন্মাদ উপস্থিত হইল। কখন মেঘে শ্যামরূপ দেখিয়া শ্যামচন্দ্রের ভ্রম হয়, ছুটিয়া সেই দিকে যান, কখন ক্ষণিক জ্ঞানে শ্যাম-বরণা সহচরীবৃন্দদিগকে তাড়াইয়া দেন, যেন তাহারা শ্যামরূপ স্মরণ করাইয়া না দেয়। কখন পিকরবে মুরলি-ভ্রম হইয়া আহ্লাদে নৃত্য করেন, কখন সংজ্ঞা হইলে সখীগণকে তিরস্কার করেন—

কেন এত ফুল তুলিলি সজনি
ভরিয়া ডালা।
মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা।

কখন স্বপ্নে কৃষ্ণ দর্শন করেন, সখীগণকে শ্যাম-সম্ভোগ কাহিনী বিবৃত করেন, কখন জাগ্রত হইয়া কাঁদিতে থাকেন, সখী-বেশ্রামে হুঙ্কার উন্মোচন করিয়া দেন। শুক সাইকোকে,—যার হৃদয়ে প্রেমের হিল্লোলায় পশু পক্ষীও তার প্রেমের ভাগ পায়,—এতদিন প্রেমের দিনের, সুখের দিনের শুক সারিকারে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। কখন শ্যাম শ্যাম বলিয়া মাধবীলতায় গলা বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিতে যান, কখন যমুনার শ্যাম জলে শ্যাম ভ্রমে আত্ম বিসর্জ্জন করেন।

এক মুরলি-রব বিহনে শ্যাম সোহাগিনীর এ দুর্দ্দশা।

এ মুরলীর মধুরত্ব পাশ্চাত্য কবি বুঝিবে কি? রাধিকার উলঙ্গ প্রেমের গভীরতা কয়জন বুঝে? পাশ্চত্য দর্শনে মুরলীর সংজ্ঞা Inspiration এবং রাধিকার নাম soul.

যেমন গাঁটা গোঁটা শরীর, তেমন কট-কটে ভাষা। গোখাদকের ভাষায় কি সরলতা আছে? না গোখাদকে মুরলীর মধুরতা বুঝিতে পারে?

আমাদের সে মুরলী নাই, সে শ্যাম

নাই, সে রাধিকা নাই। বৃন্দাবনে আজ হাহাকার, তরুলতা মৃগপক্ষী সকলেই কাঁদিতেছে। যদি আমার রাধিকা থাকিত, তবে মুরলীও বাজিত, শ্যামচন্দ্রও আসিতেন। রাধিকা, শ্যাম ও মুরলী হারাইয়া পাগলিনী হইয়াছিলেন, আমি আমার রাধিকাও হারাইয়াছি। এখন কাকে ডাকি বল দেখি? আমার কিসের অভাব বল দেখি? আমি কি চাহিব বল দেখি?

শ্রীপ্রেমদাস বৈরাগী।

জীবন-নদী।

আমি বলিলাম, তুমি একটু রয়ে সয়ে যাও! কৈ তাতে যে কাণই দেও না? শুধুই বহিয়া যাইতেছ। মাঘ মাসের বড় শীতের মধ্যে গঙ্গা ক্ষীণ দেহে কুয়াসার উড়নী খানি ঢাকা দিয়া ধীরে নীরবে চলিয়া যায়। কখনও প্রত্যূষে কষ্টে এক আধটী উষার ভাঙ্গা কি... রাগীর মুখের হাসির মত, ক্ষীণ জাহ্নবী... জল ক্রীড়া করে, কখনও করিতে পারে না। বসন্তের হাওয়ায় জাহ্নবীর আবার নব জীবন আরম্ভ হয়। গ্রীষ্মের আকাশে নব মেঘোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নবীনা জাহ্নবীর হৃদয় হেলিয়া দুলিয়া নাচিতে আরম্ভ করে। বর্ষায় রূপের গৌরবে, যৌবনের বাহারে মাতিয়া জাহ্নবী দুই কূল ভাসাইয়া নাচিয়া গান গাইয়া সমুদ্র-সঙ্গমে ধাবিত হয়। ভাদ্রের মধ্য ভাগে শরতের চন্দ্রকর চুম্বি জাহ্নবীর উচ্ছ্বাসিত বক্ষ কুলু কুলু, কল কল, তর তর শব্দে বলে, জগতে আমি অতুলনীয়। কিন্তু শীতে, বসন্তে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়, শরতে তোমার একই ভাব। সত্য কথা বলি, আমি তোমার ভাব গতিক দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি!

বহিয়া যাবে, তুমি যাও! বিধাতার নিয়তিতে কে বাধা দিবে? আমি ক্ষেপা পাগলের মত তোমার কূলে দাঁড়াইয়া কখনও হাসিব, কাঁদিব, নাচিব, কখনও উদাসীন সন্ন্যাসীর মত উদাস প্রাণে শূন্য নয়নে তোমার চির বহমান স্রোতের পানে তাকাইব, কখনও যোগীর মত ধ্যান-মগ্ন হইয়া শুধু কূলে বসিয়া থাকিব, তুমি বহিয়া যাইবে যাও! বিধাতার নিয়তিতে কে বাধা দিবে?

মানুষ তোমাকে, বৎসর, মাস, দিন, পল, ক্ষণ দ্বারা শত শত ভাগে ভাগ করিয়াছে। তুমি বৎসরে বৎসরে নূতন হও। তাই নববর্ষে মানুষ উৎসব করে। আমি কি এই উৎসবে মাতিব? তবে তোমার কূলে দাঁড়াইয়া কে কাঁদিবে? তুমি যে এই বোঝা বোঝা দুঃখ, শোক, নিরাশা, বিষাদ, দারিদ্র্য, অপমান, অশ্রুজল, দীর্ঘশ্বাস, অনুশোচনা, অনুতাপ লইয়া আসিয়াছ, ইহা কে আদর করিয়া বুকে ধরিবে?

বোঝার উপরে বোঝা! কালিকার বোঝা নামাই নাই, আজ আবার তাহার উপরেই বোঝা চাপিল। গত বৎসরের বোঝা এখনও মাথায় রহিয়াছে, নববর্ষে আবার শত শত নূতন বোঝার আমদানি হইল! আমার পলায়নের জন্য তবে রসাতলের দ্বার খোল! উৎসব আমার জন্য নয়।

আমি বলিলাম, তুমি একটু রয়ে সয়ে যাও! তাহা হইলে আমার বহুদিনের মাথার বোঝা গুলি এখন একবার নামাইতে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। তুমি উত্তর না দিয়া গত বৎসরের পুরাতন কোলে মাথা লুকাইলে। কত খুজিলাম, কত ডাকিলাম, তুমি নিঃশব্দে প্রবাহ পরিবর্ত্তন করিলে—পুরাতন ছিলে, নূতন হইলে।

দোকানী পুরাতন খাতা তুলিয়া রাখিয়া নূতন খাতা বাঁধিল—হাল খাতা করিল। চড়কের ঢাক বাজাইয়া, সং সাজিয়া অনেকেই পুরাতনকে বিদায় দিয়া নীরবে নূতনে পা ফেলিল। চৈত্র সংক্রান্তির মেলার বাজারে ক্রীত কাচের পুতুল লইয়া ছেলের নাম করিয়া বৃদ্ধেরাও খেলা আরম্ভ করিল। পত্রিকা-সম্পাদকগণ পুরাতনের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণনা করিয়া নূতন বৎসরের নূতন স্বরে পাঠকগণকে চারিদিক্ হইতে আহ্বান করিতে লাগিলেন। সে আহ্বানের সার সঙ্কলন করিয়া হিসাবী লোকেরা চমকিলেন, বে-হিসাবীরা হাসিলেন। কারণ, সেই সমগ্র আহ্বান-সমুদ্র মন্থন করিলে, "টাকা" এই এক মাত্র সার কথা পাওয়া যায়! হিসাবী ভাবিলেন দিতে হইবে, বে-হিসাবী বলিলেন, আসিতে দেও, দেওয়া থোওয়া পরের কথা। সমালোচক বহুদিনের রাশীকৃত সমালোচনার্থ-দত্ত পুস্তকের সমালোচনা বাহির করিয়া স্বকীয় দায়িত্ব ভার কমাইলেন। দোকানদার গোছের সমালোচক গুলি এই অবসরে আপনারা যে বড় বাহাদুর লোক, ইহা জানাইবার জন্য তহবিলের থলে ঝাড়িয়া সমস্ত পুরাতন পচা রসিকতা দুই হাতে বিতরণ করিল। জ্ঞানী বা বুদ্ধিমান লোকেরা হৃদয় হইতে পুরাতন পাপের বীজ সকল দূরে ফেলিয়া দিয়া নবজীবন লাভ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমি তীরে বসিয়া ভাবিতেছি, আমার এখন কি করিতে হইবে?

কি করিতে হইবে? সকলে বলে তুমি নূতন হইয়াছ, তোমার একটী পুরাতন ঢেউ সরিয়া গিয়াছে, আর একটী নূতন ঢেউ উঠিয়াছে। আমি যে দেখিতেছি, কালিকারই তুমি আজও আছ। আমার চক্ষে তোমার সেই তরঙ্গ-গর্জ্জন কালও যেমন ছিল, আজও তেমনই আছে। কালও কত ডাকিয়া ছিলাম, তুমি একবারও সাড়া দেও নাই, আজও কত ডাকিতেছি, এক বারও ত সাড়া দিতেছ না। কালও বিরাম বিশ্রাম ভুলিয়া নীরবে যাইতেছিলে, আজও যাইতেছ। কেমন করিয়া বলিব, কালকার তুমি আজিকার তুমি নও,—পুরাতন ছিলে নূতন হইয়াছ?

এই যে মর্ম্মের ভিতরে সেই পুরাতন পাপের,—হিংসা, বিদ্বেষ, মান, অভিমান, কাম, ক্রোধের অগ্নিময় জ্বলন্ত-স্পর্শ কালিকারই মত—গত বৎসরেরই মত আজও —এই নব বর্ষেও অনুভব করিতেছি? এই যে সেই পুরাতন শোক, দুঃখ, দারিদ্র্য-নির্য্যাতন সেই পুরাতন বেশেই সম্মুখে রহিয়াছে? এই যে, সেই দুরাশা—মন্দ অভিলাষ সেই পুরাকালেরই মত শত বৃশ্চিক-দংশনে প্রাণে দংশন করিতেছে? কালও যাহা ছিলাম, আজও তাহাই আছি। তবে আর আমার নূতন কি করিবার আছে?

আমি জন্মিয়াছি, তোমার তীরে বসিয়া ভাবিতে, দীর্ঘ শ্বাস ফেলিতে, অশ্রু ঢালিতে। আমি জন্মিয়াছি শুধু ঢেউ গুণিতে আর

শূন্যে চাহিয়া থাকিতে। আমার কি আর উৎসব করা, আনন্দ করা শোভা পায়?

যাও নদি, তুমি বহিয়া যাও! বিধাতার এ গভীর নিয়তি, ইহাতে বাধা দেওয়া কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। তুমি অতি গভীর, আরও গভীর। তোমারই গভীর গর্ভে মানব-হৃদয়ের অমূল্য নিধি খুলিয়া পড়িয়াছে। কশ্যপ, যাণ্ডিল্য, বশিষ্ঠ, ব্যাস,নারদ, শুক,বিশ্বামিত্র,জনক,বুদ্ধ,মুশা,ঈশা, মহম্মদ, নানক, কবির, শ্রীচৈতন্য তোমায় সেঁচিয়া সেই মাণিক তুলিয়া পৃথিবীর হারাধন পৃথিবীকে দিয়া প্রাণদান করিয়াছেন। আর আমরা কোন্ ছার? তুমি অপদার্থকে ঘৃণা ও অবহেলা করিয়া চিরদিনই ধাইয়া থাক। যে ঢেউ,গণিতে আসিয়াছে,সে ঢেউ গণিবে; যে ঝাঁপ দিতে আসিয়াছে, সে ঝাঁপ দিবে; যে ডুবিতে চায়, সে ডুবিবে, যিনি মাণিক চান, তিনি অবশ্যই মাণিক পাইবেন। তুমি সদা নিরপেক্ষ, নিরুত্তর, নিঃশব্দ, স্বকার্য্যরত। যাও নদি, তুমি বহিয়া যাও! তুমি কাহারও নিকটে নদী—প্রশান্ত-সলিলা,কাহারও নিকটে তরঙ্গময়ী তরঙ্গিনী, আর কাহারও ভাগ্যে শুধুই জ্বালাময়ী নির্জ্জলা মরুভূমি!

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

কি ছিল, কি আছে, কি চাই।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

আর্য্য শাসনসময়ের রাজশক্তি, শ্রেণীগত প্রভেদ, রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য প্রভৃতির মূলে যে অসাম্যময়ী নীতি দৃষ্ট হয়, তাহার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। এখন দেখা যাউক, মুসলমান বিধান-কর্ত্তৃগণের মতানুসারে রাজশক্তি কি?

মুসলমান শাসনপ্রণালীও রাজপ্রধান শাসনপ্রণালী, কিন্তু মুসলমানের রাজা মানবীয় উপাদানে গঠিত, ঈশ্বর তাঁহার নিজের কোন অংশ লইয়া অথবা অপর কোন দেবতা কি উপদেবতার বীর্য্যসার গ্রহণ করিয়া রাজা অথবা রাজশক্তি গঠিত করেন নাই। মুসলমানদিগের শাস্ত্রানুসারে হজরত মহম্মদ ও "নবি" সংবাদবহ মাত্র, তিনিও ভগবানের কোন অংশ নহেন। কেবল রাজার রাজা ভগবানই প্রকৃত রাজা, অন্য তাঁহার আদেশ প্রতিপালক মাত্র।

মুসলমান জাতির ইতিহাসে জানা যায় যে, কতকদিন পর্য্যন্ত কালিফগণ রাজকীয় শক্তি এবং যাচনিক শক্তি একত্র পরিচালিত করিয়াছিলেন, তৎপরই রাজকীয় শক্তি, এবং যাচনিক শক্তি পৃথক পৃথক লোক দ্বারা পরিচালিত হইয়াছে। সুতরাং যাচকদিগের মধ্যে সাধন-তৎপর কোন ব্যক্তির প্রতি সাধারণ লোকে সময় সময় ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ আরোপ করিলেও, রাজার প্রতি কেহ সেরূপ কিছু আরোপ করেন নাই। দিল্লিতে মোগলদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্য যখন সমুজ্জ্বল রূপে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন তোষামোদকারীগণ একবার বলিয়াছিলেন, "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা।" এ তোষামুদিও প্রথমতঃ মহাপুরুষোপাসনা-প্রিয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখ হইতেই প্রথম বহির্গত হইয়াছিল। তৎপর এইরূপ

লোকের কুসংস্কারের ভিত্তির উপর নিজ-বংশীয়দিগের সিংহাসন অটল ভাবে স্থাপিত করিবার অভিপ্রায়ে, নমাজের সময়ে নিজ নাম উচ্চারণ করিবার নিমিত্ত আকবর বাদসাহ একবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন; কিন্তু মুসলমান শাস্ত্রকারেরা কোন স্থানেই কোন রাজাকে ঈশ্বরাংশ, ঈশ্বরাবতার অথবা অপর কোন অমানুষী উপকরণ-গঠিত জীব বলিয়া ব্যাখ্যা করেন নাই।

মুসলমানের রাজা কোন বংশ অথবা শ্রেণী হইতে নির্ব্বাচিত হইতেন না, উচ্চ-বংশীয় নীচবংশীয় সকলেই সে আসনের অধিকারী। যাঁহার সে আসনে বসিবার উপযুক্ত ক্ষমতা থাকিত, তিনিই অক্ষমকে দূর করিয়া সে আসনে উপবিষ্ট হইতেন। ক্রীত দাসী-পুত্রের মস্তকেও মুসলমান-রাজমুকুট শোভা পাইয়াছে। উপযুক্ত গুণশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি সিংহাসনে উপবেশন করিলে, প্রজারা তাঁহার বংশের নীচতা মনে করিয়া কখনও অবজ্ঞা করিতেন না। অকুণ্ঠিত হৃদয়ে সকলে আসিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতেন।

মুসলমান জাতি, রাজার ন্যায় কি অন্যায়, সমুদয় প্রকারের আদেশই অবিচলিত রূপে প্রতিপালন করিতে বাধ্য ছিলেন না, এবং সকল সময় প্রতিপালন করিতেনও না। মুসলমানদিগের মধ্যে বারম্বার রাজদ্রোহিতার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা রাজদ্রোহিতার পক্ষপাতী নহি; কিন্তু এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, যখন রাজশক্তির প্রতিরোধক অপর কোন নির্দ্দিষ্ট শক্তি দেশে থাকে না, তখন প্রজাদিগের কর্ত্তৃক সেই স্বেচ্ছাচারী-শক্তি আবশ্যক-মত প্রতিরুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রয়োজন। অত্যাচার করা যেরূপ পাপ, অত্যাচারী-শক্তির বাধা না দেওয়াও তদ্রূপ পাপই; মুসলমান জাতি এই দুর্দ্দমনীয় বিদ্রোহাস্ত্রশাসনে, কর্ত্তব্যসীমা-বহির্ভূত রাজাকে পুনরায় যথা-স্থানে আনয়ন করিতেন, অথবা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহার আসনে অপরকে বসাইতেন। এইরূপে মুসলমান জাতির মধ্যে রাজা এবং প্রজার শক্তি পরস্পরের মুখাপেক্ষী হইয়া পরিচালিত হইত।

তারপর মুসলমান-নীতি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণভেদে অধিকারের প্রভেদ করার ব্যবস্থা ছিল না, সকলের সম্বন্ধেই একই আইন, একই ব্যবস্থা নির্দ্ধারিত ছিল। অনেক সময়ে ব্যবস্থা পরিচালনের সময় বিচারকগণ বিষম পক্ষপাত দোষে বিচার কার্য্য কলঙ্কিত করিতেন সত্য, কিন্তু সে কথা সম্বন্ধে আমরা এক্ষণে কোন মতামত প্রকাশ করিতেছি না। যে নীতির উপর নির্ভর করিয়া মুসলমান-ব্যবস্থা প্রণীত হইয়াছিল, আমরা এক্ষণে কেবল সেই নীতির কথাই আলোচনা করিতেছি। আমরা বলিতেছি, মুসলমানদের মধ্যে বর্ণভেদ ছিলনা, সমুদয় লোকের তুল্যাধিকার নির্দ্ধারিত ছিল।

প্রফেসর মিল, হিন্দুনীতি এবং মুসলমান নীতি সমালোচনাকালে, হিন্দুনীতিকে যেরূপ ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, নীচাশয়-প্রণোদিত প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়াছেন, আমরা হিন্দুনীতি সম্বন্ধে সেরূপ কিছু মনে করিনা। কিন্তু আমাদিগকেও সত্যের কর্ত্তব্যের অনুরোধ এ কথা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, হিন্দুনীতি যেরূপ অসাম্যময়ী, মুসলমান নীতি সেরূপ অসাম্যময়ী নহে। এই অসমতা স্বার্থময় বাসনা-প্রণোদিত না হইয়া,

সামাজিক হিত কামনা হইতেও জন্মিতে পারে। সে সময়ে সমাজে তাঁহারা যে নীতি অবলম্বন করা সমাজের পক্ষে হিতজনক মনে করিয়াছিলেন, সেইরূপ নীতিই তাঁহারা অবলম্বন করিয়াছিলেন। সে সময়ে আপাততঃ-অভীপ্সিত-ফললাভে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। সুতরাং সে নীতির আর পরিবর্ত্তন আবশ্যক বোধ করেন নাই। লোকের ভুল হওয়া কোন সময়েই অসম্ভব নহে।

সে যাহা হউক, আমাদের মোট কথা এই যে, যে নীতির উপরে হিন্দুদিগের ব্যবস্থা সংস্থাপিত হইয়াছিল, সে নীতি যত অসাম্যময়ী, মুসলমাননীতি তত অসাম্যময়ী নয়। আমরা আর বারম্বার তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে চাহিনা। পূর্ব্বে আমরা এ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, প[illegible] ...কর স্বার্থ নষ্ট. অনেকের যোগ প্রদান করিলে[illegible] দারিদ্র্যমূলক সারবত্তা বুঝিতে পারিবেন।

হিন্দুর রাজা যেরূপ হিন্দু শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থার অধীন ছিলেন, মুসলমানের রাজাও সেরূপ মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত ব্যবস্থার অধীন ছিলেন। এই সমুদয় ব্যবস্থা যে নীতির উপর নির্ভর করিয়া গঠিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা আমরা বলিয়াছি। এক্ষণে ঐ ব্যবস্থার ভিন্ন বিভাগে কোন্ জাতি নিজদিগের ব্যবস্থা বুদ্ধির কিরূপ উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতা দেখাইয়াছেন, সে বিষয় আমরা পরে আলোচনা করিব; এবং হিন্দুসময়ে যে প্রণালীতে হিন্দুরাজগণ রাজ্য শাসন করিতেন, সেই প্রণালী এবং তাহার পরবর্ত্তী শাসন প্রণালী সম্বন্ধে আমরা যথা স্থানে আলোচনা করিব।

এক্ষণে দেখা যাউক, ইংরেজ নীতি সাম্যময়ী কি অসাম্যময়ী।

ইংরেজের শাসন প্রণালীও রাজ-শক্তি-প্রধান শাসন প্রণালী। এই শক্তি বংশ-পরম্পরায় পুরুষ পুরুষানুক্রমে পরিচালিত হইতেছে। ইংরেজ এই শক্তিকে তাহার সমাজের ভিত্তি-স্বরূপ স্থির রাখিয়া পরে যাহা কর্ত্তব্য তাহাই করেন। যে কার্য্যে এই শক্তির কোনরূপ বিনাশ অথবা লোপ সম্ভাবনা, সে কার্য্য তাঁহারা কখনও করেন না। এইরূপ একটী নির্দ্দিষ্ট প্রধান শক্তি হইতে সমাজের মধ্যে সেই শক্তির অনুগ্রহ বলে নানা প্রকার শ্রেণীবিভাগ হইয়া পড়িয়াছে। ইংলণ্ডের "লর্ড এবং কমন" প্রকারান্তরে কোন কোন বিষয়ে ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র, সুতরাং স্থূল দৃষ্টিতে ইংরেজ প[illegible]জ সাম্যাপেক্ষা অসাম্যের ভাগ বেশী। [illegible] ইংরেজের এ নৈতিক অসাম্যতা মৌখিক, প্রকৃত প্রস্তাবে ইংলণ্ডের রাজার ক্ষমতা এবং প্রজার অধিকার এরূপ ভাবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, রাজা প্রজার মুখাপেক্ষা না করিয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহাকে বিষম বিভ্রাটে পতিত হইতে হয়, এবং প্রজাও রাজার সম্মান রক্ষা না করিলে তাহাকে সমুদয় অধিকার হইতে বঞ্চিত হইতে হয়। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজনৈতিক গঠন যে অবয়বে পরিণত হইয়াছে, তাহাতে যে রাজা প্রজার ভালবাসার ভিত্তির উপরে নিজের সিংহাসন স্থাপন করিতে পারিবেন, তিনিই সুখে রাজত্ব করিবেন; আর যিনি তাহা করিতে পারিবেন না, তাঁহার রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আছে। রাজার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা এবং রাজার বশ্যতা স্বীকার করা যেরূপ

প্রজার কর্ত্তব্য, সেইরূপ প্রজার সত্ত্ব স্বাধীনতা এবং ন্যায্য অধিকার সমুদয় রক্ষা করাও রাজার কর্ত্তব্য। এক পক্ষ কর্ত্তব্য প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলে, অপর পক্ষও কর্ত্তব্য পালনের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পান, একথা আজ কাল অনেক ইংরেজই মুক্তকণ্ঠে বলিতেছেন। মুসলমান বা হিন্দু শাসনকালে এরূপ কথা কেহ মুখ হইতে বাহির করিলে তাহাকে গুরুতর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইত।

ইংরেজ সমাজের শ্রেণী-বিভাগ গুণসাপেক্ষ, জ্ঞানের দ্বার সকলের নিমিত্তই অবারিত। নীচ হইতে নীচতম বংশের লোকও জ্ঞান উপার্জ্জনে সক্ষম, এবং তাহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে সেও এক দিন রাজাসনের অব্যবহিত নিম্নতর আসনে বসিতে পারে। একমাত্র রাজাধিকার ব্যতীত সমাজের কে কোন ব্যক্তি যে কোন অধিকার (উপযুক্ত হইলে) প্রাপ্ত হইতে পারেন। এই নিমিত্তই আমরা বলিয়াছি যে, ইংরাজ নীতিতে সামান্য অসাম্য আছে সত্য, কিন্তু অসাম্যাপেক্ষা সাম্যের ভাগ অনেক বেশী।

এই নীতি বাক্যে সম্পূর্ণরূপে ভারত-শাসননীতি-স্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। যখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এ দেশে প্রথম অধিকার বিস্তার করেন, সে সময়ে কি প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, কোন্ নীতি দ্বারা পরিচালিত হইয়া শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, সে আলোচনা আর আজ করিয়া লাভ কি? এখন যাহা আছে, তাহাই আমাদের দেখিবার বিষয়। ভারতবর্ষের রাজা প্রজার অধিকার, ইংরেজাধিকার সময়ের কোন্ সময়ে প্রথমতঃ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা আমরা বলিতে পারি না; আইন দ্বারা আজও সুস্পষ্টরূপে তাহা নির্দ্ধারিত কি না, সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ আছে। ইংলণ্ডীয় প্রজাবর্গের স্বাধীনতার ভিত্তি "ম্যাগ্না কার্টা" এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংক্রান্ত অন্যান্য বিধান (Acts of Haleas Corpus) ভারতবর্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি না, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে, সুতরাং আমরা এ স্থলে সে তর্কের উত্থাপন করিব না। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময়েও যে গবর্ণর জেনেরেলের স্বেচ্ছাচারী-ক্ষমতা ছিল না, এবং স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা যে ইংরেজের কোন রাজ প্রতিনিধিরই থাকিতে পারে না, এ কথা প্রায় সকল ইংরেজই স্বীকার করিতেন। ভারতবর্ষের কোন গবর্ণর জেনেরেলের কার্য্য সমালোচনার সময় তাঁহারা এই মতের উপর নির্ভর করিয়াই সমালোচনা করিতেন।

হেষ্টিংস সাহেব যখন ভারতবর্ষে স্বেচ্ছাচারের সহিত শাসনদণ্ড পরিচালনাপরাধে বিচারাদালতে আনীত হইলেন, তখন তিনি আত্মপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত বলিয়াছিলেন,—"I had arbitrary powers to exercise, and I exercised it. Slaves I found the people; slaves they are. They are so by their constitution; I did not make it for them. I was unfortunately bound to exercise it; I did exercise it. The whole history of Asia is nothing more than mere precedents to prove the invariable exercise of arbitrary power."

"আমার স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা (arbitrary

powers) পরিচালনের অধিকার ছিল, এবং আমি সেই ক্ষমতা পরিচালন করিয়াছি। আমি যাইয়া দেখিয়াছি দেশের প্রজারা দাস, দাস তাহারা এখনও আছে, দেশের প্রচলিত বিধানানুসারেই তাহারা এই রূপ। আমি তাহাদিগের এই রূপ অবস্থার সৃষ্টিকর্ত্তা নহি, দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাকে বাধ্য হইয়া এইরূপ ক্ষমতা পরিচালন করিতে হইয়াছে, আমি এরূপ ক্ষমতার পরিচালন করিয়াছি। আসিয়াখণ্ডের ইতিহাস কেবল অপরিবর্ত্তিত রূপে স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা পরিচালনের উদাহরণমালা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

এই কথার উত্তরে মহাত্মা বার্ক বলিয়াছিলেন,—He says 'he had arbitrary powers,' my lords, the East India Company have not arbitrary power to give him, the king has no arbitrary power to give, arbitrary power is a thing which no man can give."

"তিনি বলিতেছেন, তাঁহার অনিয়মিত ক্ষমতা ছিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তাহাকে অনিয়মিত ক্ষমতা দিতে পারে না, তাহারই অনিয়মিত ক্ষমতা ছিল না। রাজারও কোনরূপে অনিয়মিত ক্ষমতা নাই, যাহা তিনি কেহকে দিতে পারেন। অনিয়মিত ক্ষমতা কেহ কাহাকে দিতে পারে না।"

ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরেলের স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতা পূর্ব্বেও ছিল না, এখনও নাই, তিনি সম্পূর্ণরূপে আইনের বাধ্য। সেই আইন তিনি, বিশেষ সময়ে বিশেষ বিষয় ব্যতীত, সদস্যদিগের অভিপ্রায় না লইয়া প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন না। এই সদস্যগণের মধ্যে প্রজাপ্রতিনিধি স্বরূপে ২।৩ জনকে মনোনীত করিবার প্রথা আছে। সুতরাং দেশের বর্ত্তমান আইন-বিধান সমিতি (legislative council) রাজশক্তি এবং প্রজাশক্তির সমন্বয়ে সৃষ্ট। যুদ্ধবিগ্রহ এবং বিশেষ বিশেষ বিপদের সময়ে সদস্যদিগের মত উপেক্ষা করিবার অধিকার রাজপ্রতিনিধিদিগের থাকিলেও, রাজপ্রতিনিধিদিগের মধ্যে সকলেই এ অধিকার পরিচালনে অত্যন্ত কুণ্ঠিত। লর্ড লিটনের ন্যায় গবর্ণর জেনেরেল এদেশের ভাগ্যে হয় ত আর শীঘ্র ঘটিবে না।

রাজপ্রতিনিধি অকারণ প্রজার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিলে, তাঁহাকেও বিচারাদালতের সমক্ষে যাইয়া দণ্ডায়মান হইতে হয় এবং সাধারণ এক ব্যক্তির ন্যায় রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়।

১৭৫৮ খ্রীঃ প্রাতঃস্মরণীয়া সম্রাজ্ঞী প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, তিনি এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণ জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সমদৃষ্টিতে প্রজাপালন করিবেন, এবং যে কোন জাতির যে কোন বর্ণের, যে কোন ব্যক্তি উপযুক্ত হইলেই যে কোন পদে নিযুক্ত হইতে পারিবেক।

আমরা জানি, রাজ্ঞীর এ প্রতিজ্ঞা এখনও সম্পূর্ণরূপে রক্ষিত হয় নাই, সময় সময় উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীগণ, ঈর্ষা ও দ্বেষ-পরতন্ত্র হইয়া নীতি-বহির্ভূত অনেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। আবার আমরাও অনেক সময় পদের উপযুক্ত না হইয়াই পদপ্রাপ্তির আশা করিয়া থাকি; এবং ভগ্ন-মনোরথ হইলে রাজকর্ম্মচারীদিগকে অনর্থক তিরস্কার করি।

ভারতবর্ষীয় শাসন-নীতিমূলে যে সাম্য রহিয়াছে, তাহার প্রমাণ অন্বেষণ করিতে

বিশেষ প্রয়াস পাইতে হয় না, ইংরেজদিগের মধ্যে এবং দেশীয়দিগের মধ্যে যে সময় সময় বিবাদ হয়, তাহাতে উভয় পক্ষের উক্তি এবং তৎসম্বন্ধে রাজকর্ম্মচারীদিগের মতামতের প্রতি দৃষ্টি করিলেই এ কথার সত্যতা অনুভব করা যাইতে পারে। যে রাজকর্ম্মচারী অন্তরে অন্তরে সাম্যবাদের বিষম বিদ্বেষী, তিনিও এ কথা সাহস করিয়া বলিতে পারেন নাই যে, অসাম্যই শ্রেষ্ঠ নীতি, সুতরাং অসাম্য নীতি দ্বারাই আমরা ভারতবর্ষ শাসন করিব। তাঁহারা সর্ব্বদাই বলিয়া থাকেন, কেবল অধিকার পাওয়ার উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বে সে অধিকার প্রদান করা যাইতে পারে না। সুতরাং নীতিমূলে যে সাম্য আছে, তাহার প্রতি কেহ কটাক্ষ করিতেও সাহস করেন না, প্রকারান্তরে অসাম্য রক্ষার চেষ্টা করি থাকেন।

আমরা একথা লইয়া আর অধিক সময় নষ্ট করা প্রয়োজন বোধ করি না, আমাদের পূর্ব্ব-লিখিত কয়েকটী পংক্তি হইতেই বোধ হয় পাঠক মহাশয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে,—

১ম। হিন্দুর রাজা দেবশক্তির সারভূত পদার্থ হইতে সৃষ্ট।

২য়। ভগবান্ মনু কর্ত্তৃক সংহিত নিয়মানুসারে রাজকার্য্য পরিচালন করা তাঁহার কর্ত্তব্য।

৩য়। সেইরূপ ভাবে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা না করিয়া তিনি যদি স্বেচ্ছাচার অবলম্বন করেন, তাঁহার কার্য্যে বাধা দেওয়ার কথা দূরে থাক, অবজ্ঞা প্রকাশ করার অধিকার পর্য্যন্ত কাহারও নাই।

৪র্থ। পৌরাণিক হিন্দুসমাজে বর্ণভেদ অনুসারে অধিকার-ভেদ পুরুষানুক্রমে স্থায়ী। রাজা যে কেবল এই অসাম্য রক্ষা করিতে বাধ্য, এরূপ নহে, এই অসাম্য রক্ষা করাই তাঁহার প্রধান ব্রত।

এই ত গেল হিন্দুদিগের সময়ের রাজা এবং প্রজার শক্তির অবস্থা। তার পর মুসলমান নীতির মূল কথা এই ;—

১ম। রাজার রাজা ভগবান্ই একমাত্র এই সংসারের রাজা,* তিনি ব্যতীত অন্য রাজা নাই, পৃথিবীর রাজারা একমাত্র তাঁহার প্রদত্ত নিয়ম পরিচালন করিবেন।

২য়।—কোরাণ-লিখিত বিধানে বর্ণভেদ নাই, বর্ণভেদানুসারে অধিকার-ভেদ নাই। ধর্ম্মভেদে অধিকারভেদ নির্দ্ধারিত আছে।

৩য়।—রাজা কোরাণের বিধান অবহেলা করিলে, অন্য অবজ্ঞাকারীর যে দণ্ড, রাজার [illegible] না, এরূপ কোন [illegible] ...ন শাস্ত্রের কোন স্থানে নাই।

সুতরাং এই মুসলমান নীতি, হিন্দুনীতি অপেক্ষা অধিক সাম্য-ময়। তৎপরে ইংরেজনীতি ;—

১ম।—রাজশক্তি মানবীয় শক্তি।

২য়।—রাজা † প্রজাদিগের মতামত এবং দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিধি প্রণয়ন করিবেন, এবং যে বিধান প্রণীত হইবে সেই বিধানুসারে কার্য্য করিতে, তাঁহার এক জন ক্ষুদ্র প্রজা যেরূপ বাধ্য, তিনিও সেইরূপ বাধ্য।

৩য়।—তিনি কোন প্রকারে অন্যায় কার্য্য

---

* কোরাণ সরিফ—মুরামোলক।

† ভারতবর্ষের রাজশক্তি যিনি পরিচালন করেন।

করিলে, ধর্ম্মাধিকরণ তাঁহার সম্বন্ধেও দণ্ড বিধান করিতে পারিবেন।

৪র্থ।—জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে রাজকার্য্য এবং অপর বিষয়ে সকলেরই তুল্যাধিকার স্বীকার করা হইতেছে।

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, হিন্দু, মুসলমান এবং ইংরেজ শাসন-নীতির মধ্যে ইংরেজের নীতিই অধিকতর সাম্য-ময়ী। এই নীতির প্রসাদে দেশে অনেক সুফল ফলিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও ফলিবার আশা আছে। ইংরেজ-শাসন আজই দেশ হইতে তিরোহিত হউক, এ কথা বোধ হয় নিতান্ত মূর্খ লোকেও বলিবে না।

ইংরেজ শাসন সময়ে, সুনীতির আচ্ছাদনে অনেক সময় অনেক কুনীতি নব নিপাদনী বিধিবদ্ধ ও প্রচারিত হইয়াছে, অনেক [illegible] সর্ব্বস্বাপহরণ, অনেক দুঃখ এবং [illegible] কার্য্য এই ইংরেজাধিকার সময়ে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, একথা কে না জানে? কিন্তু তাহাতে তাহাদের নীতির গৌরব কলুষিত হয় না।

খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের গৌরব রক্ষার জন্য ইংলণ্ডে যে সকল নৃশংস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তদপেক্ষা খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অধিকতর অননুমোদনীয় কার্য্য বোধ হয় জগতে কিছুই নাই। তাহাতে কি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মনীতি কলুষিত হইয়াছে বলিতে পারি? মূর্খ ইন্দ্রিয়-পরায়ণ তান্ত্রিকগণ, তান্ত্রিক সাধনের ছল করিয়া কত প্রকার পাপকর্ম্মেরই না অনুষ্ঠান করিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া তন্ত্রোক্ত ধর্ম্ম-নীতিকে আর এইরূপ মতপূর্ণ বলা যাইতে পারে না। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের পক্ষপাতী বৈষ্ণবধর্ম্ম ক্রমে পরিবর্ত্তনের পর পরিবর্ত্তিত হইয়া এক্ষণে দুষ্ক্রিয়াসক্ত-ব্যক্তিদিগের কাহারো কাহারো আশ্রয়-ভূমি হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বৈষ্ণবধর্ম্মের মূল মন্ত্রে কি দোষ স্পর্শিয়াছে? আর্য্য ঋষি-দিগের কঠোর সাধনার পবিত্র উৎস ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের নামে কত কুক্রিয়াকে কত সময় কত লোকে ধর্ম্মানুমোদিত কার্য্য বলিয়া প্রকাশ করিয়াছে এবং আজও করিতেছে, তাই বলিয়া যে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার এবং পবিত্র মত কলঙ্কিত হইয়াছে, একথা কে বলিবে? যখন কোন একটী মতকে মানুষ নীতি বলিয়া স্বীকার করে, তখন আজি হউক, কালি হউক, মনুষ্য, সমাজ সে নীতি দ্বারা পরিচালিত হইবেই। চিরন্তন অভ্যাস নিবন্ধন অথবা স্বার্থময় ইচ্ছার বশবর্ত্তী হইয়া হয়ত কতক সময় ব্যক্ত লোকে সে নীতি বহির্ভূত কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহার কার্য্যকে আবার সে সেই নীতি-বলেই প্রতিপোষিত করিতে চেষ্টা করে, নীতির শ্রেষ্ঠত্বের ইহাপেক্ষা আর অধিক প্রমাণ কি হইতে পারে? ইংরেজ অন্যায় করিয়াছে, এ কথা আজ বলিতে পারি কিসের বলে? ন্যায় অন্যায় যাহাকে বলে, ইংরেজ আজ তাহা আমাদিগকে শিখাইয়াছে, বলিতে অধিকার দিয়াছে, কাজেই আজ মুক্ত কণ্ঠে বলিতেছি, ইংরেজ অন্যায় করিয়াছে। যদি আজ ঐ অধিকার না পাইতাম, তবে যে রাজা নররূপে দেবতা, এমন রাজার কার্য্য সমালোচনা করিতে আমি কে, আজ একথা বলিয়াই মনকে প্রবোধ দিতাম।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

তোমারে কেবল।

১

প্রিয়ে তোমারে কেবল;—
জাগ্রতে নিদ্রায় হায়, কিছুতে না ভোলা যায়,
যখন যে ভাবে থাকি হৃদয় চঞ্চল,
কেবলি তোমার তরে, উদাস উদাস করে,
ধরেনা ধৈরয চিত্ত কাঁদে অবিরল,
পারি না ভুলিতে প্রিয়ে তোমারে কেবল!

২

প্রিয়ে তোমারে কেবল,—
তোমারে ছাড়িয়া হায়, আর সব ভোলা যায়,
যে সকল অবস্থায় হৃদয় বিকল,
মোহ মূর্চ্ছা শোক দুখ, যাহাতে বিদীর্ণ বুক,
মানব শরীর ধর্ম্মে ঘটে যে সকল,
অকপটে প্রাণ খুলি, তখন সকলি ভুলি,
ভুলি স্বর্গ, ভুলি মর্ত্ত্য, ভুলি রসাতল,
পারি না ভুলিতে প্রিয়ে তোমারে কেবল!

৩

প্রিয়ে তোমারে কেবল—
এই যে বিদেশী বেশে ঘুরিতেছি দেশে দেশে
পোড়া দেশীয়ের মুখে প্রদানি অনল,
তথাপি বাসনা করে, একটী মুহূর্ত্ত তরে,
লুকায়ে দেখিগে সেই মুখ-শতদল,
পারি না ভুলিতে প্রিয়ে তোমারে কেবল!

৪

এক দিন, শীতান্ত সায়াহ্নে সেই----
পশ্চিম অচল শিরে, লাল রাঙ্গা রবিটীরে,
প্রকৃতি বালিকা যেন ছুঁড়িয়াছে বল,
পড়িতেছে গড়াইয়া, উল্লাসে ধরিতে গিয়া,
পশ্চাতে ছুটেছে বালা গোধূলি শ্যামল!

এ দিকে পর্ব্বত অঙ্গে, ছুটিয়াছে নানা রঙ্গে,
নাচিয়া নির্ঝর ক্ষুদ্র করি কল কল!
কখনো কানন গায়, তরু কুঞ্জ লতিকায়,
লুকায়ে পলায়ে পুনঃ মিশিছে সকল!
হেন কালে সন্ধ্যাবেলা, প্রকৃতির রম্য খেলা,
দেখিতে না ছিল চিত্ত স্থির অবিচল,
সংসারের তীব্র বিসে, কপাল পুড়িল কিসে,
কি যে সেই দুরদৃষ্ট কি যে কর্ম্মফল,
কি যে তার দয়াধর্ম্ম, কি যে তার কর্ম্মাকর্ম্ম
নরের নরক-রাজ্যে পূর্ণ ধরাতল!
তাই শুধু এক মনে, বসি সে বিজন বনে
ভাবিতেছি, ভাবনায় হৃদয় বিহ্বল।
কেহ নাই মনে আর, দগ্ধ চিত্ত অভাগার
প্রবল প্রবাহে বহে নয়নের জল,
ভুলিনি তখনো প্রিয়ে তোমারে কেবল!

একদিন—
যেখানে মেঘনা সঙ্গে, বিকট তরঙ্গ-ভঙ্গে,
মিশেছে ভীষণ পদ্মা গর্জ্জিয়া প্রবল,
চারিদিকে করে ধুধু, অনন্ত সলিল শুধু,
শ্রবণ বধিরি উঠে ঘোর কোলাহল!
বৈশাখে বিকাল-বেলা, গগনে করিছে খেলা,
আঁধারিয়া দিক্ দশ জলদ শ্যামল,
বহিছে প্রবল ঝড়, ভাঙ্গি বন বাড়ী ঘর,
আতঙ্কে ধরণী ত্রাসে কাঁপিছে কেবল!
গভীর গরজে ঘন, শিলা বৃষ্টি বরিষণ
আকাশ পুড়িয়া জ্বলে গাঢ় বজ্রানল,
পড়ি এ প্রচণ্ড ঝড়ে, চলেছি জন্মের তরে,
তরঙ্গে জাহাজ খানি করে টলমল!
অসাধ্য শকতি তার, প্রতিকূলে ঝটিকার,
ঠেলিয়া উঠিতে সেই ঘোর ঊর্ম্মিদল!

আতঙ্কে আরোহী যত, কাঁদিতেছে অবিরত
মরণ-সময়ে করি ঘোর কোলাহল!
সেই যে অন্তিম কালে, বেষ্টিত বিপদ-জালে,
চরণের তলে সিন্ধু অনন্ত অতল,
তখনো তোমারে প্রিয়ে ভুলিনি কেবল!

৬

একদিন——
যে দিন প্রথম যাই, আশায় ঢালিয়া ছাই,
স্মরিতে এখনো প্রিয়ে আসে অশ্রুজল;
প্রতিজ্ঞা সন্ন্যাসি বেশে,বেড়াইব দেশে দেশে,
অসহ্য স্বদেশে প্রেত প্রভুত্ব প্রবল!
এক হাতে অভিমান, এক হাতে নিয়ে প্রাণ,
একাকী চলেছি, পথ ঘোর বনস্থল,
অর্দ্ধ-ভুক্ত নরদেহ, শার্দ্দূল ভল্লুকে কেহ
খেয়েছে, দেখিনু রক্ত তখনো উজ্জ্বল!
আতঙ্কে কাঁপিল প্রাণ, ডাকিলাম ভগবান্,—
শিরায় জমিয়া গেল শোণিত তরল,
তখনো ভুলিনি প্রিয়ে তোমারে কেবল!

৭

একদিন ——
ঘোর সন্নিপাত-জ্বরে, প্রাণ ছট্ ফট্ করে,
কিছুতে প্রাণের জ্বালা হয় না শীতল,
শ্রাবণ মাসের শেষ, পার্ব্বতীয় গারোদেশ,
ব্যাপিয়া বিংশতি দিন বর্ষিতেছে জল!
মৃদু মন্দ ক্ষীণ নাড়ী, মণিবন্ধ গেছে ছাড়ি,
ছেড়েছে প্রাণের আশা চিকিৎসক-দল,
স্থির নয়নের তারা, নয়নে গলিত ধারা,
অন্তিম হিক্কায় কণ্ঠ কাঁপিছে কেবল!
নিশ্চয় মরণ জেনে, রাখিল বাহিরে এনে,
মুখেতে ঢালিয়া দেয় কেহ গঙ্গাজল!
কিন্তু পুনঃ প্রাণ দিল, মৃতদেহ বাঁচাইল,
বরষি নবীন মেঘ সলিল শীতল!
ঘরের বাহিরে হায়, সেই সিক্ত বিছানায়,
সেই ঘোর হরি ধ্বনি মুখে গঙ্গাজল,
পৃথিবীর সুখে দুখে, সেই যে অবাঙ্মুখে,
প্রথম চৈতন্যে চক্ষে আঁধার প্রবল!
ইন্দ্রিয় অবশ প্রায়, অবসন্ন হিম কায়,
চিনিতে অশক্ত যেন নবীন ভূতল,
তখনো তোমারে প্রিয়ে ভুলিনি কেবল!

৮

প্রিয়ে তোমারে কেবল—
একদা উদ্ভ্রান্ত মনে, চলিয়াছি পর্য্যটনে,
হৃদয়ে গর্জ্জিছে ঘোর অশান্তি গরল,
নাহি মিলে শান্তি ছায়া, না জুড়ায় তপ্তকায়া
শত-সাহারায় যেন পূর্ণ ভূমণ্ডল!
জল রাক্ষসীর মত, তীব্রবেগে অবিরত
চলেছে জাহাজ খানি গর্জ্জি অবিরল,
যেন পলাইতে হায়, এ পড়ে উহার গায়,
বৃটিশ তরণী ভয়ে ভারতের জল,
উছলিয়া কল্লোলিয়া, আছাড়িয়া পড়ে গিয়া,
আন্দোলিয়া বারি-রাশি অনন্ত অতল!
এক মনে দেখি তাই, কভু অন্য দিকে চাই,
কভু দেখি তীর তরু শ্যাম ভূমিতল,
অকস্মাৎ কলরবে, সে ধ্যান ভাঙ্গিল যবে,
সম্মুখে চাহিয়া দেখি বিপদ্ প্রবল!
দ্বিতীয় জাহাজ আগে,আরোহী কাঁদিছে রাগে.
অদম্য অক্লান্ত-গতি পূর্ণ বেগ-বল,
উপায় নাহিক আর, নাহি শক্তি রোধিবার
কাপ্তেন সারঙ্গ মাল্লা স্তম্ভিত সকল!
মহামৃত্যু গর্জ্জে মেঘ, তীব্রগতি বজ্রবেগ,
এখনি জাহাজ খানি দিবে রসাতল,
ঘেরি চারি পাশ যেন,আস্ফালি তরঙ্গে ফেণ,
সলিল সমাধি অট্ট হাসে খল খল!
তখনো তোমারে প্রিয়ে ভুলিনি কেবল!

৯

ভুলিনি তোমারে প্রিয়ে ভুলিনি কেবল,
উষার আলোক-মাখা, আধ ফোটা আধ ঢাকা,

আধ ভাঙ্গা ঘুম-ঘোরে অলস কমল !
সেই যে অলস আঁখি, যত দিন বেঁচে থাকি,
ভুলিব না নব মধু নব পরিমল !
কণ্টকে আকীর্ণকায়, বেষ্টিত ভুজঙ্গ তায়,
জীবন-মৃণাল মম যদিও দুর্ব্বল,
তথাপি তোমার ধ্যানে, আজো বেঁচে আছি প্রাণে,
দেয় শক্তি প্রেমবারি—অনন্ত অতল !
সরলা, সরোজরাণি ! সেই হাসি মুখখানি,
অধর বিদারে ব্যক্ত নব মুক্তাফল,
ভুলিব না এ জনমে তোমারে কেবল !

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস ।

মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের ধর্ম্ম-বিষয়ক মতামত* ।

(২য় প্রস্তাব ।)

প্রথম প্রস্তাবের কোন কোন অংশে লোকের আপত্তি শুনা যাইতেছে। অতএব তাহা অপসারিত করিবার জন্য পুনরায় কিছু লেখা আবশ্যক হইল।

(১) অক্ষয় বাবু ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হইবার পূর্ব্বেও একেশ্বরবাদী ছিলেন, এ বিষয়ের প্রমাণ সহিত সবিশেষ বিবরণ অনেকে চাহিতেছেন। আমার প্রণীত "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত" পুস্তকে উহার সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে। নব্যভারতের গ্রাহক ও পাঠকের অধিকাংশ ব্যক্তিই হয়তো তাহা জ্ঞাত নহেন, এ কারণ সেই স্থল উদ্ধৃত হইল,—

"ইলিয়ড্ পাঠ করিতে করিতে, ইহাঁর (অক্ষয় বাবুর) এই প্রকার মনে হইল যে, গ্রীক্ জাতি পূর্ব্বে পৌত্তলিক ছিল। পরে, তাহারা সেই মত মিথ্যা জানিয়া, অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করে। যখন গ্রীক্‌দের মধ্যে এরূপ ঘটিয়াছে, তখন হিন্দু-ধর্ম্ম মিথ্যা বলিয়া অবধারিত হইয়া, হিন্দু-সমাজেও তদ্রূপ হইবার অসম্ভাবনা কি? একবার যে অবিশুদ্ধ ধর্ম্ম সৃষ্ট হইয়া চলিয়া আসিয়াছে, পশ্চাৎ তাহা অসত্য বোধ হই[illegible] হয়। সম্ভব ও স[illegible] করিয়া ইংরাজী ভূগোল পড়িতে পড়িতে, পুরাণোক্ত ভূগোল মনঃকল্পিত বলিয়া সিদ্ধান্ত হয়। যে গ্রন্থের একাংশ অপ্রকৃত, তাহার অপরাংশে আস্থা কি? এরূপ হইলে, হিন্দুধর্ম্ম অভ্রান্ত হওয়া দূরে থাকুক, প্রত্যুত ভ্রান্ত বলিয়াই সংশয় হয়। হিন্দুমতে সাকার দেবগণ একেবারে নানা স্থানে ও নানা জড় বস্তুর মধ্যেও বিদ্যমান থাকেন। পদার্থ-বিদ্যার জড় বস্তুর বিস্তৃতি ও স্থিতিবিরোধ গুণ পাঠ করিয়া, ইহাঁর তাহা অসম্ভব ও অসঙ্গত বোধ হইল। ঐ বিদ্যা এবং ভূগোলাদি অন্যান্য বিদ্যার অনুশীলনে গঙ্গা, যমুনা, গোদাবরী, সরস্বতী, নর্ম্মদা, সিন্ধু ও কাবেরী প্রভৃতি দেবনদী এবং জলবর্ষণ, বায়ুবহন, গ্রহণ-ঘটনাদি

---

*নব্যভারতে রাজনারায়ণ বাবুর প্রস্তাব মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বেই এই প্রবন্ধটী সম্পাদকের হস্তে অর্পিত হয়, স্থানাভাবে প্রকাশিত হয় নাই। রাজনারায়ণ বাবুর প্রতিবাদের প্রতিবাদ পরে করা যাইবে।

প্রাকৃতিক বিষয়-সমুদায়ের প্রকৃত স্বরূপ যেরূপ জানিতে পারিলেন, তাহা প্রচলিত হিন্দু-ধর্ম্মের নিতান্তই বিরুদ্ধ এবং পুরাণাদি শাস্ত্রোক্ত, তদ্বিষয়ক মত সমুদায় কাল্পনিক বলিয়া স্থির হইল। মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া যুক্তি-বলে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম মনুষ্যের মনঃকল্পিত, এইটি সুন্দর প্রতীতি জন্মিল এবং জগতের কার্য্য-কারণ-পর্য্যালোচন দ্বারা যে ধর্ম্ম প্রতিপন্ন হয়, তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া ইঁহার অবধারিত হইল।"—(মৎপ্রণীত "বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত", চতুর্থ অধ্যায়, ২০।২১ পৃষ্ঠা।)

(২) ইতিপূর্ব্বে আত্মীয় সভার আমরা যে প্রসঙ্গ করিয়াছি, তাহাতে বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি ও তদানুষঙ্গিক অক্ষয় বাবুর বৃত্তান্ত আরও একটু আলোচনা করা বিধেয় বোধ হওয়ায়, কিছু কিছু [illegible]। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বর্ণনা করিয়াছেন, প্রথমে তাহাই আলোচিত হইতেছে। ক্রমশঃ অপরাপর বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হইবে। এখানে বলা উচিত, দেবেন্দ্র বাবু আত্মীয় সভার সভাপতি ও অক্ষয় বাবু সম্পাদক ছিলেন। দেবেন্দ্র বাবু বলেন,—

"শেষে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াই ব্রাহ্মদের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিলেন, ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন? হস্তোত্তোলন কর দেখি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না? কি হাস্যাস্পদ! দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তোলন দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যে কি হাস্যাস্পদ,ইহা তাঁহারা তখন বুঝিতেন না। যখন বেদের প্রতিষ্ঠা গেল এবং সহজ জ্ঞান ও আত্মপ্রত্যয় তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই, তখন বড়ই কলহ হইতে লাগিল। ১৭৭৭ অবধি ক্রমাগতই এইরূপ গোল চলিল। আমি এই সকল বিবাদ বিসম্বাদ দেখিয়া হিমালয়ে চলিয়া গেলাম।"—(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৮৬ শক, জ্যৈষ্ঠ অথবা পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ৩২ পৃষ্ঠা।)

দেবেন্দ্র বাবু এই সভার সভাপতি ছিলেন, তথাপি তিনি কেন সভ্যগণের স্কন্ধে দোষারোপ করিলেন,বুঝিতে পারি না। যদি সভার আন্দোলনে তাঁহার উৎসাহই না থাকিবে, তবে কি হেতু তিনি সভাপতি-পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন? গত বারে ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার্ হইতে বাবু কানাইলাল পাইন্ মহাশয়ের এই বর্ণনা মুদ্রিত হইয়াছে। অক্ষয় বাবুর বাক্য অকাট্য হইত বলিয়াই যে, দেবেন্দ্র বাবু বিষম সঙ্কটে পড়িতেন, তাহার প্রমাণ এই,—

"তৎকালে আত্মীয় সভা নামে একটি সভা ছিল, তাহাতে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করিবার জন্য হাত তোলাতুলি হইত। কিন্তু অক্ষয় বাবুর কথা কেহই খণ্ডন করিতে পারিতেন না। সে সময় সহজ জ্ঞানের বিষয়ে সকলেই এক প্রকার অনভিজ্ঞ ছিলেন, সুতরাং সভ্যগণ বুদ্ধি ও তর্ক-তরঙ্গে সর্ব্বদা ভাসিতেন। দেবেন্দ্র বাবু যদিও অক্ষয় বাবুর মত খণ্ডন পূর্ব্বক ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝাইয়া দিতে পারিতেন না,কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস সে সকল তর্কে কিছুতেই সায় দিত না।"—(ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত, ১৪৬।৪৭ পৃষ্ঠা।)

অক্ষয় বাবু আত্মপ্রত্যয় মানিতেন, পূর্ব্বপ্রস্তাবে বিশদরূপে বিবৃত করা গিয়াছে। তিনিই ব্রাহ্মসমাজে প্রচার করিয়া দেন, এই বিশ্ব-গ্রন্থই ব্রাহ্মধর্ম্মের পুস্তক। বিজ্ঞানই ব্রাহ্মধর্ম্মের তত্ত্বনির্ণয়ের একমাত্র সোপান,

এই মতও অক্ষয় বাবুর প্রচারিত, পূর্ব্ব প্রস্তাবে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

(৩) পরকাল ও ঈশ্বরের স্বরূপ-বিষয়ে দত্ত মহাশয়ের মত কি, ব্রাহ্মসমাজের ইতি-বৃত্তে তাহা যে প্রকার লেখা আছে, এক বার বিচার করিয়া দেখা যাউক।

"যে সময়ে বেদের প্রতি বিশ্বাস চলিয়া গেল, তখন মত-সম্বন্ধে অনেক গোলযোগ হইত। তৎকালে সভ্যদিগের মধ্যে দুই দল ছিল। এক দিকে অক্ষয় বাবু প্রভৃতি কয়েক জন কেবল বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইতেন, অন্য দিকে দেবেন্দ্র বাবু কেবল স্বাভাবিক সহজ-জ্ঞান-মূলক বিশ্বাস দ্বারা নীত হইতেন। অক্ষয় বাবুর বুদ্ধিশক্তি ও তর্কশক্তি অতিশয় প্রখর ছিল। দেবেন্দ্র বাবু বেদকে সমূহ শ্রদ্ধা করিতেন এবং অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া তদনুসারে চলিতেন। অক্ষয় বাবু পূর্ব্ব হইতেই কোন পুস্তক যে অভ্রান্ত হইতে পারে না, তাহা বুঝিয়া ছিলেন। তিনি অনেক প্রকার তর্ক, যুক্তি ও বিজ্ঞান দ্বারা বুঝাইয়া দিলেও, দেবেন্দ্র বাবু সুদৃঢ় সংস্কার বশতঃ বেদকে ছাড়িতে চাহিতেন না। অবশেষে বুঝিতে পারিলেন যে, ধর্ম্মের মূলভূমি কোন পুস্তক হইতে পারে না। কিন্তু মূলভূমি কি, তাহা বিশেষরূপে কাহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। অক্ষয় বাবু, বুদ্ধিবৃত্তি ও স্বভাবকে ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া প্রচার করেন। জগতের সৌন্দর্য্য ও কৌশল সন্দর্শন করিয়া স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতেন। তাঁহার যে সকল পুস্তক আছে, তাহাতে এই ভাবের প্রাধান্যই লক্ষিত হয়। মহিমা, কৌশল, সৌন্দর্য্য প্রভৃতির বিশেষ বর্ণনা দ্বারা সে সকল পরিপূর্ণ। বুদ্ধি এবং বহির্জগৎ তাঁহার ধর্ম্ম-জীবনের পরিচালক হওয়াতে, তাঁহার মনে বিশ্বাস-সম্বন্ধে অনেক গুরুতর সত্যের উপর সংশয় দেখিতে পাওয়া যায়। পরকাল ও ঈশ্বরের মঙ্গল-স্বরূপে তাঁহার বিশ্বাসের অত্যন্ত অস্থিরতা। কেবল আপনার সীমাবিশিষ্ট, বিবিধ-ভ্রান্তি-সঙ্কুল, দুর্ব্বল বুদ্ধির হস্তে জীবন সমর্পণ করিলে, কি যে অনিষ্ট হয়, তাহা অক্ষয় বাবুর জীবনে স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। নিতান্ত পরিতাপের বিষয় যে, তিনি এই প্রাচীন বয়সে অদ্যাপি সম্বল-বিহীন হইয়া প্রতিনিয়ত সন্দেহের আন্দোলনে আন্দোলিত রহিয়াছেন। দেবেন্দ্র বাবুর স্বাভাবিক সবল বিশ্বাস-পূর্ণ হৃদয়, এই বুদ্ধির ধর্ম্মে পরিতৃপ্ত হইত না। বেদের ভ্রম বাহির হওয়ার পর ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছু দিনের জন্য বৌদ্ধ ধর্ম্মের আকার ধারণ করিয়াছিল। কেবল নানাপ্রকার অস্থির কল্পনা এবং কোন কোন ব্যক্তিদের উপর ব্রাহ্মধর্ম্ম অবস্থিতি করিত।"—(ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত, ১৪৫—৪৬ পৃষ্ঠা।)

ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্পর্কে দত্ত মহোদয়ের অভিপ্রায় পূর্ব্ব প্রবন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুশীলন করা গিয়াছে। পরলোক-বিষয়ে তাঁহার কি বিশ্বাস বা মত ছিল, গত বারে তাহা নির্দ্দেশিত হয় নাই। অক্ষয় বাবু কোন স্থানে পরলোক অস্বীকার করেন নাই। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এবিষয়ে তিনি অতি পরিপাটী প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। শেষাবস্থায় উহা উল্লেখ করিতে করিতে যে স্থলে কোন অভিপ্রায় নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলেই, ইহার সর্ব্ববাদি-সম্মত মীমাংসা হইবে। পশ্চাল্লিখিত বিবরণে তাহা ব্যক্ত আছে।

৪।—ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের

প্রথম ভাগের উপক্রমণিকাংশে ঈশ্বর-বিষয়ে অক্ষয় বাবুর যে অভিপ্রায় প্রকটিত রহিয়াছে। তাহা সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন না করিয়া রাজনারায়ণ বাবুর উক্তি খণ্ডন অবৈধ, কেহ কেহ এইরূপ বলিতেছেন; এই কারণেও, তদ্বৃত্তান্ত পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"যাহা হউক উপনিষৎ-কর্ত্তারা যে অতিমাত্র অনুধ্যানশীল ছিলেন, এবং পরমার্থ-চিন্তন-বিষয়ে প্রগাঢ়তর পরিশ্রম করিয়াছিলেন, উপনিষৎ আবৃত্তি-মাত্রই ইহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে থাকে। তাঁহারা জগতের মূল ও জগৎকারণের স্বরূপ নির্দ্দেশাদি বিষয়ে মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমার্জ্জিত-বুদ্ধি ব্যতিরেকে উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁহাদের সময়ে বিজ্ঞানশাস্ত্রের স্থৈর্য্য কিছু ছিল বলিয়া তদীয় গ্রন্থগুলি সর্ব্বস্থলে সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর না হউক, তথাচ এক এক স্থলে এক একটী এরূপ অভিপ্রায় প্রকটিত আছে যে, বোধ হয়, অধুনাতন-কালোত্তর-বুদ্ধিমান্ অত্যল্প লোক ব্যতিরেকে অন্যে তাহার প্রকৃত রূপ তাৎপর্য্য-গ্রহে সমর্থ হয় না।

"যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাং ॥"
—[তলবকারোপনিষৎ ২।৩]

"যিনি নিশ্চয় মনে করেন, ব্রহ্মকে জানা যায় না, তিনিই তাঁহাকে জানিয়াছেন, আর যাঁহার এরূপ নিশ্চয় হইয়াছে যে, ব্রহ্মকে জানিয়াছি, তিনি তাঁহাকে জানেন নাই, জ্ঞানবান্ ব্যক্তিদের বিশ্বাস এই যে, ব্রহ্মকে জানা যায় না। অজ্ঞ ব্যক্তিরাই মনে করে, তাঁহাকে জানিতে পারা যায়।

"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥
[কঠ, ৬।১২]

"বাক্য, মন ও চক্ষু দ্বারা পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তিনি আছেন, এই কথা যে ব্যক্তি বলে, সেই তাঁহাকে জানে। তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি কিরূপে তাঁহাকে জানিতে পারেন?

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি, তদ্বদ্ ॥
—[তলবকারোপনিষৎ]

"ধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, অধর্ম্ম হইতে ভিন্ন, কার্য্য আর কারণ হইতে ভিন্ন, আর ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান কাল হইতে ভিন্ন যে ব্রহ্ম, তাঁহাকে তুমি জান। তাঁহার বিষয় কহ।

"ন তত্র চক্ষুর্গচ্ছতি ন বাগ্গচ্ছতি নো মনো
বিদ্মো ন বিজানীমো
যথৈতদনুশিষ্যাদন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুম পূর্ব্বেষাং যে নস্তদ্ব্যাচচক্ষিরে।"
—[তলবকারোপনিষৎ ১।৩।]

"তাঁহাকে চক্ষু দেখিতে পায় না, বাক্য কহিতে পারে না এবং মন চিন্তা করিতে পারে না। আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না। শিষ্যকে কিরূপে ব্রহ্মের বিষয় উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানি না। তিনি বিদিত অবিদিত সমুদায় বস্তু হইতে ভিন্ন। আমরা ইহা প্রাচীন পণ্ডিতদিগের নিকট হইতে শুনিয়াছি, তাঁহারা আমাদিগকে তাহা কহিয়াছেন।

"বিশ্বকারণ যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়-স্বরূপ এই অসংশয়িত, ও অখণ্ডনীয়

তত্ত্বটি উল্লিখিত রূপ বহুতর উপনিষৎ বচনে সূচিত ও নিদর্শিত রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই বিশ্ব-ব্যাপার এরূপ জটিল ও সুখ-দুঃখ-বিমিশ্রিত এবং নানারূপ নৈসর্গিক কারণে এরূপ দুঃসহ ক্লেশ ও ভয়ঙ্কর উৎপাত সমুদায় উপস্থিত হয় যে, অবিচলিত-ভক্তি সাকারবাদীরাও, এক এক সময়ে বিশ্ব-কারণের সদয় স্বরূপে সংশয় প্রকাশ করিয়া উঠেন।

"তব বিচিত্র মায়ার কি রস, বিষ কি পীযূষ,
না হয় অনুভব দুর্গে!
যদি হয় মা সুখ, মিলিত তায় দুঃখ
হৈয়ে কৃপামুখ,
নিস্তার এ উপসর্গে॥*"

"কোন পারসীক কবি কহিয়াছেন, এই উদ্যানের বুল্‌বুল্‌গণের † সমাচার কিছু জিজ্ঞাসা করিও না, তদীয় পিঞ্জর হইতে কেবল ক্রন্দন-ধ্বনি আসিতেছে শুনিতে পাইতেছি।

"উপনিষৎ-প্রণেতা প্রাচীন পণ্ডিতেরা পূর্ব্বোক্ত রূপ অনেকানেক বচনে পরমার্থ-চিন্তনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা এ বিষয়ে বুঝি কেবল এই অনুক্ত দুইটি কথা সুস্পষ্ট লিপিবদ্ধ করিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছেন।

"(১) যাঁহারা এই অদ্ভুত জগতের অদ্ভুত কারণের অদ্ভুত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাতে কল্পিত স্বরূপ আরোপ করেন, তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানান্ধ।

"(২) যাঁহারা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়-স্বরূপ বিশ্বকারণকে বিজ্ঞাত ও বিজ্ঞেয়স্বরূপ বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারাই প্রকৃতরূপ অপ্রকৃতবাদী।—বস্তুতঃ বিশ্বকারণের জ্ঞানানুসন্ধান-বিষয়ে যিনি যত অগ্রসর হইতে চেষ্টা করুন না কেন, তদীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট হইতে ততই দূরস্থ হইতে থাকে।

"All Philosophy is an arch wherethrough gleams that untravelled world, whose margin fades for ever as we move."

— [G. H. Lewes.]

"মনুষ্যেরা ঐ অতি বিষম সঙ্কট কখন উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই ও কখন পারিবেনও না। কোন পারসীক পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন, এই জগতের নিগূঢ় মর্ম্ম কেহ কদাচ যুক্তি-যোগে উদ্ভেদ করেন নাই, ও কেহ কস্মিন্‌কালে করিবেনও না। সমুদায় ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ীরা চিরকালই বুদ্ধি-শক্তিকে ভয় করিয়া আসিয়াছেন, ইহা প্রসিদ্ধই আছে। জ্ঞান-ব্রত উপনিষদ্‌বক্তারাও তাহাতে বর্জ্জিত নহেন।

"নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া।"

— (কঠোপনিষদ্‌। ২।৯।)

"এই যে আত্ম-জ্ঞান, ইহা তর্কে পাওয়া যায় না।

"যদি বিশ্ব-কারণের স্বরূপ ও পারলৌকিক অবস্থার বিষয় নির্দ্ধারণ করা পরমার্থ বিদ্যার উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মনুষ্যেরা ঐ উপনিষদ্‌-লব্ধ তর্ক-শাসনকে অতিক্রম করিয়া বুদ্ধিচালনা করাতে, উত্তর কালে বিজ্ঞান-বিৎ পণ্ডিতগণের প্রধানতম সম্প্রদায়-বিশেষের ভুবন-বিজয়ী মত-প্রভাবে ঐ বিদ্যাকে যারপর নাই বিপদাপন্ন হইতে

* চুপী-নিবাসী রঘুনাথ রায় দেওয়ান মহাশয়ের বিরচিত।

† অর্থাৎ জগতের জীবগণের।

হইয়াছে বলিতে হইবে। কিন্তু তাহার অন্যথা ঘটনারই বা উপায় ও সম্ভাবনা কি? বুদ্ধি ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে অধিকার থাকাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব জন্মিয়াছে। বিশুদ্ধ বুদ্ধি তত্ত্ব-লাভের একমাত্র সোপান। বুদ্ধি-বিচার ব্যতিরেকে তত্ত্ব-নিরূপণ করা, আর চক্ষু কর্ণ ব্যতিরেকে দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া, উভয়ই তুল্য। কোন্ বিষয়ে আমাদের স্বভাব-সিদ্ধ আত্ম-প্রত্যয় আছে, আর না আছে, তাহাতেও মনুষ্যের এত ভ্রম ও এত মত-ভেদ জন্মে যে, তাহারও নিশ্চয় করা বিচারাধীন হইয়া উঠিয়াছে। কুসংস্কার-শূন্য বিশুদ্ধ বুদ্ধি, জ্ঞানরূপ পুণ্য-তীর্থের যে স্থানে বা যে অবস্থায় লইয়া যায়, সেই স্থানে ও সেই অবস্থায়ই যাইব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়া যে সমস্ত তেজস্বি-বুদ্ধি, মনস্বী ব্যক্তি বুদ্ধি চালনা করেন, তাঁহারাই প্রকৃত রূপ তত্ত্বানুরাগী। পরিশুদ্ধ যুক্তি-প্রণালী যে কিছু তত্ত্ব উদ্ভাবন করে, তাঁহারা কেবল তাহাকেই কল্যাণকর ও পরম-পুরুষার্থ বোধ করিয়া জ্ঞান-রূপ অমৃতরস-পানে পরিতৃপ্ত হন। যাঁহারা ঐ রূপ বোধ না করেন, তাঁহারা কদাচ তত্ত্বানুরাগী নহেন, আপনাদের মনঃ-কল্পিত মতের ও চির-সঞ্চিত কুসংস্কারেরই অনুরাগী। কিন্তু তাঁহাদের অপরাধই বা কি? অবনীমণ্ডলে কয় ব্যক্তি বিশুদ্ধ ও সতেজ বুদ্ধির বীজ লইয়া জন্ম গ্রহণ করে? বহু-বোধাভিমানী পুস্তক-বাহা অবোধের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নয় বটে, কিন্তু নিরপেক্ষ-বুদ্ধি-শালী সুদৃঢ়-চিত্ত প্রধান লোক অতি মাত্র বিরল। ভ্রম অতি সুলভ পদার্থ, অক্লেশে ও অজ্ঞাতসারে অনাহূতই উপস্থিত হয়।

"There are few delusions that a man cannot be brought to believe; if they injure neither his stomach nor his purse"—[*Times.*]

"ইহার অধিকও দেখিতে পাইতেছি, অনেকে অর্থ ব্যয় ও শরীর ক্ষয় স্বীকার করিয়াও, ভ্রান্তি-মরীচিকার উদ্দেশে পরি-ভ্রমণ করেন।

"Men rarely recount 'facts simply as they happened, but mingle their own opinions with them; more especially if the facts are above their comprehension, and connected with religious interests.'—[*Spinoza.*]"

—(ভারতবর্ষীয়-উপাসক সম্প্রদায়, প্রথম ভাগের উপক্রমণিকার ৯৯—১০৩ পৃষ্ঠা।)

এখন অপক্ষপাতী পাঠকেরা বুঝিয়া দেখুন, উল্লিখিত অংশে যাহা প্রকটিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দিগ্ধ, ইহা সপ্রমাণ হইল কি না।

(৫) বেকন্ ও কোম্তের প্রতি দত্তজের কোন কোন বিশেষ কারণে শ্রদ্ধা ছিল। সেই ভাব, তিনি নিজ-অন্তঃকরণে প্রচ্ছন্নও রাখেন নাই। বেকন নীতিপরায়ণ ছিলেন না এবং কোম্তের ধর্ম্ম-বিশ্বাস-সম্বন্ধে লোকের বিরক্তি আছে জানিয়াও, অক্ষয় বাবু কি কারণে তাঁহাদের উপর ভক্তি প্রদর্শন করেন, সকলেরই জানিবার অধিকার আছে। এ সম্পর্কে আমাদের মতামত শোনা অপেক্ষা দত্ত মহাশয়ের লেখা পাঠ করাই বিধেয়।

অক্ষয় বাবু কহিয়াছেন,—

"উল্লিখিত রূপ দার্শনিক গ্রন্থকারেরা অনেকেই সতেজ বুদ্ধির সুপুষ্ট বীজ লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তত্ত্বানুসন্ধানের প্রকৃত পথাবলম্বন পূর্ব্বক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-মার্গে বিচরণ করিতে পারিতেন, তবে বহু-কাল পূর্ব্বে ভারত-ভূমিও ইয়ুরোপ-ভূমির

ন্যায় এ অংশে ভূ-স্বর্গ-পদে অধিরূঢ় হইতেন, তাহার সন্দেহ নাই। তাঁহারা বিশ্বের যথার্থ প্রকৃতি ও সেই প্রকৃতিসিদ্ধ নিয়মাবলি নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণের নিশ্চিত উপায় চেষ্টা না করিয়া কেবল আপনাদের অনুধ্যান-বলে দুই একটী প্রকৃত মতের সহিত অনেকগুলি মনঃকল্পিত মত উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের একটী পথপ্রদর্শকের অভাব ছিল। একটী বেকন—একটী বেকন্ একটী বেকন্—তাঁহাদের আবশ্যক হইয়াছিল। একটী তাদৃশ গুরুর আশ্রয়-বিরহে তাঁহারা মেঘাচ্ছন্ন ও তিমিরাবৃত নিশীথ সময়ে দুর্গম বনস্থলে পথভ্রান্ত পথিকের ন্যায় চিরজীবন পরিভ্রমণ করিয়াছেন। যদিও কদাচিৎ এক এক বার ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুল্লতা প্রকাশিত হইয়া অন্ধকারের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়, পরক্ষণেই আবার ঘোরতর তিমির-রাশি উপস্থিত হইয়া সমুদায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। তাঁহাদের চিরস্থায়ী সূর্য্যপ্রভা আবশ্যক ছিল। সহস্র সেনাদল সুসজ্জীভূত হউক, সুকৌশলক্রমে ব্যূহ-সমুদায় রচিত হউক, সুতীক্ষ্ণ শাণিত অস্ত্রের তড়িৎ-সমান জ্যোতিঃ-প্রকাশে রণস্থল চক্মক্ করিতে থাকুক, রণ-পণ্ডিত সেনাপতি না থাকিলে, সে সকলেই বিফল ও বিশৃঙ্খল। একটী রণজিৎ—একটী বোনাপার্ত—একটী ওয়াশিংটন আবশ্যক! ধী-শক্তি-অংশে তাদৃশ পরাক্রমশালী, দিগ্বিজয়ী, বীর পুরুষ প্রাপ্ত হইলে, ভারতভূমি অক্লেশে অজ্ঞানের অধিকার হরণ করিয়া বিজ্ঞানকে সিংহাসন প্রদান করিতে পারিতেন। কিন্তু বুঝি এ জল-বায়ু-মৃত্তিকায় প্রকৃত তত্ত্ব-পথ-প্রদর্শিনী, যুগপ্রলয়কারিণী, নবোদ্ভাবিনী, মহীয়সী বুদ্ধিশক্তির সমুদ্ভব হওয়া সম্ভব নয়! সে ব্যাপারটী বুঝি ইয়ুরোপেরই কার্য্য। রত্নগর্ভা ইয়ুরোপ দুই কালে যে রূপ দুইটি অমূল্য রত্ন প্রসব করিয়াছেন, সেরূপ আর কস্মিন্ কালে কুত্রাপি হয় নাই। বেকন্ ও কোম্ত দুই ভূখণ্ডের উপর দুই সূর্য্য। ঐ দুইটী পরম পবিত্র জ্যোতির্ম্ময় শব্দ মূর্ত্তিমান্ জ্ঞানেরই সংজ্ঞা। ঐ দুইটী নামের উজ্জ্বল মহিমায় বসুন্ধরা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছেন। ঐ উভয়ের অতি শুভ্র কিরণ-ঘটা বিকীর্ণ হইয়া অভূতপূর্ব্ব অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করিতেছে;—নিশান্ধকারে আচ্ছন্নবৎ অপরিজ্ঞাত বিশ্বপ্রকৃতির তিমির-পুঞ্জ হরণ করিয়া অভ্যন্তর পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত করিয়াছে, মানব-বুদ্ধির অধিকার সীমা-নির্দ্দেশ করিয়া পরম পরিশুদ্ধ তত্ত্ব-গিরি আরোহণে সুপ্রশস্ত সরল পথ প্রস্তুত হইয়াছিল।—এবং তদবলম্বন পূর্ব্বক সামান্য জলকণ-সমূহে শত সহস্র মত্ত হস্তীর বল অর্পণ করিয়াছে, সুচঞ্চল বিদ্যুল্লতাকে বশবর্ত্তিনী করিয়া দূত, ভাট ও ধাবকের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূর্য্য-কিরণকে অবরুদ্ধ করিয়া সুনিপুণ চিত্রকরের ব্রতে ব্রতী করিয়াছে, বিশাল ভূধরশ্রেণীকে এক কালের জলধি-গর্ভ বলিয়া নিঃসংশয়ে পরিচয় দান করিয়াছে ও যেন কি কুহকবলে অকিঞ্চিৎকর অঙ্গার-খণ্ডকে রাজমুকুট-বিরাজিত জগদ্বিখ্যাত কোহিনুরের পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।—তথাপি, সুপ্রাচীন দার্শনিক পণ্ডিতগণ! তোমরা পূর্ব্বকালীন বুদ্ধিমান্ লেখকের মধ্যে অগ্রগণ্য। তোমরাই মনুষ্যের বুদ্ধিচালনার পথ প্রদর্শন করিয়াছ। তোমাদের বিচার-প্রণালীর ও তাহার ফলাফল পর্য্যালোচনা করিয়া বিজ্ঞানবিৎ বিশুদ্ধ-

বুদ্ধি ব্যক্তিরা মানব-কুলের জ্ঞানাধিকারের চরম সীমা অক্লেশে নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু তোমরা যে কয়েকটী মূল বিষয়ের * তত্ত্বানুসন্ধানে অনুরক্ত ছিলে, তাহা মনুষ্যের জ্ঞেয় বিষয় নয় এবং যে তীর্থ-পর্য্যটনে † প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তাহাও তাঁহার অধিগম্য নয়।"—[২য় ভাগ ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা, ৫১—৫৩ পৃষ্ঠা।]

ধর্ম্ম-নীতি-বিষয়ক সহস্র ত্রুটি সত্বেও, বেকন্ ও কোম্ত জ্ঞানাংশে পরম পূজ্য, ইহাতে বিশুদ্ধ-বুদ্ধি কোন সমদর্শী ব্যক্তিরই আপত্তি নাই। অক্ষয় বাবু জ্ঞানের উৎকর্ষ প্রতিপাদনের অনুরোধে এখানে তাঁহাদের পূজা করিয়াছেন মাত্র।

(৬) বুদ্ধদেবকেই বা তিনি কি নিমিত্ত ভূয়িষ্ঠ-বুদ্ধি,"ন? এই প্রশ্নও এই উপলক্ষে জিজ্ঞাসিত হইতে পারে। যে যে কথায় ও যে জন্য বুদ্ধের প্রশংসা করা হইয়াছে, তাহা এই,—

"হিন্দু ধর্ম্ম আবহমান কাল প্রচলিত ছিল, ইতি-মধ্যে একটি মহার্থকরী মহীয়সী ঘটনা উপস্থিত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মের ইতিহাসকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দেয়। তাহাতে ধর্ম্ম-বিষয়ের বিষম বিপ্লব ঘটিয়াছে, বলিতে হয়। সেইটি বেদ ও বর্ণাভিমানের মস্তকোপরি পদাঘাতকারী বৌদ্ধ-ধর্ম্ম প্রকাশ বৈ আর কিছুই নয়। অসাধরণ মানসিক বীর্য্য কেবল ইয়ুরোপেই উৎপন্ন হয়, এমন নয়। এক কালে ভারত-ভূমিতেও আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় মানবীয় মনের অন্তর্ভূত প্রজ্বলিত অগ্নিরাশি সতেজে বিনির্গমন পূর্ব্বক চারি দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া ভূমিকম্প উৎপাদন করিয়াছিল। সেই মহাপ্রবল বৌদ্ধ ধর্ম্ম আবির্ভূত হইয়া হিন্দু-ধর্ম্মকে কম্পিত করিয়া দেয়।"

—(ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগ, উপক্রমণিকা, ২৩৩ পৃষ্ঠা।)

সাধারণ্যে বুদ্ধদেবের উক্ত প্রকার সুখ্যাতি শ্রবণে অক্ষয়কুমার দত্তকে নাস্তিক স্থির করিলেন কি? ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দেখিয়া রুষ্ট না হইয়া বরং সকলেই তুষ্ট হইবেন, এরূপ আশা করা কি অসঙ্গত? বুদ্ধদেব নাস্তিক, কি আস্তিক, এই অংশেই মত-দ্বৈধ রহিয়াছে। বুদ্ধ নাস্তিক ছিলেন, যদি এই সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলেও উল্লিখিত প্রশংসা কোন আস্তিকেরই পক্ষে দূষণীয় নয়।

(৭) বৌদ্ধধর্ম্মের গুণানুবাদ ও সেই সঙ্গে হিউম, মিল্ প্রভৃতির যে বর্ণনা রহিয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া দত্ত মহাশয়ের উদারতার অত্যুজ্জ্বল আভাস লক্ষিত হইতে থাকে। এস্থলে তাহাও আলোচিত হইল।—

"দেবগণ-প্রিয়, প্রিয়দর্শী রাজা ইচ্ছা করিতেছেন, সমস্ত পাষণ্ড (অর্থাৎ বৌদ্ধ-ধর্ম্মে আস্থাশূন্য ব্যক্তি সমুদায়) সর্ব্বত্র (নির্ব্বিঘ্নে) বাস করুক; কেননা তাহারাও ভাবশুদ্ধি ও ধর্ম্মশাসন ইচ্ছা করে।

"অবনি-মণ্ডলের অপরাপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ীরা এ অংশে যদি অশোকের পদ-রেণু-কণা-মাত্র গ্রহণ করিতে পারিতেন, তবে অসংখ্য লোকের ধর্ম্মদ্বেষ নিবন্ধন অকালে কালগ্রাস-প্রবেশ নিবারিত হইত। বৌদ্ধগণ-সংহারক, আস্তিক-প্রবর ব্রাহ্মণ-

*"বিশ্বকারণের স্বরূপ, আদিম সৃষ্টি-প্রকরণ ইত্যাদি বিষয়ের।"

† মুক্তি প্রভৃতি পারলৌকিক অবস্থার জ্ঞান-লাভে।"

কুল! এই নাস্তিক নরপতির সুপবিত্র গুণ-গ্রাম শ্রবণ কর, আর লজ্জায় অধোমুখ হইয়া ধরণী-গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে থাক। উগ্রমূর্ত্তি শৈব ও বৈষ্ণ-বজমাতের ভয়াবহ তীর্থ-স্নানে ধিক্! ধিক্! ধিক্! খ্রীষ্টান-দিগের শোণিতাক্ত, মুণ্ড-মালা-বিভূষিত, ভয়ঙ্কর ক্রুসেড্ যুদ্ধের ক্রস্ চিহ্নেও ধিক্! স্বসম্প্রদায়ের পক্ষপাত-মদে উন্মত্ত, দুর্দ্দান্ত, মোসলমান্ সম্প্রদায়ের কর-সঞ্চালিত, চাকচিক্যশালী, সুতীক্ষ্ণ তরবারেও ধিক্!

"অশোক প্রচারিত ধর্ম্মপ্রণালীর যৎ কিঞ্চিত স্থূল তাৎপার্য্য মাত্র লিখিত হইল। ইহা মনুষ্যকুলের স্বভাবসিদ্ধ সাধারণ ধর্ম্ম; মনঃ-কল্পিত নয়। জাতি-ভেদ ও বর্ণ প্রভেদও ইহার বৈরী ও বিদ্বেষী নয়। কি হিন্দু, কি খ্রীষ্টান, কি মোসলমান্ কেহই এ ধর্ম্মের বিরোধী নয়। বেদ, কোরাণ ও বাইবেল্ এই ধর্ম্মকে যত দূর লালন পালন ও পরিপোষণ করিয়া আসিয়াছে, প্রধানতম বিজ্ঞ সম্প্রদায়ের নিকট তত দূর আদরণীয় ও পূজনীয়। ঋষি, মুনি, পীর পয়গম্বর, সেন্ট সেবিয়র্ ইহাঁরা যে পরিমাণে এই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও মহিমা প্রচার করিয়াছেন, সেই পরিমাণে প্রকৃত পুণ্যকীর্ত্তি-লাভে অধিকারী হইয়া রহিয়াছেন। অধুনাতন মানবকুলের বুদ্ধি-বিদ্যার পথ-প্রদর্শক কোম্ভ ও হিউম্, ডারুইন্ ও হকস্‌লি, মিল্ ও স্পেন্সার্ ইহাঁদেরও এই ধর্ম্মকে আপনাদের সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম বলিয়া পরিচয় দান এবং তাহাতে উৎসাহ ও আহ্লাদ প্রকাশ না করিবার বিষয় নয়।"—(ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের উপক্রমণিকা, ২৪৫ ২৪৬ পৃষ্ঠা।)

অশোকের মহোদার্য্যের ভূয়সী সুখ্যাতি করা সকল ধর্ম্মাবলম্বীদেরই কর্ত্তব্য। গুণ-গ্রাহী দত্ত মহাশয় তাহাই উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া নিজের ঔদার্য্য ও মহত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

(৮) ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্তের এক স্থানে অক্ষয় বাবুকে স্পষ্টাক্ষরে সাম্প্রদায়িক বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। ইহারও মীমাংসা হওয়া উচিত বিবেচনা করিয়া, ইতিবৃত্তের সেই স্থানের উক্তি নিম্নে মুদ্রিত হইল,—

"যৎকালে অক্ষয় বাবু ব্রাহ্মসমাজে থাকিতেন, তাঁহার শুষ্ক বৌদ্ধধর্ম্মের ভাব, সকলকে খ্রীষ্টবিদ্বেষী করিয়াছিল। অক্ষয় বাবুর প্রখর বুদ্ধি ও তর্কশক্তি-প্রভাবে একদিকে যেমন দেবেন্দ্র বাবু ও অন্যান্য সভ্যগণের অনেক কুসংস্কার, ভ্রম অপনীত হইয়াছিল, তেমনই অপর দিকে অন্য ধর্ম্মের সাধুদিগের সহিত ব্যবহার-সম্বন্ধে অতি ভয়ানক মত প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে বিষম-ঘৃণানল তিনি উদ্দীপন করিয়া দিয়াছিলেন। যে সময় মিসনরিরা এ দেশে অনেকানেক ভদ্র সন্তানকে খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেন, তখন ঐ সকল পুরাতন ব্রাহ্মদের মনে বিষম বিদ্বেষ-অগ্নি প্রজ্বলিত হয়। তৎকাল-কার তত্ত্ববোধিনী অন্বেষণ করিলে দৃষ্ট হইবে যে, অক্ষয়বাবু একবার এই বিষয়ে এমন কয়েকটি প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন, যাহা পাঠ করিলে তাঁহাকে অত্যন্ত বিদ্বেষপূর্ণ সাম্প্রদায়িক বলিয়া বোধ হয়। কথিত আছে যে, তাঁহারই দ্বারা দেবেন্দ্র বাবুর মনে খ্রীষ্টের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব অঙ্কুরিত হইয়াছে। খ্রীষ্টের প্রতি দেবেন্দ্র বাবুর এমনই ক্রোধ যে, বোধ হয় তিনি তাঁহাকে পাইলে, শত বার ক্রুশে বিদ্ধ করেন।"—(ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত, ২৭১ ও ২৭২ পৃষ্ঠা।)

কি হেতু দত্তজকে ঐ প্রকার করিতে হয়, শ্রীমান্ লিওনার্ড তাহা সবিস্তর এই রূপ লিখিয়াছেন,—

"The occurrence of another event the kidnapping of Umes Chander Sircar, a boy of 14 years of age, with his wife, a girl of eleven, by Missionaries, and their ill-advised Christening of boys under age, irritated the Hindu Community to the utmost degree. The boy was released by recourse to the Habeas Corpus Act and strenuous efforts were made to arrest Missionary attempts at proselytism. Devendra Thakur took the lead in these efforts and his right-hand man at the time, Akshaykumar Datta, made eloquent & inflammatory appeals to the Hindu Community severely condemning the proceedings of the Missionaries, all of which were published in the Patrika of the time."—[Leonard's History of the Brahma Samaj, p 83.]

এমন স্থলে ঐ রূপ লেখা তাদৃশ দোষাবহ নয়। স্বয়ং অক্ষয় বাবু কি বলিয়া মিশনরিগণের প্রতি অভিযোগ করেন, তাহা না পড়িয়া ইহার কোন সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। সুতরাং এখানে তত্তৎ স্থল উদ্ধৃত করা গেল। ১৭৬৬ শকের চৈত্র মাসে ও ১৭৬৭ শকের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসের পত্রিকায় ঐ বিষয় লিখিত হয়। ১৭৬৬ শকের চৈত্রের পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিবার উপযুক্ত কিছুই নাই। প্রস্তাবিত বৃত্তান্তের যত দূর আবশ্যক, তাহা এই,—

"অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পর-ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে লাগিল। * * আর কত কাল আমরা অনুৎসাহ-নিদ্রায় অভিভূত থাকিব? * * হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লোপ হইবার সম্ভাবনা হইল। মিসনরিদিগের দৌরাত্ম্য এ পর্য্যন্ত সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে সহিষ্ণুতার সীমার বহি-র্ভূত হইয়াছে। পূর্ব্বাবধি তাহারা কেবল কৌশল-জাল বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাহার সহিত প্রবল অন্যায় আচরণ সকল মিশ্রিত করিল। * *

"১৪ চৌদ্দ-বৎসর-বয়স্ক বালিকা ধর্ম্ম-বিষয়ে কি বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়? ইহাদের ধর্ম্মচ্যুত করা কি ন্যায়যুক্ত ব্যবহার হইতে পারে? * * সে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই, অথচ কি প্রকারে নিয়ম দ্বারা পিতার শাসন হইতে বহিষ্কৃত হইল? ইহাতে কি বিচারের অন্যথা দৃষ্ট হইতেছে না? * * যখন রাজার এই প্রকার অত্যাচার ও নির্দ্দয় ব্যবহার হইল, তখন স্বার্থপর মিসনারিরা অত্যাচারী না হইবে কেন? * * সকলের আশ্রয় দ্বারা যখন নগর-মধ্যে এবং তদ্দৃষ্টে ভারতবর্ষের স্থানে স্থানে উত্তম বিদ্যালয় হিন্দুমতানুসারে প্রতিষ্ঠিত হইবে, * * তখন আর ভদ্র-সন্তানদিগের কাল্পনিক খ্রীষ্টান ধর্ম্মভুক্ত হইবার সম্ভাবনাও থাকিবে না।"—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৭ শক, জ্যৈষ্ঠ।]

"সর্প-শিরে আঘাত করিয়া তাহাকে সজীব পরিত্যাগ করিলে, প্রতিহিংসা করিতে কি সে বিলম্ব করে? কাল-সর্প মিসনরিদিগের শাসন না করিলে, তাহারা ভবিষ্যতে বল বা ছল পূর্ব্বক আমাদিগের সন্তানদিগকে **খ্রীষ্টধর্ম্মের বিষপান** করাইতে নিমেষ-মাত্রও কি গৌণ করিবে?"
—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৬৭ শক, আষাঢ়।]

মিসনরিদিগকে দত্তজ স্থানে স্থানে 'পাষাণ চিত্ত' 'স্বার্থপর' বলিয়াছেন। এ স্থলে 'খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিষ' উক্তিই বিশেষ

দোষাবহ। যে উপলক্ষে উহা লিখিত হয়, তাহা স্মরণ করিলে, আর তাঁহার প্রতি দোষারোপ করিতে ইচ্ছা হয় না। যাহা হউক, তাঁহার এই দূষিত সাম্প্রদায়িক মত যে উত্তর কালে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, পশ্চাদ্বর্ণিত স্থলেই তাহার নিদর্শন রহিয়াছে।

"কঠ ও তলবকার, মুসা ও মহম্মদ এবং য়ীশু ও চৈতন্য পরমার্থ-বিষয়ে যে কিছু তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম!"—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৭ শক, বৈশাখ।]

যীশু-প্রচারিত মতও ব্রাহ্মধর্ম্ম, এখানে অক্ষয় বাবু তাহা ভক্তিভাবে শিরোধার্য্য করিয়াছেন।

(৯) অক্ষয়কুমার দত্ত মহোদয়ের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, নির্দ্দেশ করাতে, অনেকেই বুঝিয়াছেন, ব্রাহ্মসমাজের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণের পর ঐ রূপ ব্যাপার ঘটে। যখন তিনি ব্রাহ্মসমাজে সাংবৎসরিক বক্তৃতা পাঠ করিতেন, তখনকার একটী বিষয় দেখিলেই, এ বিষয়ের নিষ্পত্তি হইয়া যাইবে। কেবল আত্মীয় সভাতেই, তিনি "সর্ব্বশক্তিমান" শব্দের পরিবর্ত্তে "বিচিত্র-শক্তিমান" শব্দ প্রয়োগ করিতে উদ্যত ছিলেন, এমন নহে,—১৭৭২ শকের বার্ষিক প্রথম বক্তৃতার এক স্থানে রহিয়াছে,—

"যে দেশীয় কোন ব্যক্তি একমাত্র, অদ্বিতীয়, **বিচিত্র শক্তিমান**, সর্ব্বাবয়ববর্জ্জিত, সৃষ্টি-স্থিতি-ভঙ্গ-কর্ত্তা, ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল-প্রদাতা পরাৎপর পরমেশ্বরে প্রীতি করেন, এবং তাঁহারই প্রীত্যর্থে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সমুদয় সাধন করিতে প্রবৃত্ত থাকেন, অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন, এ সমাজ তাঁহারই উপাসনা স্থান।"—(তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭২ শকের বক্তৃতা।)

(১০) অক্ষয় বাবুর বিপক্ষ পক্ষের কেহ কেহ বলেন, তাঁহার লেখায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সেরূপ ছিলেন না। ইহার উত্তর দিবার প্রয়াস পাওয়া বৃথা। তিনি যদি কপট ব্যক্তি হইতেন, তবে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত সরল ভাবে কেন ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন? যিনি যাহাই বলুন, দত্তজ নিতান্তই নির্ভীক ও স্পষ্ট-বক্তা লোক ছিলেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-সংস্থাপক রাজা রামমোহন রায়কে, যেমন হিন্দুরা হিন্দু, মুসলমানেরা মৌলবী, ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টানেরা খ্রীষ্টান বলিতেন, অক্ষয় বাবু-সম্বন্ধে কিয়ৎ পরিমাণে তাহাই অবলোকিত হইতেছে। ধ্রুববাদীরা তাঁহাকে ধ্রুববাদী, নাস্তিকেরা নাস্তিক, ব্রাহ্মেরা ব্রাহ্ম, অপর কেহ কেহ সংশয়-বাদী কহিতেছেন। তিনি যে বস্তু ছিলেন, এই দুই প্রস্তাবে তাহা প্রতিপন্ন হইল। পাঠকগণ স্বাধীন ভাবে যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া স্থির করিলেন, তাহাই গ্রহণ করুন।

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

হিন্দু সমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা।

(৮ম প্রস্তাব)

আমরা ইতিপূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের পৌত্তলিকতারূপ অপবাদ দূরীকৃত করিবার নিমিত্ত প্রয়াস পাইয়াছি, এক্ষণে ইহা যে অবতারবাদমূলক ধর্ম্ম নহে, তাহা প্রতিপাদনে প্রবৃত্ত হইতেছি। অরূপ-অমূর্ত্ত্য-পরমেশ্বর কোন গুরুতর নিমিত্তবিশেষের বশবর্ত্তী হইয়া নরকুলের কল্যাণ সাধন জন্য মনুষ্য বা অপর কোন প্রাণীর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত সময়ে সময়ে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, এ কথা একান্ত যুক্তি ও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া মনে করি। যদি হিন্দুজাতির ধর্ম্মশাস্ত্রের কোন কোন অংশে এই মতের সমর্থন পক্ষে শ্লোক সকল বিন্যস্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ইহা যে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের সমন্বয়সিদ্ধ অবিসম্বাদিত মত নহে, তাহা নিরপেক্ষ চিত্তে আলোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায়। এ প্রকার অবতারবাদ আদৌ অসঙ্গত।

কিন্তু এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার অবতারবাদ আছে, যাহা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। মানবপ্রকৃতি ঈশ্বরপ্রকৃতির অনুকৃতি মাত্র, সুতরাং ইহার মধ্যে ঈশ্বরের কোন কোন স্বরূপ অপূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ধর্ম্ম আর কিছুই নহে, মানবপ্রকৃতি যে পরিমাণে ঈশ্বর-প্রকৃতিতে পরিণত হয়, সেই পরিমাণেই মনুষ্যের ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। পরমেশ্বর যে ধৈর্য্যরূপে, তিতিক্ষারূপে, পুণ্যরূপে, নিষ্কলঙ্ক প্রেমরূপে মানবপ্রকৃতির অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারেন? সেই অনন্ত স্বরূপিনী বিশ্বব্যাপিনী পরমাশক্তি যেমন মানবপ্রকৃতির মধ্যে অবতারিত হইয়া বাস করিতেছেন, সেই রূপ এই বিশাল জড়জগতের প্রত্যেক পদার্থ, এমন কি প্রত্যেক পরমাণুর ভিতরে শক্তিরূপে এবং প্রাণরূপে অবতীর্ণ হইয়া রহিছেন। সেই জন্য প্রাচীনকালের ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ ঋষি বলিতেছেন "প্রাণহ্যেষয়ঃ সর্ব্বভূতৈর্ব্বিভাতি" অর্থাৎ সেই পরমাত্মা সর্ব্বভূতের মধ্যে প্রাণরূপে বিরাজ করিতেছেন। এপ্রকারের অবতারবাদ অবশ্য স্বীকার্য্য।

হিন্দুশাস্ত্রে দশাবতারের প্রসঙ্গ আছে, কিন্তু হিন্দুদিগের অবতার সংখ্যা ক্রমশই দশোত্তর সংখ্যায় পরিণত হইতেছে। যাহা হউক, শাস্ত্রের বর্ণনা পাঠে এইরূপ অনুভূত হয় যে, ভগবান মৎস্য, বরাহ, কচ্ছপ, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি নানা রূপে ধরিত্রী পৃষ্ঠে দশবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিকুলের চূড়ামণিস্বরূপ লালিত্যসিন্ধু জয়দেব তাঁহার দশাবতার স্তোত্রে বিষ্ণুকেই দশাবতার রূপে বর্ণনা করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার মতে বিষ্ণুই ভূমণ্ডলের দুঃখভার মোচনার্থ মৎস্যাদিরূপে দশবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু এবিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রকার বিভিন্ন মতের প্রকটন করিয়াছেন। মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত ১৮৭ অধ্যায়ে মৎস্যকে ব্রহ্মার অবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং মৎস্যপুরাণ ও ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে মৎস্য বিষ্ণুর অবতাররূপে কথিত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে কূর্ম্ম প্রজাপতির অবতাররূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু

পুরাণাদি অপ্রাচীন গ্রন্থে কূর্ম্মাবতার সম্বন্ধে এইরূপ উল্লেখ আছে যে, দেবাসুরে মিলিত হইয়া সিন্ধুমন্থনে প্রবৃত্ত হইলে মন্দর পর্ব্বত মন্থনদণ্ডরূপে এবং নাগরাজ বাসুকি রজ্জু-রূপে গৃহীত হইল, তখন কূর্ম্মরূপী ভগবান বিষ্ণু নিজের পৃষ্ঠদেশে মন্দরগিরিকে ধারণ করিলেন। এস্থলে কূর্ম্মকে বিষ্ণুর অবতার রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এইরূপ শাস্ত্র-কারেরা অন্যান্য অবতার সম্বন্ধেও বিভিন্ন-রূপ মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, হিন্দুধর্ম্মের বিস্তৃত ইতিহাসে এক দেবতা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্রহ্মাদি নামত্রয়ে পরিগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এতদ্দ্বারা পরিষ্কাররূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে সময়ে ব্রহ্মার দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সময়ে যে অবতারের প্রসঙ্গ উঠিয়াছে, তখন তাহাকে ব্রহ্মার অবতাররূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার ব্রহ্মার দেবত্ব যখন তিরোহিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে বিষ্ণুর দেবত্ব প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে, তখন তাহাকেই পুনরায় বিষ্ণ্বতার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই-রূপে এক অবতারকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ের রচিত গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার অবতার বলিয়া বর্ণন করা যে হিন্দুশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষিগণের ধর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, তাহা এখন সহজেই বুঝা যাইতেছে।

বহুদিন হইতে কৃষ্ণ হিন্দুসমাজে ঈশ্বরের পূর্ণাবতার বা স্বয়ং ঈশ্বররূপে পূজিত হইতে-ছেন। কিন্তু একেবারেই যে কৃষ্ণের এই রূপ পূর্ণ দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা নয়;—কারণ বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতের নানা স্থলে কৃষ্ণকে ঈশ্বরের অংশরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃষ্ণ কোন বৈদিক দেবতা নন, বেদের পরিশিষ্ট স্বরূপ উপনিষৎ অংশে অর্থাৎ কেবল ছান্দোগ্যোপনিষদের এক স্থানে কৃষ্ণের নামোল্লেখ মাত্র আছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন দেবত্ব বা অবতারত্বে কথা লিখিত নাই। মহাভারত ও পুরাণাদির সকল স্থানেই যে কৃষ্ণের পূর্ণ ঈশ্বরত্ব প্রতি-ষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা নহে। মহাভারতের যে সময়ে দুর্য্যোধন ও কর্ণাদি বীর পুরু-ষেরা কৃষ্ণকে বন্ধন করিতে প্রতিজ্ঞাপরায়ণ হয়েন, যে সময়ে কর্ণ মদ্রপতি শল্যকে কৃষ্ণ অপেক্ষা গুণবান ও বীর্য্যবান বলিয়া বর্ণন করেন, রাজসূয় সভায় অর্ঘ্য প্রদান করিতে দেখিয়া যে সময়ে নির্ভীকচেতা শিশুপাল কৃষ্ণের প্রতি যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা ও অবজ্ঞাসূচক বাক্যাবলী প্রয়োগ করেন, সে সময়ে যে কৃষ্ণের দেবত্ব হিন্দুসমাজে অবিসম্বাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহা সহজেই জানা যাইতেছে। মহাভারতান্ত-র্গত *শান্তিপর্ব্বের ২৮১ অধ্যায়ে লিখিত* আছে, "এই অবিনশ্বর কেশব তাঁহারই অষ্টম অংশ-স্বরূপ জানিবে।" এস্থলে কৃষ্ণ, ভগবানের অষ্টম অংশরূপে কথিত হইতেছেন। বিষ্ণু-পুরাণে বর্ণিত আছে "হে মৈত্রেয়! বিষ্ণুর অংশের অংশস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের যে সমস্ত হিতকর কার্য্য সাধন করিয়াছেন, তুমি আমার নিকট তাহা জানিতে ইচ্ছা করিয়াছ" ইত্যাদি। ইহাতে তিনি বিষ্ণুর অংশের অংশরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত পুরাণের অন্য স্থলে পুরাণকর্ত্তা কৃষ্ণকে ভগবানের কেশোৎপন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; যথা—"পরমে-শ্বর দেবগণ কর্ত্তৃক এইরূপ স্তূয়মান হইয়া আপনার শুক্ল ও কৃষ্ণ দুইটি গাছি কেশোৎ-

পাটন করিলেন এবং দেবগণকে বলিলেন, আমার এই কেশদ্বয় ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া ভূলোকের ভার ও ক্লেশ বিমোচন করিবে। বসুদেবের দেবকী নামে যে ভার্য্যা আছে, আমার এই কেশ তাহার অষ্টম গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবে।" কৃষ্ণের পূর্ণত্ব প্রতিপাদনই যে ভাগবতের উদ্দেশ্য, সেই ভাগবতের স্থানে স্থানে কৃষ্ণকে পরমেশ্বরের অংশাবতার বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থের দশম স্কন্ধে এক স্থলে বর্ণিত আছে "অধর্ম্মদমন ও ধর্ম্মসংস্থাপন উদ্দেশে ভগবান পরমেশ্বর অংশাবতার (কৃষ্ণাবতার) হইয়াছেন।" এইরূপে কৃষ্ণসম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রে এত বিভিন্ন প্রকার মত সন্নিবেশিত আছে, যাহার সমস্ত সংগৃহীত হইলে এক খানি বিস্তৃত গ্রন্থ হইয়া উঠে। আমরা এস্থলে সে সমস্ত আহরণ না করিয়া তিনি যে স্বয়ং পরমেশ্বর অথবা তৎসমকক্ষ ব্যক্তি নহেন, ইহা তাঁহার নিজের জীবন দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছি।

যিনি স্থাবর জঙ্গমাদি-সম্বলিত বিশ্বচরাচরের উপাস্য পরমেশ্বর, তিনি আর কখন নিজে উপাসকের ন্যায় হীনভাবে অন্য কাহারও উপাসনা করিতে পারেন না। উপাসকের সহিত উপাস্যের সুদূর প্রভেদ এই জন্য যে, তাঁহারা উভয়ে সমান পদবীস্থ নহেন। শ্রীকৃষ্ণকে যদ্যপি সর্ব্বারাধ্য পরমেশ্বরের ভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে তিনি কখনও আর নিজের কল্যাণের জন্য অন্যের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইবেন না এবং হওয়াও তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। যদি দেখি যে যিনি বিশ্বের বন্দনীয় পরমেশ্বর, তিনি কখন ভগবানের ধ্যানে বা কখন তাঁহার চিন্তনে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন, তাহা হইলে দুই পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা স্বীকার করা যখন যুক্তিসঙ্গত ও শাস্ত্রানুমোদিত নহে, তখন তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে যিনি উপাস্য, তাঁহাকেই প্রকৃত ঈশ্বর ; এবং যিনি উপাসক তাঁহাকে সৃষ্ট ও পরিমিত মানবাত্মা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

মহাভারতের এক স্থানে বর্ণিত আছে ;—

সধ্যানপথমাবিশ্য সর্ব্বাজ্ঞানানি মাধবঃ।
অবলোক্য ততঃ পশ্চাৎ দধৌব্রহ্ম সনাতনং।
শান্তিপর্ব্ব। ৫৩ অ।

"অনন্তর ভগবান্ বাসুদেব সুখে প্রসুপ্ত ও যামিনী অর্দ্ধ প্রহরমাত্র অবশিষ্ট হইলে জাগরিত হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশ পূর্ব্বক জ্ঞান সমুদায় অবলোকন করিয়া সনাতন ব্রহ্মের চিন্তা করিতে লাগিলেন।" (কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ; শান্তিপর্ব্বের ৫৬ পৃষ্ঠা)।

শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপাদক ভাগবত গ্রন্থেও এইরূপ ভাবের পদ সকল দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

কাপি সন্ধ্যামুপাসীনং জপন্তং ব্রহ্ম বাগযতঃ।
ধ্যায়ন্তমেকমাত্মানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরং॥

অর্থাৎ নারদ গিয়া কৃষ্ণকে দেখিলেন যে, কোন স্থানে তিনি মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মমন্ত্র জপ করিতেছেন, কোথাও বা তিনি প্রকৃতিপর যে ব্যাপক পরমাত্মা তাঁহার ধ্যান করিতেছেন। যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে কৃষ্ণের উপাসকভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। যিনি উপাসক, তিনি যদি উপাস্য হইতে না পারেন, তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণব্রহ্মত্ব কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে? তিনি যে

স্বয়ং পরমেশ্বর নন, প্রত্যুত পরমেশ্বরের এক জন অনুগত উপাসকস্বরূপ ইহা তিনি নিজের জীবন দ্বারাই প্রতিপন্ন করিতেছেন। যাঁহারা মানবীয় স্বভাবসম্পন্ন মানব-ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে ঈশ্বর-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি ঈশ্বরোচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি সমর্পণ পূর্ব্বক মানবাধারে দেবত্ব-প্রতিষ্ঠিত করিতে কৃতসংকল্প হয়েন, তাঁহারা যে কেবল তদ্দ্বারা শাস্ত্রার্থের বিপর্য্যয় সাধন করেন, তাহা নহে, কিন্তু আরও তদ্দ্বারা ভূলোকে বহুকাল-বিস্তৃত অসত্যপাশ প্রসারিত করিয়া নরকুলের বিশুদ্ধ জ্ঞানাহরণের পথে বিষম বাধা প্রদান করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিতে অবশিষ্ট রহিল।অদ্য এই পর্য্যন্ত।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আত্মা ও অহংবৃত্তি*।

বিগত ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের ভারতীতে বেদান্তদর্শনের নূতন প্রকাশ প্রস্তাবে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু, পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের প্রকাশিত বেদান্তদর্শনের অনুবাদ সমালোচনা উপলক্ষে, আত্মা ও অহংবৃত্তি সম্বন্ধে যে প্রকার মতামত প্রচার করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য নিম্নে নিবেদন করিতেছি। এ বিষয়ে হিন্দুশাস্ত্র ও যুক্তি মতে প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি হইতে পারে, ভরসা করি সাধারণে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

উক্ত দর্শনের ব্যাখ্যারম্ভে বেদান্তবাগীশ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, "অহংবৃত্তির প্রতি বিশ্বাস কি? উহা কখনো দেহাদি অবলম্বন করিয়া উদিত হইতেছে, কখন বা কেবল মাত্র চৈতন্য অবলম্বন করিয়া থাকিতেছে।" শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার প্রতিবাদে বলেন যে, অহংবৃত্তিকে যদি বিশ্বাস নাই—তবে আত্মা বা চৈতন্য মাত্রকেই বা কি বিশ্বাস? অহংবৃত্তি ছাড়া আত্মা আর লক্ষীছাড়া লক্ষী, দুইই সমান কথা, যেহেতু অহংবৃত্তিই আত্মার এক মাত্র পরিচায়ক। বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের সহিত দ্বিজেন্দ্র বাবুর আর এক স্থলে বিরোধ এই যে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের "নায়ং একান্তে নাবিষয়ঃ অস্মৎ প্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ" এই উক্তির ব্যাখ্যা বেদান্তবাগীশ মহাশয় এই ভাবে করিয়াছেন যথা—সেই আত্মা স্বস্বরূপে নিরুপাধিক চৈতন্যস্বরূপ হইলেও অবিদ্যা-কল্পিত হইলে অহং উপাধি দ্বারা বিষয়ত্ব প্রাপ্ত হয়েন, অর্থাৎ অহংবৃত্তির বিলোপ না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি অবিষয় নহেন, যে হেতু তদবস্থায় তিনি অহং বৃত্তির বিষয় হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে এরূপ ব্যাখ্যা নিতান্তই অযৌক্তিক, তিনি কহেন যে, সাদা কথার ঐ রকম ঘুরাইয়া ব্যাখ্যা করিবার কোন

---

*এই সুন্দর প্রবন্ধটী ভারতীতে প্রকাশ করিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহাতে প্রকাশ না হওয়ায় নব্যভারতে প্রকাশিত হইল। ন, স,

আবশ্যক নাই,—কারণ ইহাতে শঙ্করাচার্য্যের অধ্যাসবাদের পাকা ভিত্তিমূল একেবারেই কাঁচিয়া যায়।

উক্ত প্রতিবাদে দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেন যে, আত্মাই অহংবৃত্তির অব্যভিচরিত বিষয় বা স্থির নিত্য অবলম্বন, অহংবৃত্তির বিষয়ত্ব হেতু তিনি আপনিই আপনার বিষয় সুতরাং তিনি স্বপ্রকাশ, অহংবৃত্তি-শূন্য আত্মা বা আমি কি রকম? না—শিরঃ নাস্তি শিরঃ পীড়াবৎ। যাঁহারা সমাধি অবস্থাকে অহং-বৃত্তিশূন্য অবস্থা বলিয়া মনে করেন, তাঁহা-দের মতে জ্ঞান=অজ্ঞান, আত্মা=অনাত্মা, এক=অনেক, অতএব তাঁহারা যে স্ববি-রোধী তাহা স্বতঃসিদ্ধ, পোষক প্রমাণ স্বরূপে নিম্নলিখিত কয়েকটী বচন দর্শান হই-য়াছে, যথা—

১ম। ফরাসীস দেশীয় দার্শনিক দেকার্ত্তের উক্তি "I think therefore I am."

২য়। সাংখ্যসার গ্রন্থে মহোপাধ্যায় বিজ্ঞান ভিক্ষুর বচন—"দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধোজ্ঞানেঽহমিতি ধীবলাৎ"

৩য়। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের উপরোক্ত বচন—"নায়ং একান্তে নাবিষয়ঃ অস্মৎ প্রত্যয়বিষয়ত্বাৎ"

৪র্থ। মহাদেবের সমাধি উপলক্ষে কালীদাসের কবিতা—"আত্মানমাত্মন্য-বলোকয়ন্তং"

দ্বিজেন্দ্র বাবু আরও কহেন যে, যদি বলা যায় যে আত্মাতে যে অহংবৃত্তি তাহা ভ্রম, অর্থাৎ অবিদ্যা কল্পিত হইলেই তবে আত্মা অস্মৎ প্রত্যয় বিষয়ভাগী হয়েন, তাহা হইলে অধ্যাসবাদ টিকিতে পারে না, কারণ একটি মূল সত্য থাকিলে তবে তাহার পশ্চাৎ অধ্যাস বা ভ্রম হইতে পারে। অস্মৎপ্রত্যয় গোচর আত্মা, এই গোড়ার সত্য বোধ না হইয়া যদি বোধ হয় যে, ইদম্প্রত্যয় গোচর দেহাদিই আত্মা, তবে এবম্বিধ ভ্রম বা বিপরীত বোধের নাম অধ্যাস। আর উক্ত অস্মৎপ্রত্যয় গোচর আত্মা ও ইদম্প্রত্যয় গোচর অনা-ত্মার খিচুড়ি বা পরস্পরাধ্যাসের নামই অবিদ্যা। এখন বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের মতে অস্মৎপ্রত্যয় গোচর আত্মা, এই মূল সত্যই যদি অবিদ্যা কল্পিত হয়, তবে স্বতন্ত্র মূল সত্যাভাববশতঃ অধ্যাসবাদ টিকিতে পারে না। আত্মাতে অহংবৃত্তিরূপ স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান যদি অবিদ্যা কল্পিত বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইল, তবে আত্মার স্বপ্রকাশকত্বও তাহার সঙ্গে লোপ পাইল; এবম্বিধ অপ্রকাশধর্ম্মী আত্মা গোড়ার আপনাকে আপনি জানিতে পারেন না, কেবল ব্যবহার বা অবিদ্যা কল্পিত অবস্থাতেই তিনি প্রকাশ পাইয়া থাকেন, অর্থাৎ আপনাকে আপনি জানিতে পারেন—ইহাই যদি বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়, তবে তাহা কি ভয়ানক ভ্রম! আকাশের চন্দ্র যদি নিজে অপ্রকাশ থাকেন, তবে যে রূপ তিনি জলের মধ্যে কদাপি প্রকাশ পাইতে পারেন না, সেই রূপ আত্মা যিনি মূলস্থিত চৈতন্য, তিনি অপ্রকাশধর্ম্মী হইলে, তাঁহার প্রতিবিম্ব যে আভাস চৈতন্য বা অহংবৃত্তি, তাহারই বা প্রকাশ কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? সুতরাং বেদান্তবাগীশ মহাশয়ের উক্তরূপ সিদ্ধান্তে অধ্যাসবাদের পাকা ভিত্তিমূল একেবারেই কাঁচিয়া গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন প্রতিবাদ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু আরো অনেক কথা বলিয়াছেন।

প্রদর্শিত যুক্তির সারাংশমাত্র উপরে বর্ণিত হইল। এক্ষণে দেখা যাউক, ঐ সকল যুক্তির সার্থক্য ও অকাট্যতা কতদূর পর্য্যন্ত সম্ভবপর। প্রস্তাবিত বিষয় কিছু সূক্ষ্ম ও নিতান্তই নীরস ও সম্পূর্ণ-হৃদয়ঙ্গম না হইলে পদে পদে বিতণ্ডার উদয় হইয়া থাকে, অতএব আমরা ভরসা করি যে, সকলে তর্কের জঞ্জালময় পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রুতি ও অনুভবাত্মক মীমাংসামাত্র গ্রহণ করিবেন।

সর্ব্বপ্রথম দেখা আবশ্যক যে, বেদান্তশাস্ত্রাদিমতে আত্মার স্বরূপ কি? নিত্য স্বপ্রকাশ মূলস্থিত চৈতন্য বা কূটস্থ চৈতন্যই যে আত্মা, তাহা শ্রদ্ধের দ্বিজেন্দ্র বাবু অস্বীকার করেন না, ফলতঃ সেই আত্মা যে সর্ব্বোপাধি-রহিত, ইহা হিন্দুশাস্ত্রে সর্ব্ববাদী সম্মত। তাঁহার সাক্ষাতে, তদীক্ষণবশে সকল পদার্থে প্রকাশ পাইয়া থাকে, সুতরাং এবম্বিধ সাক্ষীত্ব হেতু তিনি দ্রষ্টা শব্দে বাচ্য, নতুবা দ্রষ্টোচিত কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান তাঁহাতে সম্ভবপর নহে।

স্বস্থান সংস্থিতো দীপঃ সর্ব্বতোভাসয়েদ্ যথা।
স্থিরস্থায়ী তথা সাক্ষী বহিরন্তঃ প্রকাশয়েৎ॥
পঞ্চদশী।

প্রদীপ যেমন স্বস্থান-সংস্থিত হইয়া সকল পদার্থকে প্রকাশ করে, সেই প্রকার সেই নিত্য মূলস্থিত সাক্ষী চৈতন্যরূপী আত্মা বহিরন্তর সকল পদার্থকে এককালে প্রকাশ করিয়াও নিজে স্থির ভাবে অবস্থিতি করেন, অর্থাৎ কোন প্রকার উপাধি বা বিকারগ্রস্ত হয়েন না। শাস্ত্রাদিতে প্রকাশ যে যেমন রঙ্গালয়ে একমাত্র আলোক দর্শক ও নর্ত্তক নর্ত্তকী-বৃন্দকে প্রকাশ করে, তেমনি এই অন্তঃকরণ মধ্যে যে সাক্ষী চৈতন্য জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা,—এই ত্রিপুটীকে এককালে প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহাই আত্মা; পরন্তু দর্শক ও নর্ত্তকী-বৃন্দ অভাবেও যেমন সেই আলোক স্বয়ং প্রকাশ পাইতে থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর-চৈতন্য ও জীবচৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্য অভাবেও সেই আত্মা—চৈতন্য বিলুপ্ত হয় না, আপনা আপনিই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যথা—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত আত্মবোধ গ্রন্থে—

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয় ভেদঃ পরমাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি।

অর্থাৎ জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয় ভেদ বা কোন প্রকার স্বজাতীয় বা বিজাতীয় ভেদ তাঁহাতে সম্ভবপর নহে; (এস্থলে যদি এরূপ আশঙ্কা করা যায় যে, ভেদশূন্য পদার্থে প্রকাশ অসম্ভব; তন্নিরাকরণার্থ কহিতেছেন যে, এইরূপ আশঙ্কা ও যুক্তি আত্মায় প্রযুজ্য নহে, যেহেতু তিনি চিদানন্দ স্বরূপত্ব হেতু স্বয়ংই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অতএব সেই আত্মাই এক মাত্র স্বপ্রকাশ। এস্থলে বলা বাহুল্য, বিবেচনা হয় যে, আত্মা অর্থে বেদান্তাদি মতে নিত্য পরমাত্ম-চৈতন্যই নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আত্মা সম্বন্ধে আমাদিগের আপাততঃ কিছু বলিবার নাই, যাহা রহিল, তাহা পরে প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত করা যাইবেক।

আত্মার স্বরূপ শাস্ত্রাদিমতে আমরা উপরে যে ভাবে বর্ণনা করিলাম, তৎসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবুর কোন আপত্তি থাকা সম্ভব বিবেচনা করি না। বেদান্ত সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলীর দুই এক পাতাও যাঁহারা উলটাইয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, উক্ত বর্ণনা মধ্যে আমাদিগের স্বকপোলকল্পিত কিছুই নাই। এক্ষণে

উক্ত শাস্ত্র ও যুক্তিমতে অহংবৃত্তির স্বরূপ ও প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করা আবশ্যক হইয়াছে।

যে বৃত্তি দ্বারা জীব আপনাকে অহং ইত্যাকার জ্ঞানে অনুভব করে, তাহার নাম অহংবৃত্তি। এই অহংবৃত্তি কি ভাবে অবস্থিতি করে, তৎসম্বন্ধে বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশাসন এই।

অহংবৃত্তিরিদংবৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।
বিজ্ঞানস্যাদহংবৃত্তিরিদংবৃত্তির্মনোভবেৎ॥
পঞ্চদশী।

একই অন্তঃকরণ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক দিকে অহংবৃত্তি অন্য দিকে ইদংবৃত্তি, এই দুই বৃত্তিকে প্রকাশ করে; অন্তঃকরণ যৎকালে অখণ্ডভাবে অবস্থিতি করে তখন অহংবৃত্তিই কি আর ইদংবৃত্তিরই কি, কোন বৃত্তিরই স্ফুরণ সম্ভব হয় না, কেবল যখন সেই একই অন্তঃকরণের খণ্ডতা উপস্থিত হয়, তখনি কেবল অহংবৃত্তি ও ইদংবৃত্তির যুগপৎ অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই অহংবৃত্তির নাম বিজ্ঞান ও ইদংবৃত্তির নাম মন। "ইদংশব্দোদিতং জগৎ" অর্থাৎ ইদংবৃত্তিরূপ মনই ভূতপ্রপঞ্চের সহিত অভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া জ্ঞেয় বিষয়াকারে প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব মন বা ইদংবৃত্তির দ্বারা জীব জ্ঞেয় বিষয় সমূহ লাভ করে, আর অপরাংশ অহংবৃত্তি বা বিজ্ঞান দ্বারা জীব আপনাকে সেই স্থূল সূক্ষ্মাদি ভূতপ্রপঞ্চের অনুভব কর্ত্তা বা জ্ঞাতা বলিয়া বোধ করে। অতএব অন্তঃকরণ খণ্ডতা প্রাপ্ত হইলে তাহার একাংশে বৈষয়িক জ্ঞান, অপরাংশে এবম্বিধ বৈষয়িক জ্ঞানের জ্ঞাতা; একাংশে করণ সহিত কার্য্য, অপরাংশে কর্ত্তা; একাংশে ভোগ্য বিষয় সকল অপরাংশে তাহাদের ভোক্তা; ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পাইতে থাকে। জ্ঞান ও জ্ঞেয়াভাবে যেমন জ্ঞাতা নাই ও হইতে পারে না, তেমনি জ্ঞাতাভাবে ও জ্ঞান বা জ্ঞেয় কিছুই থাকে না, ও থাকা সম্ভবে না। কর্ত্তা ভিন্ন কার্য্য, কার্য্য ভিন্ন কর্ত্তা, ভোগ্য ভিন্ন ভোক্তা কি ভোক্তা ভিন্ন ভোগ্য, জ্ঞেয় ছাড়া জ্ঞাতা কি জ্ঞাতা ছাড়া জ্ঞেয় বিষয় সমূহের অস্তিত্ব কি প্রকার? না—শিরঃনাস্তিশিরঃপীড়াবৎ। সুতরাং অন্তকরণের খণ্ডিতাবস্থায় তাহার এক ভাগ রাখিয়া অপরভাগ ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করা বৃথা।

এবম্বিধ অহংবৃত্তি বা অহংজ্ঞান বা অহংপ্রত্যয় বেদান্তশাস্ত্রাদিমতে বিজ্ঞান আভাস চৈতন্য বা চিদাভাস কি জীব ইত্যাদি বাক্যে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। আত্মার বৃত্তিসংযুক্ত জ্ঞান বিধায় ইহার নাম বিজ্ঞান, সাক্ষী চৈতন্যের ভানার্থ বিশিষ্ট প্রতিবিম্ব বিধায় ইহার নাম আভাস চৈতন্য বা চিদাভাস, ও জন্ম নাশ সুখ দুঃখাদি ভোক্তা বিধায় ইহার নাম জীব, যথা—

বিজ্ঞানময়কোষোঽয়ং জীব ইত্যাগমাজগুঃ।
সর্ব্বসংসার এতস্য জন্মনাশ সুখাদিকঃ॥

অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণে এই বিজ্ঞানময় কোষই জীবশব্দে বাচ্য; জীব এই নিখিল সংসার মধ্যে অবস্থিত হইয়া জন্মমৃত্যু সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। ফলতঃ এই অহংবৃত্তি রূপ জীব আপনাকে এ সংসার মধ্যে কর্ত্তা ভোক্তা ইত্যাদি আকারে ভাবিয়া মুগ্ধ হয়েন। "অত্রাহম্প্রত্যয়ী কর্ত্তেত্যেবং লোকব্যবস্থিতিঃ" (পঞ্চদশী-ভূতবিবেক). এই সম্বন্ধে শ্রুতির চূড়ান্ত মত দেখান যাইতেছে। যথা প্রশ্নোপনিষদ্ মধ্যে।——

ত্রষহিদ্রষ্টাস্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা,
কর্ত্তা, বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ। স পরে অক্ষরে আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে ।।

এই বিজ্ঞানাত্মা বা অহংপ্রত্যয়ী জীবাত্মা পুরুষই দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা আর ইনিই এই সংসারে মন্তা বোদ্ধা ও কর্ত্তা (কিন্তু ইনি স্বয়ং নিত্যপদার্থ নহেন ও স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন না) ইনি সেই পর ও অক্ষর আত্মাতে সংপ্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। এস্থানে এই সামান্য বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, যদি শ্রোতব্য মন্তব্য দ্রষ্টব্য কর্ত্তব্য আদি বিষয় সমূহের অভাব ঘটে, তাহা হইলে এই অহং-জ্ঞানরূপ জীবাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা কর্ত্তা আদি কোনরূপেই প্রকাশ পাইতে পারেন না, সুতরাং সেই সকল জ্ঞেয় কর্ত্তব্য ভোগ্য বিষয়াদি অভাবে অহংভাবের অভাব যে তৎস্বরূপতঃ অনিবার্য্য হইয়া উঠে, তাহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। এতাবতা সপ্রমাণ হইতেছে যে, অন্তঃকরণ মধ্যে ইদং-বৃত্তির মূল উচ্ছেদ করিতে যাইলে অহংবৃত্তির ভিত্তিও নষ্ট হইয়া থাকে। "অহং" এই কথা বলিলেই তদন্তর্গত ইদং বাক্য উহ্যভাবে স্বীকার করিয়া লইতে হইবে, নতুবা অহংশব্দের কোন সার্থকতা থাকে না। এতদুভয় বৃত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাবপন্ন হইলেও ইহারা অন্তঃকরণ মধ্যে একত্রে অবিচ্ছিন্নভাবে অনাদিকাল হইতে প্রকাশিত।

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবুর মীমাংসা এই যে, আত্মাই অহংবৃত্তির অব্যভিচারিত বিষয় বা আলম্বন। তিনি যদি আত্মাকে কেবল অহং-অর্থে গড়িয়া এবম্বিধ মীমাংসা করিতেন, তবে তাঁহার প্রতি আমাদিগের বেশী কিছু বলিবার ছিল না, কারণ এবম্বিধ অর্থ-নিষ্পত্তি অশাস্ত্রীয় হইলেও শব্দান্তর গ্রহণ করা হইত মাত্র, কিন্তু তিনি প্রবন্ধের সকল স্থলে আত্মাকে কেবল অহং বলিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই, বরং অনেক জায়গায় আত্মাকে নিত্য-মূলস্থিত চৈতন্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যিনি নিত্য-মূলস্থিত চৈতন্য তিনিই বেদান্ত ও শ্রুতিসিদ্ধ স্বপ্রকাশ পরব্রহ্ম মাত্র, ইঁহারই নামান্তর আত্মা। এবম্বিধ কূটস্থ নিত্য সাক্ষী-চিন্মাত্র আত্মাতে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু অনায়াসে অহংশব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন; প্রধানতঃ এইস্থলেই তাঁহার সহিত আমা-দিগের বিরোধ।

সেই নিত্য মূলস্থিত চৈতন্য যে জীব-পদাভিষিক্ত অহং শব্দবাচ্য হইতে পারেন না, তাহা উপরোক্ত আত্মা ও অহংবৃত্তির স্বরূপ বর্ণনায় স্পষ্ট নিবারিত হইয়াছে। একটি নিত্য অপরটি নিতান্তই অনিত্য, একটি অদ্বি-তীয় অর্থাৎ স্বজাতীয় বিজাতীয় সর্ব্বপ্রকার ভেদশূন্য, অপরটি সর্ব্বপ্রকার ভেদ সম্পন্ন ও ভেদ ভিন্ন অপ্রকাশ্য, অতএব এতদুভয়কে কদাপি এক বলা যাইতে পারে না। তথাপি আমরা এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লেখে পঞ্চদশী গ্রন্থের চিত্রদীপ প্রকরণ সকলকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ঐ গ্রন্থের উক্ত প্রকরণে মহামহোপাধ্যায় বিদ্যারণ্য-মুনীশ্বর নিঃসংসয়িত ভাবে প্রমাণ করিয়াছেন যে, আত্মা কদাপি অহংশব্দবাচ্য নহেন ও হইতে পারেন না। আত্মাকে অহং বলিলে অর্থাৎ অহং ইত্যাকার জ্ঞানে ভাবিলে সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের সহিত চিদাভাসের মোহমূলক অধ্যাস সাধন করা হয় মাত্র। সেই আত্মাকে অহং আখ্যা না দিয়া বরং যদি স্বয়ং আখ্যা দেওয়া

হয়,তবে তাহাতে কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না. কারণ "স্বয়ং" এই শব্দ অবিশেষে সামান্যার্থে সকল পুরুষেই প্রযোগ করা যাইতে পারে ; অর্থাৎ দেবদত্ত স্বয়ং,তুমি স্বয়ং,আমি স্বয়ং—ইত্যাদি সকল স্থলেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে ও হইতে পারে ; কিন্তু "অহং" এইশব্দ কদাপি সামান্যার্থে ব্যবহৃত হয় না ও হইতে পারে না, কারণ অহং প্রথম পুরুষ,অহং কর্ত্তা, অহং বিশেষার্থ জ্ঞাপক। এতাবতা এতদুভয় শব্দের বিভিন্নার্থ স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে। সুতরাং সেই নির্ব্বিশেষ সামান্য চিন্মাত্র আত্মাতে এবম্বিধ বিশেষার্থ জ্ঞাপক কর্ত্ত্বাদি সম্পন্ন "অহং" আখ্যা দেওয়া হইতে পারে না। যাঁহারা আত্মাকে অহং বলেন, তাঁহারা আভাস চৈতন্যের সহিত সেই নিত্যচৈতন্যের পার্থক্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই।

অহন্তাস্বত্বয়োর্ভেদে রূপ্যভেদস্তযোরিব।
স্পষ্টেঽপি মোহমাপন্না একত্বং প্রতিপেদিরে।

অর্থাৎ রজত ও শুক্তির ন্যায় স্বয়ং অর্থ জ্ঞাপক কূট চৈতন্যের সহিত অহং শব্দবাচ্য জীবচৈতন্যের বিভিন্নতা সুস্পষ্ট বোধ হয়। মোহমুগ্ধ ব্যক্তিরাই এতদুভয়কে এক বলিয়া জানে। ইহা অপেক্ষা শাস্ত্রের স্পষ্ট অনুশাসন আর কি হইতে পারে ?

এখনও অনেকে এই আপত্তি উপস্থিত করিতে পারেন যে, অস্মৎ প্রত্যয় বা অহং বৃত্তি, ইদংবৃত্তিসংশ্লিষ্ট ভাবে প্রকাশ পাইলেই তাহা জীবশব্দে বাচ্য হইয়া থাকে ; কিন্তু ইদংবৃত্তি শূন্য অহংবৃত্তি বা শুদ্ধ অহংবৃত্তি দ্বারায় সেই আত্মা কেননা গম্য হইবেন ? অহংবৃত্তি হইতে ইদংবৃত্তি একেবারে বাদ দেওয়া হেতু এতদুভয়ের খিচুড়ি আর করা হইল না, সুতরাং এবম্বিধ অহংবৃত্তি আর জীবশব্দে বাচ্য হইতে পারে না। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে "শুদ্ধ অহংবৃত্তি" কথার কোন অর্থ নাই, কারণ তাহাতে, অহং ইত্যাকার বোধোদয়ের কোন সম্ভাবনা নাই ; সুতরাং তাহাতে "বৃত্তি"এই শব্দসংযোজনার কোন সার্থকতা থাকে না। অহং ইত্যাকার জ্ঞান ইদংবৃত্তি-ক্ষেত্রকে আশ্রয় না করিয়া কদাপি প্রকাশ পাইতে পারে না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপে আমরা দেখাই যে, জাগ্রদবস্থার সহিত স্বপ্নাবস্থার ও স্বপ্নাবস্থার সহিত অজ্ঞানাবস্থার তুলনা করিয়া দেখিলেই ইদংবৃত্তির সহিত অহংবৃত্তির অবিচ্ছিন্নতার ভাব সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইবেক। জাগরণ কালেই অহংবৃত্তির সর্ব্বাপেক্ষা অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে, তাহার কারণ এই যে, তৎকালে বাহ্য বিষয় সংঘাতের আধিক্যে অন্তঃকরণ মধ্যে ইদংবৃত্তির সঞ্চালনা সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল হইলেই তৎসঙ্গে সঙ্গে অহংবৃত্তিও প্রবল হইয়া উঠে ; তাই শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু এই জাগ্রদবস্থাকে সৎ প্রধান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রাদিমতে ইহা বরং অসৎ প্রধান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, যে হেতু এতন্মতে জাগ্রদবস্থাই সর্ব্বাপেক্ষা মায়িক। যাহাই হউক, এই অবস্থাতেই যে অহংবৃত্তির প্রকৃত স্ফূরণ হয়, তাহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। তার পর স্বপ্নাবস্থায় স্বপ্নদর্শনের তারতম্যানুসারে অহংবৃত্তির যে প্রকার ইতর বিশেষ ঘটে, তাহা সকলেই বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। নিদ্রা যতই ঘোরাল হইয়া আসিবে অহংবৃত্তিও তত লুপ্ত হইতে থাকিবে, আর সে জাগ্রদবস্থার সৎ প্রধান অহংবৃত্তি নাই, সৎপ্রধান ইদংবৃত্তিও নাই, সাবেক বাহ্যবিষয় সংঘাতের

গতিটা এখনো সমস্ত যায় নাই, তাই ভাসা ভাসা ইদংবৃত্তির স্ফুরণে ভাসা ভাসা অহংবৃত্তি দেখা যাইতেছে। যেন অহংবৃত্তির আর জমাট নাই, ইদংবৃত্তির গাঁট খুলিয়া আসায় অহংবৃত্তিও ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িতেছে। ক্রমে যতই ঘুমের চাপ অধিক হইতে থাকিবে, ততই অহংবৃত্তি অসৎ প্রধান হইয়া পড়িবে। শেষে যখন অহংবৃত্তিকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, কি একটা আনন্দময় আচ্ছন্নতার ভিতর অহং ডুবিয়া যাইবে, তখন সুষুপ্তি কাল উপস্থিত হয়। এই সময় ইদংবৃত্তির কোন চেষ্টা থাকে না, সুতরাং অহংবৃত্তিরও কোন স্ফুরণ দেখিতে পাওয়া যায় না; শাস্ত্র প্রমাণে অহং তদবস্থায় স্বীয় কারণ অবিদ্যাতে লীন হইয়া থাকে। নিদ্রাকালে যে আচ্ছন্নতার ভাব আসে, যে একটী অজ্ঞানরূপ অন্ধকার আবরণ বোধ হয়, তাহাই অবিদ্যা। অহং এবম্বিধ অবিদ্যায় লীন হইলে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। যে অহংবৃত্তি জাগ্রতকালে কর্ত্তা ভোক্তা জ্ঞাতা সর্ব্বেসর্ব্বা ছিল, যে অহংবৃত্তি স্বপ্নাবস্থায় ইদংবৃত্তির নানাবিধ ছবি দেখিয়া কখন আনন্দিত কখন বা ভীত হইযাছিল, সে অহংবৃত্তি আর নাই; তাহার অসদ্ভাব ঘটিয়াছে। এস্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে, অহংবৃত্তির নাশ, অসদ্ভাব বা লয় হওয়া বলিতেছি বলিয়া আমরা তদ্দ্বারা অহংবৃত্তির আত্যন্তিক অভাব মানে করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে এই নিখিল সংসার মধ্যে কোন পদার্থেরই আত্যন্তিক অভাব ঘটে না। হিন্দু-শাস্ত্রমতেও নাশ লয় অসৎ অভাব ইত্যাদি বাক্য আত্যন্তিক অভাব বুঝিতে হইবে, এমত অনুশাসন দৃষ্ট হয় না। সাংখ্যপ্রবচন সংগ্রহে স্পষ্টই উক্ত হইয়াছে যে,কারণে লয় হওয়ার নামই নাশ। আর বেদান্তদর্শনের অধিকরণমালার টীকা মধ্যে অসৎ শব্দের অর্থ কিরূপ ভাবে করা হইয়াছে, তাহা আমরা দেখাইতেছি— —"যদসচ্ছব্দেনাভিধানং তদব্যাকৃতত্বাভিধানাভিপ্রায়ং ন তু অত্যন্তাভাবাভিপ্রায়ং"। অতএব সুষুপ্তি অবস্থাতে অহংবৃত্তির আত্যন্তিক অভাব ঘটে, এমত সিদ্ধান্ত আমরা করিতেছি না। তদবস্থায় যে অহংবৃত্তির আত্যন্তিক অভাব ঘটে না, তাহার প্রমাণ এই যে, নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির এইরূপ স্মরণ হয় যে আমি সুখে নিদ্রা যাইতেছিলাম। অতএব সে সময় "অহং" এই পদার্থ ছিল। কি ভাবে ছিল? না—নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্টাবস্থায় ছিল। কেন নিষ্ক্রিয় হইয়াছিল? না—ইদংবৃত্তির ক্রিয়াভাবে। এখন এই বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য যে, এবম্বিধ নিষ্ক্রিয় নিশ্চেষ্টভাবাপন্ন অহংপদার্থে অহংবৃত্তি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে কি না। সুষুপ্তি-কালে আমি আপনাকে জানিতে পারি নাই, কারণ আমার তখন লয় হইয়াছিল। কিসে? না—আচ্ছন্নভাবানন্দরূপ অবিদ্যায়। যদিও যুক্তি প্রমাণে স্বীকার করিতে হয় যে, আমি ছিলাম তথাপি "আমিছিলাম" এই বোধ তখন ছিল না, সুতরাং অহং পদার্থের এমনি একটা অবস্থা ঘটিয়াছিল,যাহাতে তাহার অহংজ্ঞান বা অহংবৃত্তি লোপ পাইয়াছিল; ইহাকেই বলে অহংবৃত্তির বিনাশ। বিনাশ আর কিছুই নহে,অবস্থান্তর প্রাপ্তি মাত্র। যে উপাদান সমষ্টির সংহতাবস্থায় যে পদার্থের অভিব্যক্তি হইয়া থাকে, সেই সকল উপাদান অসংহত হইয়া নিজ নিজ স্থানে পুনরায় সংগৃহীত হইলেই তাহার বিনাশ ঘটিয়া থাকে। যেমন অকসি

জেন ও হাইড্রোজন গ্যাসদ্বয়ের মিলিত সংহতাবস্থার নাম জল, কিন্তু সেই জল পুনরায় অসংহত হইয়া স্বীয় কারণ উক্ত দ্বিবিধ গ্যাসে যখন মিলিত হয়, তখন জলের যে আত্যন্তিক অভাব ঘটে, তাহা নহে, পরন্তু তাহা না ঘটিলেও জলের অস্তিত্ব আর দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব প্রকাশ ধর্ম্মের অবস্থান্তর পরিগ্রহে যে বিভিন্ন নামকরণ করিতে হয় ও না করিলে চলে না, ইহা অবশ্যই সকলে স্বীকার করিবেন। জল যখন গ্যাসে লয় প্রাপ্ত হয়, তখন গ্যাসকে গ্যাস না বলিয়া যদি বলি জল, মিছরির দানাকে মিছরি না বলিয়া যদি বলি ইক্ষুরস,তাহা হইলে আমাকে কে বুঝিবে? আর এইরূপ বলা যে যুক্তিযুক্ত, তাই বা কে বলিবে? অতএব সুষুপ্তি দশাগ্রস্ত অহং পদার্থ, যাহা বেদান্ত শাস্ত্রাদিমতে প্রজ্ঞান শব্দে বাচ্য, তাহাকে প্রজ্ঞান না বলিয়া যদি বিজ্ঞান বা অহংবৃত্তি বলি, তাহা যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না এবং তাহাতে উক্ত নামাদিরও কোন সার্থকতা থাকে না। সুতরাং আমরা যে গোড়ায় বলিয়াছিলাম যে ইদংবৃত্তি-রহিত "শুদ্ধ অহংবৃত্তি" কথার কোন মানে নাই, এস্থলে তাহাই প্রতিপন্ন হইল। শুদ্ধ অহংবৃত্তি বলাও যা অহংবৃত্তি না থাকা বলাও তাই, কেবল মিথ্যা কথা কাটাকাটি মাত্র সার; ভাবার্থ সেই একই। অতএব অহংবৃত্তি বলিলে আমরা ইদংবৃত্তি জড়িত অহংবৃত্তি বা জীব বা বিজ্ঞান পদার্থই বুঝিব। সুতরাং আত্মা যিনি বেদান্তশাস্ত্রাদি মতে সুষুপ্তিরও অতীত তিনি অহংবৃত্তি গম্য হইতে পারেন কি না, তাহা এক্ষণে সকলেই বুঝিয়া দেখিতে পারেন।

সহজ অবস্থায় সাধারণ লোকের মনে এইরূপ হয় যে, কেন না ইদংবৃত্তি ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিয়া শুদ্ধ আপনি আপনাকে ভাবিতে পারা না যাইবে? প্রথম প্রথম চক্ষু মুদিলে এ রকম ধারণা হয় বটে। যেমন দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকট বা পোত মধ্যে আরোহী ব্যক্তির কামরার ভিতর বসিয়া সহজেই ভ্রম হয় যে সে কোথাও যাইতেছে না এক স্থানেই আছে; উপরোক্ত ধারণাও সেই প্রকার। আত্মদৃষ্টি অভ্যাসে সামান্য পরিমাণ নিপুণতা জন্মিলে এরকম ধারণা আর থাকে না, তখন স্পষ্ট বিবেচনা হয় যে, স্থূল সূক্ষ্ম দেহাদি উপাধিগণ অহংবৃত্তি ভিন্ন শুদ্ধ অহংবৃত্তি কিছুতেই ভাবিতে পারা যায় না, অর্থাৎ দেহাদি উপাধি অতিক্রম করিতে যাইলে অহংবৃত্তি থাকিতে পারে না। সেই নিরপেক্ষ আত্ম চৈতন্য ইদংবৃত্তিভূত দেহাদিতে প্রকাশ পাইলেই অহংবৃত্তির উদয় হইয়া থাকে, অর্থাৎ অবম্বিধ আপেক্ষিক অনিত্য আত্মচৈতন্য প্রকাশের নামই অহংবৃত্তি। জাগরণকালের অন্নময় কোষজনিত স্থূল অবস্থায় অহংবৃত্তির সর্ব্বাপেক্ষা স্ফূর্ত্তি ও সুষুপ্তি কালে আনন্দময় কোষে কারণাবস্থায় ইহার লয় অবশ্যম্ভাবী; অতএব—

"লীনা সুপ্তৌ বপুর্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময় শব্দভাক্"
মায়িকোঽয়ং চিদাভাসঃ শ্রুতেরনুভবাদপি
ইন্দ্রজালং জগৎ প্রোক্তং তদন্তঃপাত্যয়ং যতঃ
বিলোপোঽস্য সুষুপ্ত্যাদৌ সাক্ষিণা হ্যনুভূয়তে
এতাদৃশং স্বস্বভাবং বিবিনক্তি পুনঃপুনঃ

অর্থাৎ যে চিদাভাস যুক্ত বুদ্ধি অর্থাৎ অহংবৃত্তি জাগরণকালে নখাগ্র ব্যাপিয়া সর্ব্বশরীরে অবস্থিতি করে ও সুষুপ্তি কালে লীন হয়, তাহা বিজ্ঞানময় শব্দ বাচ্য; ইহা কদাপি আত্মা নহে। কারণ শ্রুতি ও

অনুভব প্রমাণে এই চিদাভাস সম্পূর্ণ মায়িক। এই নিখিল সংসার সমস্তই মায়িক, অহংবৃত্তিময় জীব তদন্তর্গত, সুতরাং ইহাও মায়িক হইবেই। যদি অমায়িক হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তিকালে কদাপি ইহার বিনাশ দৃষ্ট হইত না, পরন্তু ইহার অনিত্যতা সাক্ষী-চৈতন্য দ্বারা স্পষ্ট অনুভূত হয়। জীব এই প্রকার স্বীয় স্বভাবের মায়িকত্ব ও অনিত্যতা অনুভব করিয়া আর বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে না।

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু কহেন যে, স্থূল দেহে যে অহংবৃত্তির অভিমান, তাহা ভ্রম ও কাল্পনিক। তাহা সওয়ায় আরো বলেন যে, রাগদ্বেষাধীন যে মন, তাহাতে যে অহংবৃত্তির অভিমান তাহাও ভ্রম ও কাল্পনিক। তিনি যদি আর একটু অগ্রসর হইয়া বলিতেন যে, পুণ্যজনিত যে. অন্তঃকরণের প্রসাদ বা আনন্দানুভব, তাহাতে যে অহংবৃত্তির অভিমান, তাহাও ভ্রম এবং কাল্পনিক। তাহা হইলেই সব কথা খুলিয়া বলা হইত। কিন্তু তিনি না বলেন নাই বলুন, তিনি যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের প্রকৃত সারগর্ভ উক্তি গুলির প্রতি আস্থাবান, সেই পরমহংস আচার্য্যদেব কি উপদেশ দেন, তাহা আমরা দেখাইতেছি।—

ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং।
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ॥
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা।
চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহম্॥

নির্ব্বাণষটক।

স্থানাভাব-বশত বাহুল্য ভয়ে আমরা তাঁহার প্রণীত অমৃতময় কয়েকটি শ্লোক তুলিলাম না। তাহাতে তিনি জলধি সদৃশ গভীর গর্জ্জনে মুক্তকণ্ঠে জগতের মোহমুগ্ধ জীবগণের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমি দেহ নহি, আমি মন নহি, আমি প্রাণ নহি, পুণ্যাপুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম আমার নহে, আমার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, পিতা নাই, মাতা নাই, আমি জ্ঞাতা নহি জ্ঞান নহি জ্ঞেয়ও নহি, আমি যে পদার্থ তাহা এ সকলেরই অতীত, আমি নির্ব্বিকল্পনিরাকার চিদানন্দময় শিবস্বরূপ। তদভিপ্রেত এই "শিবস্বরূপ আমি" যে অহংবৃত্তির গম্য, একথা আর এক্ষণে কে বলিবে? অতএব দ্বিজেন্দ্র বাবুরই যুক্তি মতে সমস্ত ইদংবৃত্তি বাদ দিলে যে "শুদ্ধ অহংবৃত্তি" অবশিষ্ট থাকে, তাহা আমার অগম্য, অর্থাৎ তাহা হইলে আমিই আমার নিকট অগম্য, আমিই আমার নিকট অব্যক্ত, আমিই আমার মনোবুদ্ধির অগোচর, এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য্য হইয়া উঠে। অথচ এবম্বিধ সিদ্ধান্ত দ্বিজেন্দ্র বাবু অনুমোদন করেন না, কারণ, তাহা হইলে তদুক্ত চন্দ্র একেবারেই নিরুদ্দেশ হইয়া পড়ে, আকাশও ঘনঘটাচ্ছন্ন হয়, অথচ সমুদ্রের জলও ঝিকমিক করিতে ছাড়ে না। ইহা অত্যুত্তম রহস্য বটে।

অতঃপর স্বীয় যুক্তি ও মীমাংসার অনুকূলে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু যে সকল প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবর্গের উক্তি দেখাইয়াছেন, সে গুলির যুক্তিসঙ্গত প্রকৃত সদর্থ কি, তাহা আমরা সংক্ষেপে দেখাইতেছি। ফরাসীস দেশীয় দার্শনিক দেকার্ত্ত যে কহিয়া গিয়াছেন, "Cogito ergo sum" অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার অনুবাদমতে (I think therefore I am) তাহার প্রকৃত অনুবাদ এই যে, আমার ভাবনা বা বৃত্তিপ্রবাহই আমার অস্তিত্বের হেতু, অর্থাৎ বৃত্তি প্রবাহেই অহংবৃত্তির অস্তিত্ব সিদ্ধ। দার্শনিক দেকার্ত্ত যৎকালে মানবীয় জ্ঞানের স্থির নিশ্চয়াত্মক

ভিত্তি অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্ব পদার্থের অস্তিত্ব প্রতি সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন, তখন তিনি বিচার করিয়া দেখিলেন যে, এই যে চিত্তের সন্দেহ—ইহাও এক রকম চিত্তের অবস্থা বা বৃত্তিমাত্র। অতএব সকল বিষয়ের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিলেও চিত্তের এই সংশয়রূপ বৃত্তিকে কদাপি উড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারে না, সুতরাং এই সংশয় বৃত্তির অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে যদি বৃত্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইল, তবে তৎসঙ্গে সঙ্গে এক জনা জ্ঞাতা বা বেত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে, কারণ জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞান নাই, বেত্তা ভিন্ন বৃত্তি নাই ও থাকিতে পারে না। সেই জ্ঞাতা ও বেত্তা কে? না অহং। অতএব সর্ব্বতোভাবে সপ্রমাণ হইল যে, অহংবৃত্তি বা অহং ইত্যাকার জ্ঞান চিত্তের বৃত্তি-প্রবাহ হইতেই আমরা পাইয়া থাকি। দেকার্ত্ত সাহেবের এবম্বিধ মীমাংসার প্রতিকূলে আমাদিগের কিছুই বলিবার নাই, কারণ আমরাও এ কথা অবশ্য স্বীকার করি যে, বৃত্তি সারূপ্যাবস্থা ভিন্ন অর্থাৎ ইদংবৃত্তিময় চিত্তবৃত্তি ব্যতীত অহংবৃত্তির অস্তিত্ব কদাপি সম্ভবপর নহে। এই অহংবৃত্তি অনিত্য, এরূপ কথা যদিও দেকার্ত্ত সাহেব বলেন নাই, তথাপি ইহা যে অপূর্ণ, তাহা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, This very fact of doubt proves its imperfection। অতএব এবম্বিধ অপূর্ণ অহংবৃত্তি দ্বারা বেদান্তাদিমতে ঈশ্বরেরও অতীত সেই পূর্ণ স্বরূপ আত্মা, কি প্রকারে গম্য হইবেন ও হইতে পারেন, তাহা আমরা বুঝি না।

তারপর সাংখ্যসারে মহোপাধ্যায় বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন "দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধোজানেহহমিতি ধীবলাৎ"। দ্বিজেন্দ্র বাবু ইহার এই মত অর্থ করেন, যথা, আমি জানি এই রূপ বুদ্ধি বলেই (এক কথায় অহংবৃত্তি বলেই) আত্মা সিদ্ধ হয়েন। উপরোক্ত বচন মধ্যে যে সামান্যতঃ পদ আছে, তাহা তিনি ধর্ত্তব্যের মধ্যেই গণ্য করেন নাই, কিন্তু প্রকৃত অর্থ নিষ্পত্তি পক্ষে উক্ত পদটি একবারে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। উক্ত বচনটির প্রকৃত অর্থ এই—আমি জানি এই রূপ জ্ঞান হইতে সেই দ্রষ্টা সামান্য অনুমান বলে সিদ্ধ হইয়া থাকেন। সামান্য অনুমান কাহার নাম? না—অনুমানস্য সামান্য মাত্র বিষয়কত্বাৎ। কি প্রকার?—না"বস্ত্রাদি কার্য্য শয্যাদিব।]" যেরূপ বস্ত্রাদি রচিত শয্যা হইতে সামান্য অনুমান বলে বস্ত্রাদি সিদ্ধ হয়, যেমন সুখদুঃখাত্মক মহদাদি কার্য্য হইতে সামান্য অনুমান দ্বারা প্রকৃতির সত্তা সিদ্ধ হয়, সেই মত "আমি জানি' ইত্যাকার বুদ্ধি বৃত্তি সমূহ হইতে সামান্য অনুমান বলে সেই দ্রষ্টা সপ্রমাণিত হয়েন। পরন্তু যে প্রকার বস্ত্রাদি কদাপি শয্যা নহে ও মহদাদি কার্য্যও যে প্রকার কখন প্রকৃতি নহে, সেই প্রকার "আমি জানি"বা অহং বৃত্তিও কদাপি আত্মা নহেন। তবে এবম্বিধ অহংবৃত্তি হইতে পরোক্ষভাবে অনুমান দ্বারায় দ্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকৃত বা সপ্রমাণিত হইয়া থাকে এই মাত্র। "আমি জানি" ইত্যাকার জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়াত্মক ভাব সমষ্টি হইতে যদি চিত্তবৃত্তিরূপ জ্ঞান ও জ্ঞেয় ভাব বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে ইদংবৃত্তির অভাবে জ্ঞাতারূপী চিত্তবৃত্তি অর্থাৎ অহং ইত্যাকার জ্ঞানও যে লোপ পাইবে, তাহা আমরা ইতিপূর্ব্বে

বিশেষ করিয়া দেখাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু অহংবৃত্তি লোপ হয় হউক, এরূপ বাদ দিলে যে অজ্ঞেয় শূন্যাকার অথচ সত্তামাত্র পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই দ্রষ্টা বা সাক্ষীচৈতন্য বা আত্মা। এই হেতু সেই আত্মাই এক মাত্র স্বপ্রকাশ কারণ, বিষয় ভোগকালে অহং জ্ঞান ও চিত্তবৃত্তি যে সেই অজ্ঞেয় আত্মার আশ্রয়েই প্রকাশ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। অতএব অহংবৃত্তিতে যে আত্মার প্রকাশ তাহা জন্য জ্ঞানপ্রকাশ, স্বপ্রকাশকত্ব একমাত্র সেই আত্মাতে অবস্থিত। সেই হেতু সাংখ্যসারে উক্ত বচনটির ২১৪ শ্লোক পরেই দেখা যায়, বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন যে—

জন্যজ্ঞান প্রকাশোহস্ত নিত্যত্বে তুন যুজ্যতে
ন হ্যপ্রকাশে কদাপি প্রকাশোৎপত্তিরীক্ষতে ॥
কার্য্যে প্রকাশধোগুণেহ বয়বানাং হি তদগুণঃ
কারণং তেন নানিত্যঃ প্রকাশো নিত্যবস্তুনিঃ।

দৃষ্টান্ত দ্বারায় বুঝাইতেছেন—

প্রকাশশ্রেয় সংযোগাৎ প্রকাশভ্রম ইন্ধনে।
আদর্শে চাবৃতেভর্ণাৎ প্রকাশোৎপত্তিবিভ্রমঃ।

অর্থাৎ অহংবৃত্তির জন্যজ্ঞান প্রকাশে নিত্যত্ব কদাপি যুক্তিযুক্ত হয় না, কারণ উক্ত ধীর অর্থাৎ আমি জানি এইরূপ বুদ্ধির নিজের প্রকাশধর্ম্ম কিছুই নাই। তবে কি কারণে ইহাকে স্বপ্রকাশ বলিয়া বিবেচনা হয় তন্নিরাকরণার্থ কহিতেছেন যে, কার্য্য কালে অর্থাৎ ব্যবহারিক অবস্থায় সেই দ্রষ্টা যে সকল অবয়বকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন, সেই সমস্ত অবয়বে তাঁহার প্রকাশ ধর্ম্ম বর্ত্তিয়া থাকে। অতএব প্রকৃত স্বপ্রকাশকত্ব কারণ স্বরূপ সেই দ্রষ্টা পদার্থে নিত্য অবস্থিত। অগ্নি যখন কাষ্ঠকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, তখন সহজেই কাষ্ঠে স্বপ্রকাশকত্বের ভ্রম হইয়া থাকে। সেই রকম আত্মা যখন অহংবৃত্তিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন, তখন মনে হয় যে এ সমস্ত অহংবৃত্তিরই প্রকাশ; কিন্তু তাহা ভ্রম বই আর কিছুই নহে। অহংবৃত্তির নিজের প্রকাশ ধর্ম্ম কিছু মাত্র নাই। যখন এই অহংবৃত্তি ইদংবৃত্তির সমভিব্যাহারে লোপ পাইবে ও আমি জানি ইত্যাকার বুদ্ধি রহিত হইবে, তখন সেই আত্মা স্বয়ং প্রকাশ পাইবেন। তাহাই আত্মার কৈবল্যাবস্থা—যথা সাংখ্যসারে ঐ এক অধ্যায় মধ্যে উক্ত হইয়াছে।

অতশ্চ ঘটতে স্বত্বনাশে কৈবল্যমাত্মনঃ

কবিশ্রেষ্ঠ কালীদাসের "আত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তং" উক্তির সার্থকতা আত্মার উক্ত কৈবল্যাবস্থাতেই ঘটিয়া থাকে; তাহার মানে এ রকম নহে যে, তখন আত্মা আপনাকে অহং ইত্যাকার জ্ঞানে অনুভব করে। এই কৈবল্যাবস্থা কি প্রকার?

ন শূন্যং নাপিচাকারং ন দৃশ্যং নচ দর্শনম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং যৎকিঞ্চিদবশিষ্যতে ॥

শূন্য নহে অথচ আকারবিহীন, দৃশ্য নহে দর্শনও নহে, আখ্যাবিহীন কোন প্রকার অভিব্যক্তির রহিত কিঞ্চিন্মাত্র যে পদার্থ অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা। ইহাই সাংখ্যসার গ্রন্থের শেষ শ্লোক।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যোক্ত "নায়ং একান্তে নাবিষয়ঃ অস্মৎপ্রত্যয় বিষয়ত্বাৎ" বচনটির শ্রুতি ও যুক্তি সঙ্গত অর্থ ও ব্যাখ্যা পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় করিয়াছেন, অতএব তাহা লইয়া আর কচকচি করিবার প্রয়োজন নাই। তবে দ্বিজেন্দ্র বাবু যে "আমি জানি" প্রমাণের উপর এতটা নির্ভর

করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে শঙ্করাচার্য্য কি বলেন, তাহা দেখাইতেছি—

আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতিদ্বয়ং।
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামিতি প্রবর্ত্ততে॥

অর্থাৎ আত্মার সচ্চিদংশ ও বুদ্ধিবৃত্তি, এই দুই পদার্থকে জীব অবিবেক হেতু সংযোগ করিয়া "আমি জানি" এই বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হয়। এখনও কি শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু "আমি জানি" এই প্রমাণের উপর নির্ভর করিতে চাহেন? আত্মজ্ঞান এত সহজ নহে যে সামান্য প্রশ্নোত্তর স্থলে উপদেশ দিয়া বালকেরও হৃদয়ঙ্গম করান যাইতে পারে।

আমরা যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহাতে অধ্যাসবাদের পাকা ভিত্তিমূল কাঁচিয়া যায় নাই। পাকা হউক বা কাঁচা হউক, বেদান্তবাদের সময় হইতে এপর্য্যন্ত সেই ভিত্তি যেমত আছে তেমনিই রহিল, আমাদিগের হইতে যে তাহাতে কাঁচা পাকা পলস্তারা ধরান হইল, এমন বিবেচনা হয় না। সেই নিরাকার নাম-রূপবিহীন ব্রহ্মে জগৎ-ভ্রম ও অহংভ্রমই বেদান্তশাস্ত্রের চিরপ্রসিদ্ধ মীমাংসা। অসীমে সসীম ভ্রম, অরূপে রূপভ্রম, চৈতন্যে জড়তার ভ্রম, এসকল ভ্রমের তুল্য আর কি অধ্যাস বা ভ্রম আছে? এই সকল ভ্রমের গোড়া কোথায়? না—ব্রহ্মে অহংভ্রম।

বিকল্প মায়ারহিতে চিদাত্মকে
হহঙ্কার এষ প্রথমঃ প্রকল্পিতঃ।
অধ্যাস এবাত্মনি সর্ব্বকারণং
নিরাময়ে ব্রহ্মণি কেবলে পরে। রামগীতা।

অর্থাৎ অমায়িক চিন্মাত্র নিরাকার ব্রহ্মপদার্থে অহঙ্কার স্বরূপ অধ্যাসই সর্ব্বপ্রথম কল্পিত হইয়া সমস্ত জগদধ্যাসের কারণস্বরূপ হয়েন। বেদান্তশাস্ত্রাদি মতে অহঙ্কার দ্বিবিধ—ঐশ্বরিক ও জৈব। বিশেষ এই যে, ঐশ্বরিক অহঙ্কার আত্মার মায়াকল্পিতাবস্থা, ও জীবের অহঙ্কার সেই আত্মার অবিদ্যাকল্পিত ব্যবহারিক দশা। পরন্তু উভয়েই যে অধ্যাস মাত্র, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

অথচ বেদান্তেরই মহাবাক্য শিক্ষা দেয় "অহংব্রহ্ম" বা "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম।" এই সকল মহাবাক্যের সাদাসিদে অর্থ করিয়া লোকে বেদান্ত সম্বন্ধে কতই ভ্রান্ত মতামত প্রচার করিয়াছে ও করিতেছে। অপ্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তৎসম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা এস্থলে অনাবশ্যক। তবে এই মাত্র বক্তব্য যে, ঐসকল মহাবাক্যের অর্থভাগত্যাগ লক্ষণা-দ্বারা সিদ্ধ হইয়া থাকে। নতুবা জীব কথন ব্রহ্ম নহে ও ব্রহ্মও কথন জীব নহেন, ও হইতে পারে না। অহংনাস্তীতি অহংব্রহ্মাস্মি—ইহাই বেদান্ত-শাস্ত্রের একমাত্র উপদেশ। যিনি মায়াতীত হইয়া স্বয়ং এই উপদেশের মর্ম্মভেদ করিতে সক্ষম হইয়াছেন, মোহমুগ্ধ জীবের পক্ষে এক-মাত্র তিনিই স্মরণীয় ও বন্দনীয়।

আমরা উপরে আত্মাকে অজ্ঞেয় অথচ চিন্মাত্র স্বপ্রকাশ কহিয়া আসিয়াছি। ইহাতে অনেকের মনে এখনো সন্দেহ থাকিতে পারে যে, যিনি অজ্ঞেয় তিনি কেমন করিয়া জ্ঞান স্বরূপ হইবেন এবং স্বপ্রকাশই বা তাঁহাকে কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? অজ্ঞেয় কথাটা অনেকের কাছে অসৎ বা অজ্ঞানের সমতুল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, এই জন্যই গোলমাল উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই আত্মা অজ্ঞেয় কেন, তাহার মীমাংসা মহোপাধ্যায় বিদ্যারণ্য পঞ্চদশীগ্রন্থে কোষ বিবেক অধ্যায়ে কহিয়া-

ছেন, যথা—

স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ বিদ্যতে নানুভাব্যতা।
জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাদজ্ঞেয়া ন ত্বসত্তয়া

অর্থাৎ সেই আত্মা স্বয়ং অনুভব স্বরূপ বিধায় তাঁহাতে অনুভাব্যতা সম্ভবপর হয় না, তদতিরিক্ত জ্ঞাতা ও জ্ঞানের অভাব হেতু তিনি অজ্ঞেয়, নচেৎ তাঁহার অসত্তা হেতু যে তিনি অজ্ঞেয়, তাহা নহে। যদি তাঁহাতে অনুভাব্যতা অর্থাৎ তিনি জ্ঞেয় ঐরূপ কথা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে অনুভব করে এতদ্রূপ জ্ঞাতাও স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে তাঁহার স্বয়ং অনুভব স্বরূপত্বের বা স্বপ্রকাশ স্বরূপকত্বের হানি হয়, অতএব এবম্বিধ আশঙ্কা যুক্তিযুক্তা হয় না। তিনি অদ্বৈত সুতরাং তদতিরিক্ত জ্ঞাতা ও জ্ঞানের অস্তিত্ব নাই, যদি থাকে তবে তাহা অনিত্য কারণ তাহা অধ্যাস ও বিকল্প মাত্র। অতএব আমাদিগের সিদ্ধান্তক্রমে জ্ঞান=অজ্ঞান, কি অজ্ঞান=জ্ঞান,এক=অনেক, কি অনেক=এক, ইত্যাদিরূপ কোন প্রকার স্ববিরোধী মীমাংসা হওয়া বিবেচনাসিদ্ধ হইতেছে না। শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবুর যেটুকু অকাট্য সিদ্ধান্ত তাহা বজায় রহিল।

সমাধিকালীন বৃত্তি বিলোপ সম্বন্ধে কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রবন্ধ একে নীরস, তাহাতে কিছু দীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমরা তাহাতে নিরস্ত রহিলাম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, সত্যানুরোধে আমাদিগের যৎকিঞ্চিত বক্তব্য উপরে নিবেদন করিলাম। মিথ্যা তর্ক বা বিতণ্ডা করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি নাই। দ্বিজেন্দ্র বাবুকে আমরা অন্তরের সহিত শ্রদ্ধা ভক্তি করি। প্রতিবাদ করিতে গিয়া যদি কোন ত্রুটি হইয়া থাকে, তবে তিনি স্বীয় উদারতা গুণে তাহা গ্রহণ না করেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

শ্রীবিপিন বিহারী সেন

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম্ম—(২১ শ)।

লীলা রহস্য।

একদিন শ্রীবাসমন্দিরে ভক্তবৃন্দের সমক্ষে গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দকে ডাকিয়া পরিহাসচ্ছলে কহিলেন, নিতাই! তুমি বড় চঞ্চল হয়েছো; আমার ভয় হয় পাছে তুমি কাহার সহিত ঝগড়া কর।

নিতাই তদ্রূপ পরিহাসব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করিলেন "বিষ্ণু 'বিষ্ণু' আমি মহাগম্ভীর ব্যক্তি, আমার উপর তোমার এরূপ দোষারোপ করা অন্যায়। তুমি কিসে আমার চঞ্চলতা দেখিলে? গৌরচন্দ্র কহিলেন, না,—চঞ্চলতা আর কিসে? কেবল আহারের সময় ঘরময় অন্নবৃষ্টি করা।

"হাসি বলে গৌরচন্দ্র কি দোষ তোমার?
সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর অবতার।

নিত্যানন্দ।—পাগলেই ভাত ছড়ায়; আমি কি পাগল যে ভাত ছড়াবো? তা বুঝেছি, এই ছলে আমাকে ঘরে ভাত না দিয়ে তুমি সুখে একাকী খেতে চাও?

আচ্ছা খাবে খাও, নিজের অপকীর্ত্তি নিজে বলে আর কেন চলাচ্ছো,

',নিত্যানন্দ বলে ইহা পাগলে সে করে,
এ ছলায় ঘরে ভাত না দিবে আমারে।
আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও;
অপকীর্ত্তি আর কেন বলিয়া বেড়াও।

গৌর।—ওহে তা নয়; তোমার অপকীর্ত্তি দেখিলে আমার কি না লজ্জা হয়; তাই এত গলা ফাড়া ফাড়ি করি।

নিত্যানন্দ তখন ভাবান্তর পরিগ্রহ করিয়া বলিলেন "আচ্ছা! ভাল ভাল; আমার চপলতা দেখিলে তুমি খুব শিক্ষা দাও। ওহে গৌর! তুমি ঠিক বলেছো ভাই, আমি নিশ্চয় বড় চঞ্চল হয়েছি।"

হাসি বলে নিত্যানন্দ বড় ভাল ভাল।
চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবে সর্ব্বকাল।।
নিশ্চয় বলিলে তুমি আমি'সে চঞ্চল।
এ বলিয়া মহাপ্রভু হাসে খল খল।''

বলিতে বলিতে মহানন্দে নিতায়ের হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন দিকবিদিগ্ জ্ঞান শূন্য হইয়া তিনি পরিধেয় বস্ত্র মস্তকে বাঁধিয়া দিগবাস হইলেন এবং অঙ্গন মধ্যে যোড় পায়ে লম্ফ দিতে দিতে হাসিতে লাগিলেন;—

"দিগম্বর হই বস্ত্র বাঁধিলেন শিরে।
যোড়ে যোড়ে লম্ফ দেয় হাসিয়া হাসিয়া
সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া।"

গদাধর, শ্রীবাস, হরিদাস প্রভৃতি এই রঙ্গ দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইলেন। গৌরচন্দ্র কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"*নিতাই, সাবধান, এ ভদ্র গৃহস্থের* বাড়ী, বুঝিয়া কাজ কর। এখনই বলিলে যে,আমি কি পাগল,সে কথা কি ভুলে গেলে, এ পাগলের কাজ নয়তো আর কি? এই বলিয়া স্বহস্তে বিশ্বম্ভর নিত্যানন্দকে বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দ আনন্দসিন্ধুতে মগ্ন হইয়া সেসব কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

"ডাকি বলে বিশ্বম্ভর একি কর কর্ম্ম।
গৃহস্থের ঘরেতে এমত নহে ধর্ম্ম।
এখনে বলিলে তুমি আমি কি পাগল।
এই ক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল।
যার বাহ্য নাহি তার বচনে কি কাজ
নিত্যানন্দ ভাসয়ে আনন্দসিন্ধু মাঝ।"

বেলা দুই প্রহর। বিশ্বম্ভর নিজ গৃহের নিভৃত প্রকোষ্ঠে দিব্য খট্টায় আসীন। নিকটে পতিপ্রাণা বিষ্ণুপ্রিয়া বসিয়া এক দৃষ্টে স্বামীর মুখ পানে তাকাইয়া আছেন এবং মাঝে মাঝে স্বামীর করকমলে তাম্বুল দিতেছেন। গৌরচন্দ্র তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে কত ধর্ম্মের কথা, প্রেমের কথা, সংসারের কথা, কত মিষ্ট মিষ্ট কথা শুনাইতেছেন। সরলমতি অবলা স্বামীর মধুমাখা কথা শুনিতে শুনিতে বৈকুণ্ঠের সুখ অনুভব করিতেছেন। মাঝে মাঝে মৃদুমোহন স্বরে দুই একটী কথার উত্তর করিতেছেন। এবং আপনার অতুল রূপ রাশি বিকাশ করিয়া ঘর আলো করিয়া বসিয়া আছেন। গৌর! এরূপ কি তোমার মনে ধরে? লোকে যে বলে তুমি তোমার স্নেহময়ী জননী ও প্রেমময়ী পত্নীকে ভালবাস না। বাসিলে তাঁহাদিগকে সংসারের অকূল সাগরে ভাসাইয়া সন্ন্যাস লইতে না, এ কথা কি সত্য? আমরা *সংসারের ক্ষুদ্রচেতা জীব, তাই তোমার* প্রেমের গভীরতা বুঝিতে না পারিয়া এরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকি। অথবা প্রণয়িনী

বিষ্ণুপ্রিয়ার রূপ তোমার মনে ধরে বৈ কি? নইলে আজ এমন ক'রে ওঁর সঙ্গে মিষ্ট আলাপ করিয়া সুখানুভব করিবে কেন? বুঝিয়াছি, এই ভালবাসা ভগবৎ-প্রেমসিন্ধুর বিন্দু বলিয়া তোমার নিকট ইহার এত খাতির।

পুত্র ও পুত্রবধূকে এক সঙ্গে থাকিতে দেখিলে শচীমাতার মনে বড়ই আনন্দ হইত। তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া গৌরচন্দ্র আরো এই রূপ করিতেন। আজ বধূর সঙ্গে গৌর যে ভাবে বসিয়া কথা কহিতেছেন, শচী দেবী তাহা প্রকোষ্ঠান্তর হইতে দেখিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন। "নিমাই সন্ন্যাসী হইয়া ঘর ছাড়িয়া যাইবেন—" বহুদিন পূর্ব্বে তিনি যে এই স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা মধ্যে মধ্যে স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া তাঁহাকে বড়ই যন্ত্রণা দিত। আজও তাঁহার সে স্বপ্নের কথা মনে পড়িয়াছে বটে, কিন্তু আজ তাহা তিনি অমূলক বোধে উড়াইয়া দিলেন। কেননা, যখন বধূর সঙ্গে পুত্রের এত ভালবাসা হইয়াছে, তখন কি আর সন্ন্যাস সম্ভবে? আহা! সরলমতি জননি, বুঝিলে না যে তোমার পুত্রের দাম্পত্য-প্রেম মাতৃভক্তির নিকট তুলনায় অতি অকিঞ্চিৎকর। যদি এই প্রগাঢ় মাতৃভক্তিই তাঁহার গৃহে থাকার পক্ষে যথেষ্ট না হয়, তবে দাম্পত্য-প্রেমে কি তাঁহাকে আটকাইতে পারে?

এই সময়ে বাহির প্রাঙ্গণে মনুষ্যের পদশব্দ শুনা যাইতে লাগিল। শব্দ ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হওয়ায় বিষ্ণুপ্রিয়া একটু কুণ্ঠিত হইলেন। আর কিছু বলিতে না বলিতে প্রেমানন্দে বিহ্বল ও বাল্যভাবে চঞ্চল হইয়া নিত্যানন্দ দিগম্বর বেশে গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন। লজ্জাবনত মুখে বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া কোন্ দিকে যাইবেন ঠিক না পাইয়া প্রকোষ্ঠের নিভৃত স্থানে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিলেন; আর গৌরচন্দ্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া সম্মুখস্থিত আপন পরিধেয় বস্ত্র খণ্ড লইয়া নিতাইয়ের কটিদেশে দিতে গেলেন। অন্য কোন ব্যক্তি হইলে আজ গৌরের নিকট সমুচিত শিক্ষালাভ না করিয়া যাইতে পারিত না, কিন্তু নিত্যানন্দ-চরিত্র গৌরের নিকট অব্যক্ত ছিল না। তিনি জানিতেন যে, নিতাই হরিপ্রেমে বিভোর, ভেদাভেদ-জ্ঞানশূন্য ও অমায়িক সরলতায় পরিপূর্ণ। নিতাইয়ের বিশাল হৃদয়ে ভগবৎভাব ভিন্ন অন্য কোন ভাব স্থান পায় না; তাই আজ এরূপ অসহনীয় ধৃষ্টতা সত্ত্বেও গৌরচন্দ্র তাঁহাকে প্রেমচক্ষে দেখিতে লাগিলেন। নিতাইয়ের প্রেমে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল এবং প্রেম ভাবে ও সস্মিত বদনে নিত্যানন্দের সঙ্গে রহস্য-কৌতুক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নিতাই তখন হরিপ্রেমে পূর্ণ হইয়া বাহ্যজ্ঞান-শূন্য। সুতরাং অসম্বন্ধ প্রলাপ বাক্যের ন্যায় কি বলিতে লাগিলেন, গৌরচন্দ্র তাহার অর্থ বুঝিতে পারিলেন না।

গৌরচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিত্যানন্দ দিগম্বর হয়ে এসেছো কেন?'

নিতাই কিছু না বলিয়া, হাঁ হাঁ, এইমাত্র উত্তর করিলেন।

গৌরচন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "নিতাই? কাপড় পরিবে না কি?"

নিতাই। 'আমি যা—বো'

গৌর ঈষৎ কোপের সহিত বলিলেন—"তোমার এ কি ব্যবহার?"

নিতাই। "আর খাইতে পারি না।"

গৌর। 'এক কথার অন্য রূপ জবাব দাও কেন?'

নিতাই। দশ বার যাবো?

তখন গৌরচন্দ্র পরাস্ত হইয়া কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করত বলিলেন, দেখ নিতাই, ইহার পর আর আমার দোষ দিতে পারিবে না।

নিত্যানন্দ তখন একটু সাব্যস্ত হইয়া চমকিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"মা কোথায়? তিনি তো এখানে নাই।" শচীমাতাকে নিত্যানন্দ জননী সম্বোধন করিতেন। গৌরচন্দ্র তখন বধূকে লক্ষ্য করিয়া একটু মিনতিব্যঞ্জক স্বরে কহিলেন, "নিতাই! যথেষ্ট হয়েছে, এখন কৃপা করে বস্ত্র পরিধান কর।"

নিতাই সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন— 'আমি কিছু খাবো!"

গৌরচন্দ্র তখন স্বহস্তে নিতাইকে বস্ত্র পরাইয়া দিলেন। দূর হইতে শচীমাতা এই রঙ্গ দেখিয়া হাসিতেছিলেন। যেদিন হইতে নিতাই তাঁহাকে জননী সম্বোধন করিতেন, সেই দিন হইতে তাঁহাকে পুত্রের মত স্নেহ করিতেন। নিতাই ভোজনের অভিলাস জানাইলে শচী-মাতা গৃহ হইতে পাঁচটী সন্দেশ আনিয়া তাহার হাতে দিলেন। নিতাই বাল্য-ভাবে মগ্ন; সন্দেশ পাইয়া আনন্দের সীমা নাই; কতক খাইতে লাগিলেন ও কতক চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিতে লাগিলেন। শচী এই ব্যবহার দৃষ্টে একটু তিরস্কার করাতে নিতাই বলিলেন যে "আরও আনিয়া দাও।"

শচী-মাতা বলিলেন, ঘরে আর সন্দেশ নাই।

নিতাই। যাও তো, অবশ্য পাইবে।

তখন শচী-দেবী গৃহ মধ্যে যাইয়া যথা স্থানে সজ্জিত ঐরূপ পাঁচটী সন্দেশ দেখিয়া বিস্মিতা হইলেন এবং নিতাইকে তাহা আনিয়া দিয়া ঈশ্বর-জ্ঞানে তাঁহার চরণ ধরিয়া প্রণাম করিতে অগ্রসর হইলেন। নিতাই দূর দূর বলিয়া হাসিতে হাসিতে পলাইয়া গেলেন।

বৃন্দবন দাস মহাশয় নিত্যানন্দ-শিষ্য। সেজন্য তিনি স্বপ্রণীত গ্রন্থের অনেক স্থানে স্বীয় অভীষ্ট-দেবের অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক অনেক গুলি অদ্ভুত আখ্যায়িকা বলিয়াছেন। তাহার সবিস্তর বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলা যাইতেছে। শ্রীবাসের ব্রাহ্মণী মালিনী দেবীকে নিত্যানন্দ জননী জ্ঞানে মা বলিতেন ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে পিতৃ সম্বোধন করিতেন। মালিনী দেবীও তাঁহাকে পুত্র জ্ঞানে লালন পালন ও সেবা সুশ্রূষা করিতেন। কথিত আছে যে, নিতাই নিরবধি মালিনীর স্তন পান করিতেন। নিতাই নিজ হাতে ভাত খাইতেন না; ছোট ছেলেকে যেমন করে ভাত খাওয়ায়, মালিনী তেমনি করিয়া ভাত খাওয়াইয়া দিতেন।

"আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।
পুত্র প্রায় করি অন্ন মালিনী যোগায়।"

এক দিন ঠাকুর সেবার ঘৃতপাত্র, একটী ছোট পিতলের বাটী কাকে লইয়া গিয়াছিল, ক্ষণকাল পরে সেই কাক ফিরিয়া আসিলে দেখা গেল যে, তাহার শূন্য মুখ, বাটী নাই। শ্রীবাস পণ্ডিত ঠাকুর সেবার জিনিষ-পত্র সম্বন্ধে অতি যত্নশীল; তাহার কিছু অপচয় হইলে তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিত না। মালিনী বাটীর জন্য অত্যন্ত আকুল হইলে

নিত্যানন্দ হঠাৎ সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া সকল অবস্থা অবগত হইলেন এবং মালিনীকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, কিছু চিন্তা নাই, তিনি বাটী আনাইয়া দিবেন। তৎপরে নাকি তিনি কাককে বাটী আনিতে বলিলে কাক উড়িয়া অদৃশ্য হইয়া গেল ও ক্ষণকাল পরে বাটী মুখে করিয়া প্রত্যাগমন করত যথা স্থানে রাখিয়া চলিয়া গেল। মালিনী দেবী তখন নিত্যানন্দ-প্রভাব অবগত হইয়া যোড় হস্তে স্তব করিতে লাগিলেন।

গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের তত্ত্ব বিলক্ষণ বুঝিয়া ছিলেন। ভক্ত মণ্ডলীতে তাঁহার সম্মান বাড়াইবার জন্য তিনি এক দিন নিতাইয়ের এক খানি পরিধেয় কৌপিন চাহিয়া লইলেন এবং তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া সকল ভক্তকে বিতরণ করিয়া দিয়া মস্তকে বাঁধিতে বলিলেন এবং শত মুখে নিতাইয়ের গুণ ব্যাখ্যা করিতে করিতে প্রেমে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গমহিলা।

(বিদায়)

নিস্তব্ধ নিশার শেষভাগে, অস্ফুট চন্দ্রালোকে, নীরব বিষণ্ণ অন্তরে যখন আমরা সুষুপ্ত বৃন্দাবন ও মথুরার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কীর্ত্তির মহা শ্মশান ইন্দ্রপ্রস্থাভিমুখে যাত্রা করি, জানি না কেন তখন, জননী জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কোন অজ্ঞাত দূরদেশে যাইতে মন যেমন সহজে অগ্রসর হইতে চাহে না, সেইরূপ সেই তীর্থস্থান পরিহারে আমার হৃদয় ব্যথিত হইল। অগণিত তারকাপুঞ্জ মস্তকোপরি. নিম্নে কলনাদিনী পুণ্যসলিলা যমুনা এবং পার্শ্বে পার্শ্বে কাঞ্চনচূড় অসংখ্য দেবমন্দির, কিন্তু নিরানন্দ-মানস-জনিত এ সকলই আমার নেত্রে শোভাহীন বোধ হইতে লাগিল। সুচারু-যমুনা-সেতুর উপর হইতে নিশীথ অন্ধকারে পশ্চাৎগামী মথুরাপুরী দেখিতে বড় মনোহর এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে নিশাবসানের দেব-মন্দিরাগত নহবৎধ্বনি অতীব শ্রুতি-সুখদায়ক। তবে নৈরাশ্যের ঘোর অমাবস্যায় এ সবই যেন কেমন ছায়াময় করিয়া ফেলিল; তাহা আজি বাহ্যজীবনের আধভাঙ্গা স্বপ্নবৎ স্মৃতিতে কখন কখন জাগিয়া উঠে মাত্র।

অশ্ব শকটের বিশাল ঘর্ঘর শব্দ সহসা থামিলে, ট্যাক্স দারোগার (Toll officer) জীর্ণ বদন দর্শনে আমার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। তখন বুঝিলাম যে, আমরা ষ্টেসনের অতি নিকটে। রজনী প্রভাতেই ষ্টেসনে পৌঁছিলাম।

উষার হাস্যময়ী বসন্তমলয় মারুৎ সেবনে যেন অনুপ্রাণিত হইয়া, আবার আমরা দিল্লীগামী দ্রুততর বাষ্পীয় যানে উঠিয়া, নানা প্রকার দৃশ্যময় গ্রাম নগরী দেখিতে দেখিতে, ঠিক বেলা দ্বিপ্রহরের সময়েই দিল্লী গিয়া অবতরণ করিলাম, এই পথের সকল স্থানের নাম গুলিই শ্রো-

সুন্দর। তন্মধ্যে আলিগড় একটী প্রাচীন ঐতিহাসিক ও আধুনিক অতি সমৃদ্ধিশালী স্থান। এই আলিগড়ের বিখ্যাত মৃত্তিকা-দুর্গ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ডলক অধিকার করিয়াছিলেন ও নগরের অনতিদূরে অদ্যাপি তাহার চিহ্ন আছে। এখানে বহু সংখ্যক ধনী মুসলমানের বাস এবং কলেজ প্রভৃতি থাকায় বেশ জ্ঞানালোচনাও এখন হইয়া থাকে। অনেক বাঙ্গালী কার্য্যোপলক্ষে এখানে আসিয়া লোক জনের নিকট সমুচিত সম্মান লাভ করিয়া সগৌরবে রহিয়াছেন।

আলিগড়ের প্রস্তর-বিনিন্দিত মৃন্ময় পাত্রাদি বড় সুন্দর এবং সে জন্যও ইহা সর্ব্বত্র বিশেষ প্রসিদ্ধ। ষ্টেসনে দলে দলে বিক্রেতাগণ সে সকল দ্রব্য সামগ্রী লইয়া আসিয়া দর্শকের দৃষ্টি ও হৃদয় আকর্ষণ করে। কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালী কেবল তার দরমাত্র করেন, ক্রয় করেন কেবল ইংরাজ স্ত্রী পুরুষ।

দিল্লী হিন্দু এবং মোগল গৌরব বিকাশের পূর্ণ শেষ নিদর্শন হইলেও, তাহাতে নামিয়া আমরা যেন নিতান্ত-পরিত্যক্ত অনুভব করিতে লাগিলাম ও তখন পাণ্ডাঠাকুরদিগের সময়োচিত সাহায্য ও উপকারিতা আরো গভীর রূপে মনে জাগিতে লাগিল। এখানেও হিন্দুর সরাই আছে এবং "ময়ুর সরাই" তন্মধ্যে প্রধান; কিন্তু বাঞ্ছনীয় নির্জ্জনতা অভাবে আমরা সেখানে যাইতে অস্বীকার করিয়া এক জন ফিরিঙ্গী পাদরীর রক্ষিত-রক্ষিত হোটেলের দ্বিতল অংশে বাসা লইলাম। তাঁহার বন্দোবস্তের সুবিধায় আমাদিগকে সেখানে কোনই কষ্ট পাইতে হয় নাই। পাদরী সাহেবটী অতি ভদ্র লোক। অযাচিতরূপে সময় মত সকলি পাওয়া যাইত। তাঁহার কিছু ত্রুটি ছিল না। যদিও বহুদিন হইতে মুসলমান জাতির সহিত আমরা নিকটতর সম্বন্ধ-সূত্রে আবদ্ধ, এবং তাঁহারা আমাদিগের ভ্রাতৃস্থানীয়, যদিও পুরাকালে হিন্দু রাজপুত-কন্যার সহিত মোগল সম্রাটগণের পবিত্র পরিণয়ও হইত, এবং বাদসাহ-দরবারে কত উচ্চ উচ্চ রাজপদ অযাচিতে লাভ করিয়া হিন্দুগণ সম্মানিত হইতেন এবং অদ্যাপিও কত কত রাজন্যবর্গ দিল্লীশ্বরের কৃপায় সর্ব্বত্র পূজিত হইতেছেন, তবু বলিতে পারি না কেন, এই হোটেলের যবনভৃত্যদিগকে আমি কোনমতেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই, এবং তাহাদিগকে স্বকার্য্যে রত দেখিয়াও আমার হৃদয়ে সন্দেহ-জনিত অসুখ অনুভব হইত। বড়ই দুঃখের বিষয়, হোটেলের একজন 'আরদালি' মুসলমান সুচারুরূপে আমাদিগের বাহিরের সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াও আমার বিশ্বাসভাজন হয় নাই।

আমাদিগের হোটেলের অপর অংশে মহারাজ হোলকারের কয়েকজন "মোসাহেব" বাসা লওয়াতে এখানে আমরা আশাতীত নিরাপদ হইয়াছিলাম।

নানা কথায় এক কৌতুকাবহ ঘটনার উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছি। তখন ভিসি (Veasey) সাহেবের অভূতপূর্ব্ব গোপনীয় সারকিউলার "অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গে" জারি হয় নাই ও কূটনৈতিক ডফারিণ মহোদয় "ফ্রন্টিয়ার পলিসি" এবং ব্রহ্মজয়ে বিব্রত হইয়া স্বদেশাভিমুখে অকালে অপসৃত হইবেন, ইহাও কেহ জানিত না। সে যাহা হউক, আমরা ট্রেণ হইতে নামিয়া ষ্টেসনের বাহিরে পা দিবা মাত্র সহসা কোথা হইতে একজন দক্ষ পুলিশ কর্ম্মচারী, খাতা হস্তে, লেখনী কর্ণে, নাম ধামাদি

লিখিয়া লইবার অভিপ্রায়ে আমাদিগের সম্মুখে দ্রুতবেগে আসিয়া উপস্থিত হইল। আমরা ছদ্মবেশী রুসিয়ান নহি এবং গরিব আমাদিগের দ্বারায় প্রবলপ্রতাপ বৃটিশ সিংহের অপ্রতিহত সাম্রাজ্যের কোনরূপ যে বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা বা আশঙ্কা নাই, একথা বিশদরূপে বুঝিয়াও সে ব্যক্তি, তাহার প্রভুকে মিষ্ট ভাষায় গালি দিতে দিতে সরব বিনয়ে নিজ "ডিউটি" (Duty) করিয়া, সেই সঙ্গেই আবার ভাগ্যদোষে এই অসার কার্য্যেও গৌরাঙ্গ প্রভুর নিত্য অপমানের তাড়নায় জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে বলিয়া কত কি আক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহারই প্রমুখাৎ শ্রুত হইলাম যে, দিল্লী রাজসূয় দরবারের পরে বড় লাটের হুকুমে নাকি এই "রূল" হইয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা অপহরণ এবং অস্ত্র আইন বিধিবদ্ধ করিয়া সুনীতি-বিশারদ লীটন বাহাদুর যে কীর্ত্তিধ্বজা উড়াইয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার নাম ভারতে চিরস্মরণীয়। আর এটা সেটা টানিবার প্রয়োজন ছিল না।

মদ্যপায়ী যথেচ্ছাচারী বামাচার-সম্প্রদায়ের বিনাশার্থে এবং পাপীর মুক্তি তরে যেমন পুণ্যবতী জাহ্নবী-হৃদয়ের জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত পবিত্র নবদ্বীপ ধামে,—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের 'নদীয়াপুরে' শ্রীগৌরাঙ্গ দেবাবতারের আবির্ভাব, তেমনি লীটন-শাসন-প্রপীড়িত দগ্ধ ভারতে শান্তিবারি সিঞ্চনার্থ মহাত্মা লর্ডরিপণের শুভাগমন হইয়াছিল। ইংরাজ-শাসিত ভারতরাজ্যে, সাম্যের মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া নববিধি প্রচার করিতে তিনি ঈর্ষান্বিত স্বজাতির বিরাগভাজন হইয়া, অসময়ে, ব্যথিত অন্তরে ভারতভূমি পরিত্যাগে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এখন সে কথা যাউক।

ইন্দ্রপ্রস্থ ও দিল্লী।

ধন, মান, সুখ, সম্পদ, বীরত্ব ও পুণ্যময় স্বাধীনতার একত্রীভূত সমষ্টি, স্মৃতির পরম আদরণীয় ও কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এই ইন্দ্রপ্রস্থ। ভীমার্জ্জুন যুধিষ্ঠিরের পবিত্র পদরেণু অদ্যাপি ইহার অণুতে,—প্রত্যেক ধূলি-কণায় যেন তাঁহাদিগের জীবনকাব্যের পবিত্রতার মধুর কাহিনীর পরিচয় দিতেছে। যুগ যুগান্তরবাহী সমীরণ আজিও যেন ভারতের দ্বারে দ্বারে সেই পূর্ব্বের অতুলনীয় মহিমাগীতি গাইয়া বেড়াইতেছে,—দুর্ভাগ্য দাসত্ব-জীবী মৃতপ্রায় আর্য্য সন্তানের পুনর্জ্জীবন দান করাই যেন তাহার অভিপ্রায়। অতীতের সে সঞ্জীবনী সুধা-গীতে যদি আবার ভারতে নবজীবন সঞ্চার হয়, আবার যদি তাহাতে নিদ্রিত ভারতবর্ষ উৎসাহানলে জ্বলিয়া উঠে, তবেই চির বিশ্বস্ত বায়ু কৃতার্থ হইবে।

ইন্দ্রপ্রস্থ এবং দিল্লী দুইটী বিভিন্ন নগরী ও অতি সামান্য পথ মাত্র ব্যবধান। পরবর্ত্তী আর্য্যপুত্রগণ পূজনীয় ইন্দ্রপ্রস্থের শেষ রেখাও যে আর দেখিয়া জীবন সার্থক করিবেন, সে আশা বড় কম। ভারতের মানচিত্রে তাহার প্রতিকৃতি বহুদিন লোপ পাইয়াছে, কেবল স্মৃতিযোগে ভগ্নপ্রস্তরে ইন্দ্রপ্রস্থ দেখিতে পাওয়া যায়।

যুগান্তরের সাক্ষী-রূপী এই যে, অযুত অযুত রাজপুত বীরের লীলাক্ষেত্র দিল্লী-নগরী—এই শরীরী স্বপ্নময় কীর্ত্তির মহা শ্মশানে দাঁড়াইয়া অদ্য যদি আমি অভ্রভেদী স্বরে ক্রন্দন করি, তবে আমার সে মর্ম্মা-

ত্তিক করুণ রোদন ধ্বনি কাহার প্রাণ স্পর্শ করিবে? কে আমার হৃদয়ের গভীর বেদনা বুঝিবে বল?

"ভারতে জীবন নাই, শব রাশি রাশি জাহ্নবীর দুই তীরে।" চারিদিকে ভগ্নাবশেষ, সর্ব্বত্র শ্মশান, ধূ ধূ করিয়া চিতানল জ্বলিতেছে, তাহাতে আশা ভরসা, উৎসাহ, উদ্যম অনুদিন পুড়িয়া পুড়িয়া সব ভস্মীভূত হইয়া যাইতেছে। মনে হয়, কুরুক্ষেত্র মহা সমরে যে অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়াছে, আজও যেন সেই জাতি-বিরোধরূপ-সর্ব্বগ্রাসানল নির্ব্বাপিত হয় নাই। জীবনের পার্থিব মায়া পরিহার করিয়া "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং, শস্য শ্যামলাং' পবিত্র মাতৃভূমিকে প্রাণ-পুষ্পাঞ্জলি দিয়া পূজা না করিলে অদ্যকার এ দুর্গতি আর ঘুচিবার নয়।

"ছিল বটে আগে তপস্যার ফলে।
কার্য্য সিদ্ধ হতো এ মহীমণ্ডলে॥
এখন সে দিন নাহিক রে আর।
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার—
হবেনা হবেনা"

ইহাই পরীক্ষিত সত্যস্বরূপ মনে বিশ্বাস করিয়া স্বকার্য্য উদ্ধারেবদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

এখনও "বিংশতি কোটি" ভারত সন্তান একমন, এক প্রাণে, সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সাধনা করিলে অবশ্যই সিদ্ধ-মনোরথ হইতে পারেন।

দৃশ্যময় মহানগরী দিল্লী সম্বন্ধে নূতন করিয়া কোন কথা বলিবার না থাকিলেও, প্রত্যেক আর্য্যসন্তানেরও নিকট তাহার কথা প্রতিবারই নূতন। আমার নয়নে এস্থান একটী অভিনব পুণ্যতীর্থ।

কাব্য ইতিহাস পুরাণে, কথায় কি উপকথায়, আশৈশব যাহার গৌরব-বৃত্তান্ত শুনিয়াছি, সেই হিন্দু মুসলমানের কীর্ত্তিমান স্মৃতিচিহ্ন, দিল্লীর প্রাচীন সৌধমালা এখনও রমণীয় শ্রীসম্পন্ন ও পূর্ব্ব-ঐশ্বর্য্য-প্রকাশক। আগ্রা এবং দিল্লী যদি একজন পৃথিপতির কল্পনাময় মানস রাজ্য হইত, কিম্বা অমর-শিল্পী বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং একই উপকরণে ইহা নির্ম্মাণ করিতেন, তবুও আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যে ইহারা দুইটী পৃথক সুরপুরী। এক জননীর গর্ভজাত দুইটী সন্তান যেরূপ বিধাতার অপূর্ব্ব কৌশলে একাকৃতি-সম্পন্ন নহে, সেইরূপ এই অলৌকিক শিল্পজাত অমরাবতীদ্বয়ও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

পুরাতন প্রাসাদনিচয় এক দিকে যেমন দিল্লীর অনন্ত বৈভবের পূর্ণতার পরিচয় দিতেছে, অন্যদিকে তেমনি আবার ভগ্ন সমাধি ও ধ্বংসাবশেষদ্বারা মানব সম্পদের অচিরস্থায়িত্বের কথা নীরবে কহিতেছে। এই জীবন-মৃত্যু বক্ষে ধারণ করিয়া মহানগরী দিল্লী অদ্যাপি দণ্ডায়মান। মহা রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার কলিকাতা আজ ধন, জন, সুখ, সৌভাগ্যপূর্ণ রাজধানী, আর দিল্লী প্রাচীন স্মৃতির গৌরব-বাজা, শাপভ্রষ্ট সুরধাম। দিল্লীর ইংরাজ-নির্ম্মিত নূতন অট্টালিকাগুলি কলিকাতার সহিত তুলনায় কিছুই নহে। রাজপথও জনকোলাহল পরিশূন্য এবং এদিক সেদিক বৃহৎ বৃহৎ প্রান্তর শ্যামল দূর্ব্বাদল ও ছায়াময় তরুরাজি বিহীন,—প্রচণ্ড রবিকরে যেন সব দগ্ধপ্রায়। রাজপথে জলসিঞ্চনের চিহ্ন মাত্র নাই। নিম্নে নীলাম্বিনী যমুনা, মৃদু কল্লোলিনী, কিন্তু সে কল্লোল মন্থরগমনে জীবনের অপূর্ণ-মানসে জাগিব জাগিব করিয়া আবার বিস্মৃতি সহ মিলাইয়া যায়। তাহাতে সুখ নাই, কেবল যন্ত্রণা।

গজদন্ত-বিনির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্যের সজ্জিত বিপণী রাজপথবাহী দর্শকগণের দৃষ্টি আকর্ষণকারী। সেই বিচিত্র সৌন্দর্য্য দুর্ম্মূল্যও নহে। সকলেই তাহা ক্রয় করিয়া সুখী হইতে পারেন।

"দিল্লীকা-লাড্ডু যো খায়া ওবি পস্তায়া যো না খায়া ওবি পস্তায়া" এই রহস্যবাণী বাল্যকাল হইতে শুনিয়াছি সেই রহস্যময় মিষ্টান্ন-মিষ্টারী-(Mystery) ভেদাভিলাষী আমরা তাহার মধুরতায় সরস রসনা পরিতৃপ্ত করিতে যেরূপ উপহসিত হইয়াছিলাম, তাহা আবার নূতন করিয়া জনসমাজে বলিয়া আর লজ্জা পাইতে চাহি না। সে সাধের 'লাড্ডু' ভ্রান্ত পথিকের দন্ত ও জিহ্বা একবার আস্বাদ করিলে ইহজীবনে কখনও ভুলিতে পারেনা। তাহার বাহ্যদৃশ্য চমৎকার, কিন্তু ভিতর বালুকা পরিপূর্ণ, সুতরাং তাহা যো খায়া ওবি পস্তায়া, যো না খায়া ওবি পস্তায়া, একথা ঠিক।

এখানে রাজকর্ম্মচারী ও রেলওয়ের বাঙ্গালী ব্যতীত আর সবই প্রায় তদ্দেশীয় মুসলমান। ষ্টেসন মাষ্টারদিগের প্রতি বঙ্গপ্রিয় "ধীরাজের গান, বেটাদের আলনার চাপকান সব দেখিতে পাই" দিব্য স্মরণ থাকিলেও সেই বাল্যসুলভ রাগ তাঁহাদিগের উপর আর নাই। এই পর্য্যটন-বহুদর্শিতায় যাহা দেখিলাম, তাহাতে বাঙ্গালা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানের বাঙ্গালী ষ্টেসন মাষ্টারদিগকে অতি ভদ্রলোক বলিয়া প্রতীতি জন্মিয়াছে। তবে তাহাদিগের নীচকর্ম্মচারী "রেলের" দুচারি জন বাবু এরূপ সেরূপ বটে। রেলওয়ে ইত্যাদির উচ্চকার্য্যে উচ্চশ্রেণীর ভারতবাসীর সংখ্যা যত বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি হইবে, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। অহিফেন প্রভৃতি ডিপার্টমেণ্ট এখনও ইংরাজ ফিরিঙ্গীর একচাটিয়া।

চন্দ্র সূর্য্য রশ্মি-হীন, বায়ু-প্রবাহরুদ্ধ অন্ধকূপ-বাসিনী উচ্চবংশীয়া যবন রমণীর মুখ-দর্শন-সৌভাগ্য দিল্লী আসিয়াও আমার অদৃষ্টে ঘটে নাই, তাই—"হরি হরি কেমন করিয়া বলিব, কেমন সেই মুখখানি" তবে ভাগ্যবতী মুসলমানীর ট্রেনারোহণের আপাদমস্তক শোচনীয় অবগুণ্ঠন, "ঘেরা টোপ" ভাবিলে এখনও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, কিন্তু আমোদ এই যে, সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিমতী লজ্জা, (আবরু) দাসী পরিবেষ্টিতা হইয়া প্লাটফর্ম্মে বিরাজ করে।

ক্রমান্বয়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রথম দিন বাসা পরিত্যাগে অসমর্থতা হেতু পরদিবস মধ্যাহ্নেই তীব্র রবিকর উপেক্ষা করিয়াও আমরা দিল্লী সন্দর্শনার্থ শকটারোহণ করিলাম। আমাদিগের মূর্ত্তিমান ছক্কড় (ছ্যাকড়া গাড়ী) শশব্দে লতা পুষ্প সুশোভিত "শিশুকণ্ঠকূজিত" বিগ্রেড্ জেনারেলের "কুঞ্জ কুটীরাভি"মুখে যেন প্রধাবিত হইল, আর প্রলয়ের ঝঞ্ঝাবাতে যেন দেশ শুদ্ধ ধূলি রাশি উড়াইয়া চলিল। জেনারেল সাহেবের নিকট দুর্গ প্রবেশের পাস সংগ্রহ করা রীতি। সৈনিক বিভাগের উচ্চ পদস্থ ইয়োরেসিয়ানরা প্রায়ই গর্ব্বান্ধ অধিকাংশ সিভিলিয়ান অপেক্ষা শত গুণে ভদ্রলোক। বীর শোণিত অকারণে কদাপি উষ্ণ হয় না। অসারে উত্তাপ বেশি—ইহা জগতে কেহই অবিদিত নহেন।

শ্রীমতী নীহারিকা দেবী।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচন।

১। চন্দ্রা।— উপন্যাস, বন্দ্যো ও মুখর্জি প্রকাশক। গ্রন্থে লেখকের নাম নাই। না থাকুক, তাতে কিছু আসিয়া যায় না। গ্রন্থখানি ভাল হইয়াছে। চন্দ্রার লেখক বাহ্য জগতের কোন চিত্রফলক তুলেন নাই, কিন্তু অন্তর প্রকৃতির চিত্র তিনি অতি সুন্দর রূপে আঁকিয়াছেন। গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলেই গ্রন্থকারের নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। তবেঁ একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, নানা ধাম্পুপন্তের চরিত্র অঙ্কিত করিতে গ্রন্থকার অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। আর আর যে সকল সামান্য দোষ আছে, তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। আমরা চন্দ্রা পড়িয়া অত্যন্ত সন্তোষ লাভ করিয়াছি।

২। শঙ্করাচার্য্য।—শ্রীকেদার নাথ চক্রবর্ত্তী প্রণীত, মূল্য ।।০। পুস্তক খানিতে শঙ্করের জীবনী ও তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পুস্তক খানি উপন্যাসের ন্যায় সরস ভাব-যুক্ত। ভাষা প্রাঞ্জল, ভাব সুন্দর। পুস্তক খানির আদর হইবে বলিয়া আশা আছে।

৩। ভারতগৌরব শঙ্করাচার্য্য— শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্ত্তী প্রণীত। এখানিও ঐ এক উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু অতি সংক্ষিপ্ত। স্থানে স্থানে লেখকের কল্পিত উক্তি বিরক্তি উৎপাদন করিয়াছে।

৪। গণেশসম্ভব কাব্য। প্রথম ভাগ শ্রীমতিলাল দত্ত প্রণীত, মূল্য ।০। পুস্তক খানি প্রশংসা-পত্র সহিত প্রকাশিত হইয়াছে। পুস্তক খানি না পদ্য না গদ্য। লেখকের একটা নূতন ছন্দ রচনা করিতে অভিলাষ ছিল, কিন্তু তাহা পূর্ণ হয় নাই,— পূর্ণ হইবে না।

৫। সদ্ভাব-সঙ্গীত।—শ্রীগঙ্গাচরণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত, মূল্য ৵০। পুস্তক খানিতে অনেক ভাল২সঙ্গীত আছে। দেশের নানাপ্রকার দুর্নীতি ও কুসংস্কার দূর করিবার মানসে ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য অতি মহৎ, লেখাও সুন্দর। একটী গানের নমুনা দি; এ গানটী অনেকেই জানেন।

বাউলের সুর—তাল একতালা।

একবার ডাক্ দেখি মন, ডাকার মতন দয়াময় বলে।
এখনি পাবি দরশন,ডাকার মতন ডাকা হ'লে॥
বল আর কতদিন ভবে,পাপের বোঝা মাথায় ববে,
অনুতাপে দগ্ধ হবে, জীবন যাবে বিফলে॥
তিনি অন্তরের ধন, অন্তরে কর সাধন,
সঁপিয়া জীবন মন, তাঁর শ্রীচরণ তলে॥

৬। অধ্যাপক হক্সলি প্রণীত বিজ্ঞান প্রবেশ।—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অনুবাদিত ও প্রকাশিত; মূল্য ।/০। এই পুস্তক খানি বালকদিগের জন্য প্রচারিত হইয়াছে। হক্সলি এক জন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত, তিনি যে সকল মত প্রচার করেন, তাহা খণ্ডন করিতে অতি অল্প লোকে পারে। এ পুস্তকে যে সকল কথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে বড় একটা মতভেদ দৃষ্ট হয় না। কৃষ্ণ বাবু অতি সুন্দর প্রণালীতে,সুন্দরভাষাতে উক্ত মহাত্মার Science Primer পুস্তক খানিকে অনুবাদ করিয়াছেন। পুস্তক খানি যে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

চৈতন্যচরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম।—(২২শ)

প্রচার আরম্ভ।

এতদিন গৌরচন্দ্রের ধর্ম্মসাধন গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হইতেছিল। বাহিরের লোক ইহার ভিতরের তত্ত্ব কিছুই জানিতে পারে নাই। নিমাই পণ্ডিত অধ্যাপনা ছাড়িয়া বৈষ্ণবদলে মিশিয়া নাকি সংকীর্ত্তন করিতেছে, ইহা ভিন্ন তাহারা আর কিছু জানিত না। তাঁহার অলৌকিক ভক্তির উচ্ছ্বাস, মহাভাবের প্রকাশ, প্রেম-বিহ্বলতা প্রভৃতি গুণ ভক্তমণ্ডলীর মধ্যেই কেবল সুবিদিত ছিল ঃ—

"লোক দেখে পূর্ব্বে যেন নিমাই পণ্ডিত,
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত।
যখন প্রবিষ্ট হন সেবকের মেলে,
তখন ভাসেন সেই মত কুতূহলে।
যার যেন ভাগ্য তেন তাহারে দেখায়,
বাহির হইলে পুনঃ আপনে লুকায়।"

এক দিন ভাবাবেশ কালে গৌরচন্দ্র, নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুন নিত্যানন্দ হরিদাস! তোমরা দুই জন আজ হইতে এই নবদ্বীপের প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া হরিনাম প্রচার করিতে আরম্ভ কর। যাহাকে দেখিবে, তাহাকে মিনতি করিয়া হরিনাম সাধন করিতে উপদেশ দিবে। ইহাতে ব্রাহ্মণ চণ্ডালের স্ত্রী পুত্রের ভেদ করিবে না। সকলেই সমান অধিকারী। আর দিনান্তে তোমাদের প্রচার-বৃত্তান্ত আমার নিকট আসিয়া বলিবে ঃ—

"শুন শুন নিত্যানন্দ শুন হরিদাস,
সর্ব্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ।
প্রতি ঘরে ঘরে এই কর গিয়া ভিক্ষা,
কৃষ্ণভজ, কৃষ্ণবল, কর কৃষ্ণশিক্ষা।
ইহা বই আর না বলিবে বলাইবা,
দিবা অবসানে আসি আমারে কহিবা।"
চৈঃ ভাঃ।

"হাসিয়া কহিলা প্রভু ভক্ত সবাকারে,
এই মোর হরিনাম দেহ ঘরে ঘরে।
নবদ্বীপে বাল বৃদ্ধ বৈসে যত জন,
চণ্ডাল দুর্গতি কিবা ব্রাহ্মণ সজ্জন।
সবারে শিখাও হরিনাম গ্রন্থ ধরি,
[illegible] সে সব লোক যাউ ভবতরি।
চৈঃ মঙ্গল।

[illegible] আদেশ শুনিয়া ভক্তমণ্ডলী মহা আনন্দলাভ করিলেন। নিত্যানন্দ হরিদাসও প্রচারক-ব্রত গ্রহণ করিয়া নদীয়ার ঘরে ঘরে হরিনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা উভয়েই উদাসীন সন্ন্যাসী; বাহিরের পরিচ্ছদও তদ্রূপ; সুতরাং তাঁহাদের প্রচারে কিছু কিছু ফলও লাভ হইতে লাগিল। তাঁহাদের ব্যাকুলতা ও সরলতা-পূর্ণ উপদেশে অনেক লোকের মন আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। যে গৃহস্থের বাটীতে যান বা পথে যাহাদের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাদিগকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেনঃ—

"বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে।
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন,
হেন কৃষ্ণ বল ভাই করি এক মন।

যে প্রচারে ক্ষেত্র বৃদ্ধি হইয়া এক সময়ে ভারতের অধিকাংশ স্থান ব্যাপিয়াছিল;

যাহার তেজে কোটি কোটি লোক সাধু-জীবন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া গিয়াছিল, তাহার সূত্রপাত এইরূপে হইল। বঙ্গদেশে এরূপ ধর্ম্ম প্রচার করা তখন নূতন। সুতরাং নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রচার যাত্রা লইয়া নগরে অনেকটা আন্দোলন উঠিয়া পড়িল। যাহারা সুবুদ্ধি ও নিরীহ প্রকৃতির লোক, তাঁহারা এই সাধু অনুষ্ঠান দেখিয়া বৈষ্ণবদিগের সুখ্যাতি করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ চির-প্রথার বিরুদ্ধাচরণে চিরকালই অসহিষ্ণু; তাঁহারা এই অনুষ্ঠান ও অনুষ্ঠাতাদিগের ভূয়সী নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আর যাহারা পাষণ্ডী, তাহাদের তো কথাই নাই; তাহারা ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া বিধিমত উৎপাত করিতে প্রবৃত্ত হ[illegible]

"নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এইরূপ
বল কৃষ্ণ ভজকৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা।
এ বোল বলিয়া দুই জন চলি যায়,
যে হয় সুজন সেই বড় সুখ পায়।
অপরূপ শুনি লোক দুজনার মুখে,
নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে।
'করিব' 'করিব' কেহ বলয়ে সন্তোষে,
কেহ বলে এ দুজন পতিত মন্ত্র দোষে।
যে গুলা চৈতন্য-নৃত্যে না পাইল দ্বার,
তার বাড়ী গেলে মাত্র বলে মার মার।
তোমরা পাগল হৈলে দুষ্ট সঙ্গদোষে,
আমা সবা পাগল করিতে আইস কিসে?
ভব্য সভ্য লোক সব হইল পাগল,
নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল।
কেহ বলে এ দুজন কিবা হয় চোর,
ছল করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘর ঘর।
এমত প্রকট কেন করিবে সুজনে,
আর বার আসে যদি লইব দিয়ানে।
শুনি শুনি নিত্যানন্দ হরিদাস হাসে,
চৈতন্যের আজ্ঞা বলি না পায় তরাসে।"

এ দৃশ্য জগতে নূতন নয়। চিরকালই লোকে ধর্ম্ম প্রচারকের নামে এই পুরস্কার দিয়া আসিতেছে। তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কটূক্তি বর্ষণ ত সামান্য কথা; কাঁটার মুকুট শিরে, জুতার মালা গলায়, প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে নিক্ষেপ, ক্রুশে হত্যা, বাইশ বাজারে প্রহার, আর কত বলিব, এই সকল সুন্দর সুন্দর ব্যবহার ভগবদ্ভক্তের জন্য। অপরাধ এই, তাঁহারা জগতের দুঃখে কাতর হইয়া তাহার উদ্ধারের জন্য ভগবৎ মহিমা প্রচার করেন। এ অতি ভয়ানক অপরাধ বটে; সুখ ভোগাভিলাষ ও ইন্দ্রিয় সেবার মধ্যে হরিনাম! একি সামান্য অপরাধ যে উপেক্ষা করা যায়? সাবাস্ সংসার! তোমার ব্যবহারে বলিহারি যাই! আর তোমরা ভগবৎপ্রিয় সাধুগণ! লোকে হরিনাম গিলিবে না, তোমরা বল কি করিয়া বালককে তিক্ত ঔষধ খাওয়ানের ন্যায় গিলাইয়া দিবে? ধন্য তোমাদের অধ্যবসায় ও ভগবন্নিষ্ঠা। দণ্ড? দণ্ড তো তোমাদের বাঞ্ছনীয়, তোমরা কি দণ্ড ভয়ে ভীত? ঈশ্বরের দণ্ড প্রসাদ বলিয়া যে আদর করে বুক পেতে লও। তা না হলে কি, যে বংশে নির্যাতন করে, তাহাদেরই পরবংশীয়েরা তোমাদের পূজা করে? মনে করিলে হাসিও পায় দুঃখও হয়; তোমাদের সম্বন্ধে জগতের ব্যবহার যেন মনসার স্তুতি।—

"যে মুখে বলেছিলাম চাঁই মুড়ি কাণী,
সেই মুখে বলিতেছি জয় ব্রাহ্মণী।"

জগাই মাধাই।

নিত্যানন্দ ও হরিদাস, পূর্ব্বোক্তরূপে সমস্ত নগরবা হরিনাম প্রচার করিয়া ফেলান

এবং সন্ধ্যার সময় ভক্তগণ-পরিবেষ্টিত শ্রীগৌরাঙ্গের নিকট আসিয়া সমস্ত দিনের বৃত্তান্ত বিবৃত করেন। এক দিন গঙ্গার পথে আসিতে তাঁহাদের নয়নগোচর হইল যে, দুইটা বিকটাকার মাতাল রাজপথে ছুটাছুটী করিতেছে; কখন বা বিকট হাস্য করিয়া পরস্পর কোলাকুলি করিতেছে, কখন উভয়ে কিলাকিলী করিয়া মল্লযুদ্ধ করিতেছে, কখন পথে গড়াগড়ি যাইতেছে আব দূরস্থিত সমবেত লোকদিগকে অশ্লীল শব্দ প্রয়োগ করিয়া গালি দিতেছে এবং থাকিয়া থাকিয়া ক্রোধভরে প্রহার করিতে ধাবিত হইতেছে।

"একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহা দস্যু প্রায় তারা মদ্যপবিশাল।
দুজনাতে পথে পড়ি গড়া গড়ি যায়;
যে যাহারে পায় সেই তাহারে কিলায়।
দূরে থাকি পথে লোক সব দেখে রঙ্গ;
সেই খানে নিত্যানন্দ হরিদাস সঙ্গ।
ক্ষণে দুজনেতে প্রীত ক্ষণে ধরে চুলে;
চকার বকার শব্দ উচ্চ করি বলে।
নদীয়ার বিপ্রের করিব জাতি নাশ;
মদ্যের বিক্ষেপে করে কাহাকে আশ্বাস।
দুজনেতে কিলাকিলী গালা গালি করে;
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি দূরে।"

নিত্যানন্দ মহা কারুণিক; দুই জনার এই রূপে দুরবস্থা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্ত পথিকদিগকে তাহাদেব পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আগন্তুকের মধ্যে কেহ বলিল, মহাশয়! ইহারা অতি উচ্চ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; বংশ মর্য্যাদায় ইহারা নবদ্বীপ মধ্যে অতি গণ্য মান্য; কিন্তু বাল্যকাল হইতে মদ্যপের সঙ্গে সঙ্গ করিয়া দেখুন ইহাদের কি দুর্দ্দশা হইয়াছে; ইহারা না করিয়াছে এমন পাপই নাই; মদ্যপান, গোমাংসভক্ষণ, চুরি, ডাকাতি, পরস্ত্রীহরণ, লোকের ঘর পোড়াইয়া দেওয়া প্রভৃতি পাপ ইহাদের অঙ্গের আভরণ, আর নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা, প্রভৃতিরও অন্ত নাই। ইহাদের আত্মীয় স্বজন ইহাদিগকে সংশোধন করিতে না পারিয়া পরিত্যাগ করিয়াছে; এখন ইহারা এই রূপ করিয়া বেড়ায়। সমস্ত নবদ্বীপ ইহাদেব ভয়ে সশঙ্কিত, কখন কাহার কোন্ সর্ব্বনাশ করে; ইহাদের ভয়ে লোকের গঙ্গাপথে আসাই দুষ্কর; স্ত্রীলোকদের তো মোটেই আসিবার যো নাই।

নিতাই প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা রাজা তো আছেন; ইহাদের কেন রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সংশোধন করা হয় না?

আগন্তুক।—আর মহাশয় রাজদণ্ড! রাজদূত ধরিতে পারিলে তো; জগাই মাধাইকে ধরে, দিয়ানে এমন লোক নাই।

নিতাই।—'বলুন দেখি, ইহাদের চরিত্রে কোন গুণ ভাগ আছে কিনা? আমার বিবেচনায় মনুষ্য-চরিত্র এরূপ কলঙ্কিত হইতে পারে না যে, একবারে গুণ শূন্য হয।'

আগন্তুক।—'সাধুর যেমন মন, তেমনি কথা। আপনার মনের ভাবানুসারে আপনি বলিতেছেন; কিন্তু কৈ! জগাই মাধাইয়ের তো কোন গুণ দেখিতে পাই না। একটু চিন্তা করিয়া আগন্তুক কহিলেন, "বসুন মহাশয়! হাঁ আপনি ঠিক্ বলেছেন; ইহাদের একটা গুণ আছে তাহা বলা উচিত; ইহারা নিন্দা-পাপ-বর্জ্জিত। পরনিন্দা মহাপাপ; ইহারা পরনিন্দা করিতেছে,এমন কেহ কখনও শুনিতে পায় নাই।

সম্মুখে দেখিলে যাহা বলুক, কিন্তু পরোক্ষে কাহারও নিন্দা করে না।

নিতাই।—"তবে দেখুন দেখি আপনি বলিতেছিলেন, ইহাদের কোন গুণ নাই।" এই বলিয়া মহাপ্রেমিক শ্রীনিত্যানন্দ জগাই মাধাইয়ের উদ্ধারের জন্য চিন্তিত হইলেন। তিনি মনে করিতে লাগিলেন যে, ইহাদের কি নিস্তারের কোন উপায় নাই? শ্রীগৌরাঙ্গ তো প্রেম ভক্তি প্রচার করিয়া পাপী উদ্ধার করিবেন বলিয়া কৃত-সংকল্প। এ দুই জনকে কি তাঁহার কৃপা হইবে না? যদি না হয় তবে এমন পাপীই বা আর তিনি কোথা পাইবেন, যাহাতে প্রেমের মহিমা পরীক্ষা হইতে পারে? আচ্ছা; আমি আজ প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এই দুই পাপীকে ভাল করিবই করিব। এখন যেমন ইহাদের দেখিয়া লোকে ঘৃণা করিতেছে, এই রূপ ইহাদের দর্শনে যদি পুণ্য মনে না করে, তবে বৃথা আমার সন্ন্যাস আর বৃথা গৌরের ভক্তি প্রকাশ। আমার মনে আশা হইতেছে যে, এমন দিন আসিবে যখন এই দুই মাতাল এখন যেমন মদ্য পানে মাতলামি করিতেছে, তখন তেমনি শ্রীহরির প্রেমে মাতোয়ারা হইবে:—

"শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য হৃদয়;
দুয়ের উদ্ধার চিত্তে হইয়া সদয়।
পাতকী তারিতে প্রভু কৈল অবতার;
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর।
লুকাইয়া করে প্রভু আপন প্রকাশ;
প্রভাব না দেখি লোকে করে উপহাস।
এ দুয়ের প্রভু যদি অনুগ্রহ করে;
তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে।
তবে হঁউ নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস;
এ দুইয়ের করি যদি চৈতন্য প্রকাশ।
এখন যেমন ও আপনা না জানে;
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে।
মোর প্রভু বলি যদি কাঁদে দুইজন;
তবে সে সার্থক হয় মোর পর্যাটন।
যে জন এ দুয়ের ছায়া পরশিয়া;
বস্ত্রের সহিত গঙ্গা স্নান করে গিয়া।
সেই সব জন যদি এ দোঁহারে দেখি;
গঙ্গা স্নান হেন মনে তবে মোরে লিখি।"

এই রূপ চিন্তা করিয়া নিতাই হরিদাসের মন-পরীক্ষার্থ কহিলেন "হরিদাস, দেখ দেখ এ দুইজন লোকের কি দুর্গতি! আহা! পর কালে ইহাদের কি দশা হইবে চিন্তা করিতেও আমার মন ব্যাকুল হইতেছে। তুমি মহা প্রেমিক! যবনগণ তোমার প্রাণান্ত করিতেছিল, অথচ তুমি তখন তাহাদের শুভ কামনা করিয়া প্রার্থনা করিয়াছিলে। এ দুই জনের প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইহাদের শুভানুসন্ধান কর, তাহা হইলে ইহাদের ভাল হইতে পারে। বিশেষতঃ প্রভু তোমার কথা অন্যথা করেন না; তুমি ইহাদের নিস্তারের জন্য প্রার্থনা করিলে অবশ্যই ইহারা উদ্ধার হইবে।

হরিদাস নিত্যানন্দের মনের অভিপ্রায় বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করতঃ কহিলেন "শ্রীপাদ গোঁসাই! আপনি যখন উহাদের উদ্ধার কামনা করিয়াছেন, তখন আর তাহাদের পরিত্রাণের বাকী কি? আপনার ইচ্ছা ও প্রভুর ইচ্ছায় কি ভেদ আছে? আমাকে আর কেন বিড়ম্বনা করিতেছেন? নিতাই হরিদাসকে সপ্রেম আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "ওহে হরিদাস! তবে এক কর্ম্ম করা যাক্; আমাদের প্রতি আদেশ আছে,ন

আচণ্ডালে কৃষ্ণনাম প্রচার করিতে। চল এই দুই জনের নিকট প্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিগে।"

"প্রভুর যে আজ্ঞা লয়ে আমরা বেড়াই,
তাহা দিই এই দুই মদ্যপের ঠাঁই।
সবারে ভজিতে কৃষ্ণ প্রভুর নির্দ্দেশ,
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ।
বলিবার ভার মাত্র আমরা দুইর,
বলিলে না লয় তবে জানে সেই বীর।"

এই পরামর্শ স্থির করিয়া নিত্যানন্দ ও হরিদাস জগাই মাধাইয়ের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন। দর্শকদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদিগের ঈদৃশ দুঃসাহস দৃষ্টে নিষেধ করিতে লাগিল "মহাশয়, সাবধান, কদাচ ঐ দুটা মাতালের নিকট যাইবেন না। উহাদের নিকট গেলে প্রাণ সংশয়! উহারা কি সন্ন্যাসীর মান্য, না ধর্ম্ম প্রচার বুঝিবে? কত ব্রহ্মবধে গোবধে যাহাদের চৈতন্য নাই, তাহারা কি তোমাদের খাতির করিবে? ধর্ম্মবীর দুই জন এই কথায় কর্ণপাত না করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন ও যেখানে জগাই মাধাই ভূলুণ্ঠিত রহিয়াছে, সেইখানে যাইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেনঃ—

"বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম,
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ।
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার,
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড় অনাচার।"

এই উপদেশ বাক্য শুনিয়া পাপী দুই জন 'ধর তো বেটাদের' বলিয়া লম্ফ দিয়া উপদেষ্টাদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের রুদ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ও ভীম রব শুনিয়া উভয়ে, অনন্যগতি হইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে লাগিলেন; পার্শ্বস্থ দর্শকবৃন্দ হায় হায় করিয়া বলিতে লাগিল "আহা বিদেশী সন্ন্যাসী দুইটী প্রাণে মারা যায় দেখিতেছি।" কেহ কেহ বলিতে লাগিল, "সাবধান বাক্য না শুনিলে এমনি দুর্দ্দশা হয়। ধর্ম্ম প্রচারের আর জায়গা ছিল না যে, ঘোরতর দৈত্য দুইটার নিকট গেলেন।" পাষণ্ডীগণ হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল "খুব হইয়াছে; এমনি করে ভণ্ড বেটাদের প্রাণ যায় তো আপদ যায়।" নিত্যানন্দ ও হরিদাস তাড়িত হইয়া পলাইতে পলাইতে কৌতুক আরম্ভ করিয়া দিলেন। মাতাল দুইটা পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে বটে; কিন্তু নেশার ঝোঁকে পদস্খলিত হওয়ায় প্রচারকদিগকে ধরিতে পারিতেছে না।

"দুই দস্যু ধায় দুই ঠাকুর পলায়,
ধরিমু ধরিমু বলি নাগিল না পায়।"

নিত্যানন্দ দৌড়িতে দৌড়িতে হরিদাসের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করত হাসিয়া বলিলেন,—"ভাল বেটাদের বৈষ্ণব করিতে গিয়াছিলাম; আজ যদি ইহাদের হাত এড়াইয়া যেতে পারি, তবেই মঙ্গল।"

"নিত্যানন্দ বলে ভাল হইল বৈষ্ণব,
আজ যদি প্রাণ রহে তবে পাই সব।"

হরিদাস ততোধিক রহস্য ব্যঞ্জকস্বরে উত্তর করিলেন, "আর যাও, তোমার বুদ্ধিতেই তো আজ অপমৃত্যুতে প্রাণ গেল। যেমন মাতালের কাছে কৃষ্ণ নাম উপদেশ দিতে গিয়াছিলাম, তেমনি শাস্তি হইল। আমারই দুর্বুদ্ধি যে জেনে শুনে চঞ্চল লোকের সঙ্গে এসেছিলাম।"

"হরিদাস বলে যাও আর কেন বল,
তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যে প্রাণ গেল

ছবি।

১

কি চিত্র এঁকেছ তুমি ধন্য চিত্রকর!
কত ভাব, কত ভাষা, কত স্নেহ ভালবাসা
মথিয়া তুলিলে তুমি এরূপ সুন্দর!
প্রতি রেখা প্রতি টানে, ভাসা'য়ে বাহিবে আনে,
কি সুখ উহার প্রাণে খেলে নিরন্তর!
ওরি বুকে মেখে তুলি, দিয়েছিলে টান গুলি?
নহে কি অমন ছবি ওঠে মনোহর!
জানি না এমন ভাষা, অই ভঙ্গি—অই হাসা,
চম্পক আঙ্গুলে টিপে পদ্ম-পযোধর,
কোলে নিয়ে শিশু ছেলে, দেয় তার মুখে ঠেলে!
খাইয়া কমল-সুধা হাসে শশধর!
জানি না এমন ভাষা লিখিতে সুন্দর!

২

পশ্চিমে কোমল রবি হেসে অস্ত যায়,
লাবণ্য সোণার থালা, প্রেমের পুণ্যের ডালা,
ডুবিল জীবনে কার সোণালী সন্ধ্যায়!
সে রূপ সে জ্যোতিকণা, কারো মুখে দেখিতনা,
ভুলেছে জগত তারে হায় হায় হায়!
না, না, না, ও সোণামেঘে, সে হাসি রয়েছে লেগে,
অই যে কোমল নীল আকাশের গায়!
মেঘ কি ভুলিতে পারে, এত প্রেম একেবারে,
জড়িত জীবনে যাহা কণায় কণায়?
যদিও ডুবেছে রবি, প্রেমের পবিত্র ছবি,
নিষ্ঠুর জগত যদি ভুলেছে তাহায়,
এত প্রেম একেবারে, সেতনা ভুলিতে পারে,
অই যে সে বুকভরা হাসি দেখা যায়!
মরিলেও হাসে প্রেম সোণালী সন্ধ্যায়!

৩

সোণাসন্ধ্যা সোণামেঘে সুনীল আকাশে,
শরতের সোণাশশী চুপি দিয়া হাসে!
ক্ষুদ্র এ কুটীর দ্বারে ক্ষুদ্র আঙ্গিনায়,
সোণার সমুদ্র দেখে উছলিয়া যায়!
সোণার যৌবনে ফোটা সোণার কমল,
কোলে সে সোণার শিশু হাসে খল খল,
সোণামুখে চুম্বে শিশু এক পয়োধর,
সোণাহাতে চুচুকাগ্র খুঁটিছে অপর!
দেখিয়া সোণার শশী ভাবিছে আকাশে,
কতই আনন্দে যেন আশা অভিলাষে!
কত পুণ্য কত ধর্ম্ম কত তপস্যায়,
ও সুমেরু শিরে শিশুশশী হওয়া যায়?
কত পুণ্য কত ধর্ম্ম কত তপস্যায়,
অমন সোণার পদ্মে মধু খাওয়া যায়?

৪

বেলি যুই ফোটে নাই কুটীরের পাশে,
কেবল সোণার হাসি ঝিঙ্গা ফুল হাসে!
ছায়াময় ঝোপঝাপে ঘিরি দিকে তার,
ফুটেছে সোণার কণা জোনাকীর ঝাঁর!
মাঝে তার ফুটে আছে সোণার কমল,
কোলে সে সোণার শিশু হাসে খল খল!
নিরজন নিরিবিলি নীরব সে ঠাঁই,
দেখিতে সোণার শোভা আর কেহ নাই!
বিফলে বহিয়া যায় সোণার জোয়ার,
কে দেখিবে? ঘরে নাই সোণাবন্ধু তার!

৫

পূরবে ছ'পেয়ে পথ আমতল দিয়া,
বাগানের অন্ধকারে রয়েছে ঢাকিয়া।
এই পথে ধীরে ধীরে আসিছে পথিক,
মাথার উপরে তারি ডাকিতেছে পিক,

"উহু! উহু! কি কঠিন পুরুষের প্রাণ,
গেলে না আসিতে জানে কেমন পাষাণ!"
উপর আকাশে এক পাখী যায় গেয়ে,
"চোক গেল' পথিকের পথ চেয়ে চেয়ে!"
দয়েল বলিছে ঠারে শিশ্‌ দিয়া তায়,
"কিছুই ব'লনা, শেষে পলা'বে লজ্জায়।"
শশধর হেসে বলে "সাধ্য আছে কার,
দেখিলে এ রূপ রাশি যাইবে আবার?"

৫

পথিক আসিতে চায় চলেনা চরণ,
কি যেন আনন্দে তার ভুলে গেছে মন!
পথিক আসিতে চায় পথ নাহি পায়,
নয়ন ভুলিয়ে যেন রয়েছে কোথায়!
কোথা গেছে চোখ তার কোথা গেছে মন,
কে কোথা ইন্দ্রিয়গণ করেছে গমন!
কুড়া'যে আনিতে যেন নাহি পারে আর,
জীবনে হয়েছে হেন মৃতের আকার!
নির্ব্বাক নিস্পন্দ স্তব্ধ স্থির অবিচল,
দাঁড়া'য়ে একটী যেন পাষাণ পুত্তল!

৬

আবার মাথার পরে আমের পল্লব,
নাড়িল একটী পাখী করি কলরব!
গাইল একটী মেয়ে দূরে তার সনে,—
"আম গাছে বৈয়া লো,
সোণা পক্ষী ডাকিল!"—
শুনিল একটী চন্দ্র, থাকিয়া গগনে!
একটী রমণী ভুলে,
চাহিল নয়ন তুলে,
একটী নিশ্বাস দীর্ঘ, পড়িল কেমনে!
বুঝি না পাখীর ভাষা,
বুঝি না নারীর আশা,
কি বুলিল কি বুঝিল, তারা দুই জনে!
সামান্য বালিকা মেয়ে,
সেও যে বুঝিল গেয়ে!
পুরুষ এত কি বোকা? হাসিল গগনে,
বেড়িয়া একটী চন্দ্র তারা শত জনে!

৭

ফিরে না নারীর আর নয়ন যুগল,
পড়ে না আঁখির পাতা স্থির অবিচল!
প্রেমের অনন্ত সিন্ধু, সে নয়নে এক বিন্দু,
গড়ায়ে পড়িল যেন শিশিরের জল!
পড়িল সুন্দর বুকে, শিশুর সুন্দর মুখে,
একত্রে ভিজিল দুই শশী শতদল!
অশ্রুসিক্ত স্তনভার, শিশু না চুম্বিল আর,
রহিল মায়ের মুখ চাহিয়া কেবল!
আবার পড়িল বিন্দু, দুইটী বদন ইন্দু
হাসিল, ভাসিল দুই শিশু হিমাচল
যমুনা জাহ্নবী স্রোতে—পবিত্র নির্ম্মল

৮

ফিরেনা নারীর তবু নয়ন যুগল,
চেয়ে আছে অনিমিষে, আঁধার পথের দিকে,
জাগ্রত স্বপনে নাকি এত কুতূহল?
এত আশা জাগে মনে, এত আশঙ্কার সনে,
জ্বলিছে নিবিছে যেন জোনাকীর দল!
ছায়ায় আঁকিছে মুখ, ছায়ায় আঁকিছে বুক,
ছায়ায় আঁকিছে তার শরীর সকল!
কিন্তু সে পাষাণময়, প্রাণ কি ছায়ায় হয়?
ছায়ায় মিশিছে ছায়া—যতন বিফল!
জাগ্রত স্বপনে নাকি এত কুতূহল?

৯

এই দৃশ্য—মহাশোভা—মহা মহোৎসব,
তিনটী বছরে আজ প্রাণে অনুভব!
প্রকৃতি দেখেনি আর যুগান্তে কখন,
এত দূরে এত গাঢ় দৃঢ় আলিঙ্গন!

ভেঙ্গে যায় বুক যেন ভেঙ্গে যায় হাড়,
রেণু রেণু হ'য়ে যায় প্রাণ দু'জনার!
চুম্বিতে দোঁহারে দোঁহে করিতেছে পান,
কি আকাঙ্ক্ষা অগ্নিময় শিখা লেলিহান্!

দেখিতে দোঁহারে দোঁহে করে ভস্মময়,
কি ভস্মলোচন প্রেম—কাম ভস্ম হয়!
ধন্য চিত্রকর, তুমি কি এঁকেছ ছবি,
কল্পনা করিতে এত নাহি জানে কবি!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

বঙ্গে সংস্কৃত চর্চ্চা।

(দশম প্রস্তাব।)

শূলপাণি ভট্টাচার্য্য—নবদ্বীপের সেন-বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা লক্ষ্মণসেন দেবের সভাসদ বলিয়া পণ্ডিতকুলতিলক ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বে শূলপাণির মত প্রামাণিক বলিয়া নানা স্থানে গ্রহণ করিযাছেন। শূলপাণির রচিত স্মৃতিগ্রন্থাবলীর সাধারণ নাম স্মৃতিবিবেক। তিনি প্রায়শ্চিত্তবিবেক, ব্রতকাল বিবেক, দুর্গোৎসববিবেক, দত্তকনির্ণয়, যাজ্ঞবল্ক্যদীপকলিকা রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের স্মৃতিগ্রন্থের টীকা মাত্র। পণ্ডিতপ্রবর ভরতচন্দ্র শিরোমণি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত দত্তক শিরোমণি গ্রন্থে শূলপাণির দত্তকনির্ণয় মুদ্রিত হইয়াছে।

অনিরুদ্ধ ভট্ট—১৫৩৩ শকাব্দের লিখিত এক খানি শুদ্ধিবিবেক বর্ত্তমান আছে। ইঁহার প্রণীত হারলতা নামক স্মৃতিগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

নারায়ণ শর্ম্মা—দায়ভাগের মতানুসারে দায়াদিনিরূপণ সম্বন্ধে ব্যবস্থাসার সংগ্রহ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্নের নিকট ১৭২০ শকের লিখিত একখানি পুস্তক বিদ্যমান আছে। এই নারায়ণই বোধ হয় মনুসংহিতার একখানি টীকা রচনা করেন। * নারায়ণ চক্রবর্ত্তী গ্রহাদির দোষশান্তি বিষয়ে শান্তিকতত্ত্বামৃত রচনা করেন।

নত্বা গোপীকান্তং মত্বাবিবিধমুনিবাক্যানি।
শ্রীনারায়ণ শর্ম্মা শান্তিকতত্ত্বামৃতং তনুতে॥

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য।—ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় ও পঞ্চম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে, স্মার্ত্তচূড়ামণি রঘুনন্দন মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাব সময়ে খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে নবদ্বীপে প্রাদুর্ভূত হইয়া বঙ্গের সর্ব্বত্র সমাদৃত অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব প্রণয়ন করেন। রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব পূর্ব্বতন স্মার্ত্তাচর্য্যগণের গ্রন্থ অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়া তাঁহাদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা বিলুপ্ত করিয়া, বঙ্গদেশে স্বকীয় অপ্রতিহত

*নারায়ণ আচার্য্য জাত ব্যক্তির শুভাশুভ নির্ণয় সম্বন্ধে চমৎকারচিন্তামণি নামে পদ্যময় গ্রন্থ রচনা করেন। মালবদেশীয় ধর্ম্মেশ্বর দৈবজ্ঞ প্রণীত অন্বয়ার্থ প্রবোধ প্রদীপ্ত নামে ইহার এক খানি টীকা আছে।

প্রাধান্য সংস্থাপিত করিয়াছে। বঙ্গদেশে এমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নাই, যাঁহার গৃহে রঘুনন্দনের দুই চারি খানি স্মৃতিতত্ত্ব অনুসন্ধান করিলে না পাওয়া যাইবে। রঘুনন্দনের পরবর্ত্তী স্মার্ত্ত আচার্য্যগণ তাঁহার মত অনুসরণ ও তদ্রচিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রঘুনন্দন বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যের পুত্র বলিয়া স্বকীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি মলমাসতত্ত্বের প্রারম্ভে কি কি স্মৃতিতত্ত্ব লিখিবেন, তাহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মলমাস (মলিম্লুচ) দায়ভাগ, সংস্কার, শুদ্ধি, প্রায়শ্চিত্ত, উদ্বাহ, তিথি, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, ব্যবহার, একাদশী, জলাশয়োৎসর্গ, ঋগ্বেদীয়—সামবেদীয় ও যজুর্ব্বেদীয় বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ, ব্রত, দেবপ্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা, জ্যোতিষ, বাস্তুযাগ, দীক্ষা, আহ্নিক, কৃত্য, শূদ্রকৃত্য, মঠপ্রতিষ্ঠা, শ্রীপুরুষোত্তম, সামবেদী ও যজুর্ব্বেদী শ্রাদ্ধ—তত্ত্ব, সমুদয়ে এই অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব।*

রঘুনন্দন অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্ব ভিন্ন সঙ্কল্পচন্দ্রিকা, রাসযাত্রাপদ্ধতি, ত্রিপুষ্করশান্তিতত্ত্ব, ও দ্বাদশযাত্রাপ্রমাণতত্ত্ব নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্মৃতিপুস্তিকা রচনা করেন। পণ্ডিতবর ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় রঘুনন্দনকে চৈতন্য বোধ হয় রঘুনন্দনের পিতৃদেব হরিহরই সময়প্রদীপ নামে স্মৃতিগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের বহুমানাস্পদ খ্রীষ্টীয় মিসনরিগণ রঘুনন্দনের অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব দুই খণ্ডে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। এই মিসনরী মহোদয়গণের নিকট বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই উভয় ভাষাই যে ভারতবর্ষীয় অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার ন্যায় চির ঋণী, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। তাহাদের পরিশ্রম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়কে শত শত ধন্যবাদ! অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব কলিকাতায় তৎপরে পুনরায় মুদ্রিত হয়। বটতলার সুবিখ্যাত বেণীমাধব দে মহাশয় বঙ্গাক্ষরে ইহার এক ভিন্ন সংস্করণ বাহির করেন।—কাশীরাম বাচস্পতি ভট্টাচার্য্য ও শান্তিপুরের বিখ্যাত পণ্ডিত রাধামোহন গোস্বামী অষ্টাবিংশতিতত্ত্বের দুই খানি টীকা প্রণয়ন করেন।

কাশীরাম বাচস্পতি আপনাকে সর্ব্বশাস্ত্রনিপুণ রামকৃষ্ণের পৌত্র ও সঙ্গীতচূড়ামণি রাধাবল্লভের পুত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যং প্রাসূত সমস্তশাস্ত্রনিপুণঃ শ্রীরামকৃষ্ণাত্মজঃ
শ্রীরাধোত্তরবল্লভাখ্যসুকৃতী সঙ্গীতচূড়ামণিঃ।
তেন শ্রীকাশিরাম কৃতিনা যত্নেন নিষ্পাদিতা
টীকা নাতিসুশৃঙ্খলাপি কৃতিভিঃ সানুগ্রহৈর্দৃশ্যতাম্॥
স্মৃতিশাস্ত্রাম্বুধৌ লীলাকৃতসেতুং জগদ্গুরুং।
বিদিতং ত্রিষু লোকেষু নমামি রঘুনন্দনং॥

রাধামোহন গোস্বামী— নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, শিবচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্রের রাজত্বকালে তাঁহাদের সভাসদরূপে শান্তিদেবের অব্যবহিত পরসাময়িক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

---

* টীকাকার কাশীরাম বাচস্পতি মলমাসতত্ত্বের টীকায় লিখিয়াছেন যে, নব্য ও প্রাচীন স্মৃতিকারগণের পরস্পর বিরোধভঞ্জন পূর্ব্বক তথ্য নির্ণয় করাই রঘুনন্দনের উদ্দেশ্য ছিল।

"মীমাংসাদি নানা শাস্ত্রপারদৃশ্বা শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যঃ প্রাচীন বিচক্ষণগণ নানাবিধ ব্যাখ্যাজনিত সন্দেহস্য স্মৃতিশাস্ত্রস্য মুন্যন্তরবচন যুক্তিভ্যাং তত্ত্বং নির্ণীয় ইদানীন্তন সুখবোধায় নিবন্ধাংশ্চকার।"

পুরে অবস্থান করিতেছিলেন বলিয়া পঞ্চম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি পরম বৈষ্ণব ও প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি অষ্টাবিংশতি স্মৃতিতত্ত্বের টীকা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বামৃত, কৃষ্ণভক্তিরসোদয়, ভাগবততত্ত্বসার, ও তত্ত্বসংগ্রহ রচনা করেন। রাধামোহন চৈতন্যদেবের প্রিয়তম শিষ্য ও সহচর অদ্বৈতাচার্য্যের বংশধর বলিয়া স্বীয় পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বৈতবংশেন রাধামোহন শর্ম্মণা।
প্রণম্য রাধিকাকান্তং ক্রিয়তে তত্ত্বসংগ্রহং॥

হরিনারায়ণ শর্ম্মা—৩৬০ শ্লোকে শুদ্ধিতত্ত্ব-কারিকা রচনা করেন। ইহাতে রঘুনন্দনের শুদ্ধিতত্ত্বের জন্মমরণাশৌচবিধি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ১৭৬৭ শকে লিখিত এক খানি পুস্তক পাওয়া গিয়াছে।

রঘুনন্দন আচার্য্যচূড়ামণি—কলাপতত্ত্বার্ণব নামে সুপ্রসিদ্ধ কলাপ (কাতন্ত্র) ব্যাকরণের কৃদন্তপ্রক্রিয়ার টীকা রচনা করেন।

নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপণ্ডিতগণ মহারাজার আদেশানুসারে কৃত্যরাজ নামক শ্রৌত ও স্মার্ত্তবিধি বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র রাজা শিবচন্দ্র ২৬০ শ্লোকে দেবীস্তুতি রচনা করিয়া স্বীয় ধর্ম্মানুরাগ ও বিদ্যাবত্তার নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন।

লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ নবদ্বীপের রাজা গিরীশচন্দ্রের সভায় রাজপণ্ডিত ছিলেন। তিনি ৭৮ শ্লোকে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা বিষয়ে 'রথপদ্ধতি' নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

রঘুনাথ সার্ব্বভৌম—নদীয়াজেলার অন্তর্গত উলাগ্রামবাসী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। গ্রন্থকার বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী শাণ্ডিল্য গোত্রজ কুলীন ব্রাহ্মণ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব, স্বত্বব্যবস্থার্ণবসেতুবন্ধ, সিদ্ধান্তার্ণব ও সৎকৃত্যমুক্তাবলী নামে চারি খানি গ্রন্থ রচনা করেন। স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব নামে স্মৃতিগ্রন্থ ১৫১৩ শকাব্দে রাজা রাঘবের আদেশে বিরচিত হয়। স্বত্বব্যবস্থার্ণব দায়াধিকার সম্বন্ধে ছয় পরিচ্ছেদে বিরচিত। বেদান্তবিষয়ক সিদ্ধার্ণব বেদান্তসূত্রের শঙ্করাচার্য্যপ্রণীত ভাষ্য অবলম্বনে বিরচিত হয়। রাজা কামদেবের আদেশক্রমে জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক গদ্যপদ্যময় সুবিস্তীর্ণ সৎকৃত্যমুক্তাবলী প্রণীত হয়। স্মার্ত্তব্যবস্থার্ণব রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্ব অবলম্বনেই বিরচিত হইয়াছে। এই গ্রন্থে—

তিথিসংক্রান্ত্যশৌচেষু দ্রব্যশুদ্ধধিকারিণোঃ।
প্রায়শ্চিত্তোদ্বাহদায়েষ্বপি বাচ্যোঽত্র নির্ণয়ঃ।
শাকেঽগ্নিমঙ্গলহরাস্যকলানিধানে
শ্রীরাঘবাবনিপতের্বুধবৎসরস্য।
প্রীত্যর্থেমাশুরচিতোঽর্ণব এষ দায়—
ভাগব্যবস্থিতি ময়োঽষ্টম উত্তরার্দ্ধঃ॥
ইতি সকলহিতার্থং বন্দ্যবংশাবতংসঃ
কৃতবসতিরমুষ্মিন্ বিশ্রুতোলাসমাজে।
সকল মুনিমতে যং নির্ম্মমে সার্ব্বভৌমঃ
স খলু রুচির বন্ধো গ্রন্থরাজঃ সমাপ্তঃ॥

রঘুনাথভট্ট—গদ্যপদ্যময় আহ্নিকপদ্ধতি ও কালতত্ত্ববিবেচন নামে স্মৃতিগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থকারের পিতার নাম মাধবভট্ট উপাধ্যায়, মাতার নাম ললিতা। নারায়ণ নামে তাঁহার এক পিতৃব্য ও বিশ্বেশ্বর নামে তাঁহার এক ভ্রাতা ছিল। উপাধিদৃষ্টে তাঁহাকে মিথিলাবাসী বলিয়া অনুমান হয়।

পিতরং মাধবমম্বাং ললিতাং নারায়ণং পিতৃব্যাঞ্চ।
সহজমথ বিশ্বনাথং গণপতি মাশারদাং নত্বা।

রামকৃষ্ণ সীতয়োপেতং রঘুনাথেন রচ্যতে।
সম্রাটস্থপতিনা সম্যক্ কালতত্ত্ববিবেচনং॥ *

রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী।—শ্রীধর যে শ্রুতিস্মৃতি রচনা করে, শঙ্করাচার্য্য তাঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী শঙ্করাচার্য্য প্রণীত শ্রুতিস্তুতিভাষ্যের টীকাকার। অমরকোষের সুবিস্তীর্ণ উৎকৃষ্ট টীকা ত্রিকাণ্ডচিন্তামণি এই রঘুনাথ কর্ত্তৃক বিরচিত হয় কি না, বলিতে পারি না। নারায়ণ প্রণীত খণ্ডপ্রশস্তিকাব্যের টীকাকার এক রঘুনাথ। এই কাব্যে বিষ্ণুর মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বৌদ্ধ ও কল্কী এই দশাবতারের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

কাশীনাথ ভট্ট—জয়রাম ভট্টের ঔরসে বারাণসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কবিচন্দ্রাচার্য্যপ্রণীত কবিচন্দ্রোদয় নামে কোষ কাব্যের পদার্থাদর্শ নাম্নী টীকা রচনা করেন।

কবিচন্দ্রোদয়ে কাব্যে গুরূণামুপদেশতঃ।
পদার্থাদর্শ টীকেয়ং কাশীনাথেন তন্যতে॥

কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য—১২০৭ শ্লোকে চারি পরিচ্ছেদে মন্ত্রপ্রদীপ নামে তন্ত্র রচনা করেন। লগ্নচন্দ্রিকা ও সংবৎসরপ্রকরণ নামে জ্যোতিষ গ্রন্থদ্বয় আর এক কাশীনাথ জ্যোতির্ব্বিৎ প্রণীত, ইদ্বিলপুরবাসী কাশীনাথ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন। নবদ্বীপের উক্ত সুপ্রসিদ্ধ মহারাজের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারই উৎসাহে গ্রন্থকার ১৭৩৭ শকে গদ্য পদ্যময় তারাভক্তি তরঙ্গিণী রচনা করেন। এই গ্রন্থ ছয় তরঙ্গে বিভক্ত। ইহার প্রথম তরঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বংশাবলী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

তাং নত্বা বসতা মুদেদিলপুরং সজ্জন্মনা তারিণীং।
কাশীনাথ-ধরামরেণ কবিনা সন্ত্রস্তনিবারিণীং॥
তারাভক্তিতরঙ্গিণী বিরচিতা ধীমন্মনোহারিণী
তস্যাং ষষ্ঠতরঙ্গপূর্ণমভবৎ কীনাশভীহারিণীং॥
সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থো মুনি-গিরিশনেত্রাম্বুধিরসা
প্রমাণেহস্মিন্নব্দে গতবতি সমাপ্তিং নরপতেঃ।

* * * * *

দুর্গাদাস বিদ্যাবাচস্পতি—বোপদেবের সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধের টীকাকার দুর্গাদাস গুরুপাদুকাস্তোত্রের টীক রচনা করেন। কবিকল্পদ্রুম নামক বোপদেবকৃত ধাতুপাঠের ধাতুদীপিকা নাম্নী ব্যাখ্যাও এই দুর্গাদাস বিরচিত।

---

*স্মৃতিরত্ন ও ত্রিংশৎশ্লোকবিবরণ নামে গ্রন্থদ্বয় এক রঘুনাথ ভট্ট প্রণীত। ১৬৯৯ শকে স্মৃতিরত্ন, বিরচিত হয়। শেষোক্ত স্মৃতিগ্রন্থে জন্মমরণাদি জনিত অশৌচাদি বিনির্ণীত হইয়াছে। গ্রন্থকারের উপাধি বাজপেয়যাজী। শম্ভুভট্ট 'ত্রিংশৎশ্লোক সারোদ্ধার' নামে ইহার টীকা রচনা করেন।

রঘুনাথকৃত-ত্রিংশচ্ছ্লোক ব্যাখ্যানুসারতঃ।
শম্ভুরাশৌচবিষয়ং লিখত্যনতিবিস্তরং॥

কৃষ্ণভট্ট তনয় রঘুনাথ যাজ্ঞিক বৈদিক দ্বাদশাহযাগের অঙ্গীভূত অচ্ছাবাক্ প্রয়োগ নামে প্রাতঃস্মরণাদির অনুষ্ঠানবিধি বর্ত্তমান আছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশশতাব্দীর শেষভাগে চৈতন্যদেবের প্রাদুর্ভাব সময়ে বৈষ্ণবাচার্য্য রঘুনাথ ভট্ট ত্রয়োবিংশতি সর্গে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা বিষয়ে গোবিন্দলীলামৃত রচনা করেন।

গোবিন্দলীলামৃতে ৩৮৮টী অনুষ্টুভ শ্লোক পরিমাণ শ্লোক বিদ্যমান আছে।

কাব্যে শ্রীরঘুনাথ ভট্টবরজে গোবিন্দলীলামৃতে।
সর্গোহয়ং রজনীবিলাসবলিতঃ পূর্ণস্ত্রয়োবিংশতিঃ॥

কার্ত্তিকেয় সিদ্ধান্ত প্রণীত একখানি মুগ্ধবোধের টীকা আছে।

কাশীশ্বর ভট্টাচার্য্য মুগ্ধবোধটিপ্পনী নামে টিকা এবং মুগ্ধবোধের পরিশিষ্ট রচনা করেন। নন্দকিশোর প্রণীত মুগ্ধবোধের পরিশিষ্টও বিদ্যমান আছে।

কুমারহট্টনিবাসী শিবপ্রসাদ তর্কপঞ্চাননের পুত্র গঙ্গাধর 'সেতু সংগ্রহ' নামে মুগ্ধবোধের ব্যাখ্যা রচনা করেন।

গঙ্গাধরঃ শিবং নত্বা কুরুতে সেতুসংগ্রহং।
দুর্গম্যমুগ্ধবোধাখ্যসরিৎসন্তরণার্থিনাং ॥

পূর্ব্বোক্ত টীকাকার চতুষ্টয় ভিন্ন রাম তর্কবাগীশ, রামানন্দ, মধুসূদন, দেবীদাস, রামভদ্র, বল্লভাচার্য্য, রামপ্রসাদ তর্কবাগীশ, দয়ারাম বাচস্পতি, রতিকান্ত তর্কবাগীশ, ভোলানাথ মিশ্র, ও গোবিন্দরাম মুগ্ধবোধের টীকা প্রণয়ন করেন।*

শ্রীপতি দত্ত—সর্ব্ববর্ম্মাচার্য্য কাতন্ত্র নামে যে সুপ্রসিদ্ধ কলাপ ব্যাকরণ রচনা করেন, দুর্গসিংহ তাহার কাতন্ত্রবৃত্তি নামে ভাষ্য রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন দুর্গসিংহ কাতন্ত্রবৃত্তিটীকাও কাতন্ত্রচন্দ্রিকা প্রণয়ন করেন। কলাপব্যাকরণ কাতন্ত্র বা কৌমার ব্যাকরণ নামেও আখ্যাত। শ্রীপতি দত্ত কাতন্ত্রপরিশিষ্ট রচনা করিয়া কলাপ ব্যাকরণের অসম্পূর্ণতার নিরাকরণ করেন। কুলচন্দ্র প্রণীত দুর্গাবাক্যপ্রবোধ ও রামনাথ চক্রবর্ত্তী বিরচিত কাতন্ত্র বৃত্তিবোধ দুর্গাসিংহের কাতন্ত্রবৃত্তির টীকাস্বরূপে রচিত হয়।

---

* মুগ্ধবোধপ্রণেতা বোপদেব দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দেবগিরির (দৌলতাবাদ) অধীশ্বর মহাদেবের সভাসদ ছিলেন। চতুর্ব্বর্গ-চিন্তামণি নামক অতি বিস্তীর্ণ ও সুপ্রসিদ্ধ স্মৃতিগ্রন্থ-প্রণেতা হেমাদ্রি দেবগিরীশ্বর মহাদেবের মন্ত্রী ছিলেন। বোপদেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কেশব চিকিৎসাব্যবসায়ী ছিলেন। বোপদেব ধনেশের শিষ্য ছিলেন। তিনি প্রাগুক্ত মুগ্ধবোধ ভিন্ন কবিকল্পদ্রুম নামে ধাতুপাঠ ও তট্টীকা, কাব্যকামধেনু, রামব্যাকরণ, শতশ্লোকচন্দ্রিকা, ভাগবতপুরাণ অবলম্বনে হরিলীলা, মুক্তাফল ও পরমহংসপ্রিয়া নামে গ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করেন। তিনি কবিকল্পদ্রুমের প্রারম্ভে ইন্দ্র, চন্দ্র, কাশকৃৎস্ন, আপিশলী, শাকটায়ন, পাণিনি, অমর ও জৈনেন্দ্র এই অষ্ট প্রসিদ্ধ শাব্দিক বৈয়াকরণের নামোল্লেখ করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ মুগ্ধবোধ এত সংক্ষেপে নির্ম্মিত যে পাণিনির সমুদয় সূত্রের মর্ম্ম বোপদেব ১১১ সূত্রে ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই সংক্ষিপ্ততার জন্য মুগ্ধবোধের সূত্র শ্রুতিকঠোর, দুরুচ্চার্য্য, ও দুর্ব্বোধ্য হইয়া উঠিয়াছে। বোপদেব বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া ব্যাকরণের সমস্ত উদাহরণ বিষ্ণুনামঘটিত করিয়াছেন।

গীর্ব্বাণবাণীবদনং মুকুন্দসংকীর্ত্তনকৈতুভয়ং
হি লোকে।
সুদুর্লভং তচ্চন মুগ্ধবোধাদলভ্যতেঽতঃ পঠনীয়মেতৎ ॥

বিদ্বদ্ধনেশশিষ্যেণ ভিষক্ কেশব-সূনুনা।
হেমাদ্রি বোপদেবেন মুক্তাফলমচীকরৎ ॥

মন্ত্রীবর হেমাদ্রি এই মুক্তাফল নামে ভাগবতপুরাণের সারসংগ্রহের যে টীকা রচনা করেন, তাহার প্রারম্ভে স্বীয় সুহৃৎ বোপদেবের গ্রন্থাবলীর গণনায় লিখিয়াছেন যে, বোপদেব ব্যাকরণ সম্বন্ধে ১০, চিকিৎসাশাস্ত্রবিষয়ে ৯, সাহিত্যবিষয়ক ৩, ভাগবততত্ত্ববিষয়ে ৩, ও তিথিনির্ণয় নামে একখানি স্মৃতিশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

যস্য ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ স্ফীতাঃ প্রবন্ধা দশ,
প্রখ্যাতা নব বৈদ্যকেঽথ, তিথিনির্দ্ধারার্থমেকোঽদ্ভুতঃ।
সাহিত্যে ত্রয় এব ভগবত্তত্ত্বোক্তিবিধে চ ত্রয়ঃ
অন্তর্বাণিশিরোমণেরিহ গুণাঃ কে কে ন লোকোত্তরাঃ ॥

ত্রিলোচন দাস দুর্গসিংহের কাতন্ত্রবৃত্তির পঞ্জিকা নাম্নী টীকা লেখেন। 'সুষেণ আচার্য্য ত্রিলোচনদাসের কাতন্ত্রবৃত্তি পঞ্জিকার টীকা রচনা করেন। গোপীনাথ শ্রীপতি দত্ত কৃত কলাপ পরিশিষ্টের কাতন্ত্রপ্রবোধ নামে টীকা প্রণেতা। রঘুনাথ আচার্য্য-শিরোমণি কাতন্ত্র ব্যাকরণের কৃৎ-প্রকরণের কলাপতত্বার্ণব নামে টীকা রচনা করেন। কুশ্বল (কুশল) কৃত কাতন্ত্রপঞ্জিকা প্রদীপ ত্রিলোচন দাসের কাতন্ত্রপঞ্জিকার টীকা মাত্র। গোপীনাথের কাতন্ত্র প্রবোধভিন্ন স্বরাম চক্রবর্ত্তী প্রণীত কাতন্ত্রসিদ্ধান্তরত্নাকর নামে শ্রীপতি দত্তের কাতন্ত্রপরিশিষ্টের আরও একখানি টীকা আছে। রঙ্গস নন্দী কাতন্ত্রের ষট্‌কারক সম্বন্ধে প্রবন্ধ রচনা করেন।

পুরুষোত্তম দেব—একোচ্চারণবিশিষ্ট বিভিন্নাকার শব্দের দ্বিরূপকোষ নামে শব্দ মালা ৮০ শ্লোকে প্রণয়ন করেন। তৎ-প্রণীত জকারভেদ, সকারভেদ, কারকচক্র, একাক্ষরকোষ, হারাবলী কোষ বিদ্যমান আছে। কারকচক্রে সপ্ত বিভক্তির অর্থাদি নির্ণীত হইয়াছে। একাক্ষর কোষ চতুস্ত্রিং-শৎ শ্লোকে সম্পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে বহু-বিধ অর্থদ্যোতক একাক্ষরী শব্দের তালিকা সংগৃহীত হইয়াছে।* হারাবলী ৩১৫ শ্লোকে সম্পূর্ণ। ইহাতে নানার্থদ্যোতক শব্দের অভিধান সঙ্কলিত হইয়াছে। হারাবলী গ্রন্থকারের দ্বাদশবর্ষ অধ্যয়নের ফল। তিনি স্বীয় গুরু ধৃতিসিংহ অতিথির পরামর্শে ও পণ্ডিত জনমেজয়ের সাহায্যে দ্বাদশ বৎসর অধ্যয়নান্তর এই হারাবলী অভিধান রচনা করেন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মেদিনী কোষ প্রণেতা মেদিনীকরের নির্দ্দে-শানুসারে এই মাত্র অনুমিত হয় যে, পুরুষোত্তম বিশ্বকোষকারের পূর্ব্ববর্ত্তী কোষ-প্রণেতা। সংস্কৃতবিৎ অধ্যাপক উইলসন (H. H. Wilson) দশম কি একাদশ শতাব্দীতে পুরুষোত্তম প্রাদুর্ভূত হন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঢাকা কলেজিয়েট্ স্কুলের ভূতপূর্ব্ব সুযোগ্য প্রধান পণ্ডিত শ্রীনাথ তর্কপঞ্চানন মহোদয় ত্রিকাণ্ডশেষাদি কোষের সহিত একাক্ষর ও হারাবলী কোষ বাঙ্গালা অক্ষরে ঢাকায় প্রকাশ করেন। কলিকাতায় শ্রীযুত বাবু ভুবনচন্দ্র বসাক হারাবলী সংস্কৃত অক্ষরে প্রকাশ করিয়া-ছেন।

রামেশ্বর শর্ম্মা—শব্দার্ণবাদি কোষ অব-লম্বন পূর্ব্বক ১৩৬৫ শ্লোকে শব্দমালা নামে অভিধান রচনা করেন।

জগদীশং হরিং নত্বা শ্রীরামেশ্বর শর্ম্মণা।
শব্দার্ণবাদিকোষোক্তা শব্দমালা বিতন্যতে॥

নারায়ণ দাস কবিরাজ—ছয় পরিচ্ছেদে রাজবল্লভ বা দ্রব্যগুণ নামে স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন। ইহাতে সমস্ত প্রাত্যহিক অনুষ্ঠানের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

প্রভাত-প্রাহ্ন-মধ্যাহ্নাপরাহ্নরজনীভবাঃ।
ইতি পঞ্চ পরিচ্ছেদাঃ ষষ্ঠোঽপ্যৌষধা-শ্রয়ঃ॥

শ্রীনারায়ণ দাসেন কবিরাজেন ধীমতা।
প্রতিসংস্ক্রিয়তে দ্রব্যগুণোঽয়ং রাজবল্লভঃ॥

ধ্রুবানন্দ মিশ্র—সুবিখ্যাত সেনবংশীয় ক্ষত্রিয়নৃপতিকুলতিলক বল্লালসেন কুলীন-গণের গুণানুযায়ী কৌলীন্যমর্য্যাদা সংস্থাপন

* একাক্ষরকোষের সর্ব্বাংশে সদৃশ শ্রীনন্দন ভট্টাচার্য্যরচিত বর্ণাভিধান ও বিশ্বশম্ভু প্রণীত একাক্ষরমালিকা অভিধান বিদ্যমান আছে। শেষোক্ত গ্রন্থে ৫১১ টী শ্লোক আছে।

করেন। ধ্রুবানন্দ প্রণীত মহাবংশাবলী ও মিশ্রগ্রন্থদ্বয়ে কুলীন ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ১৩৬১ ও ১৭৬৩ শকের লিখিত পূর্ব্বোক্ত পুস্তকদ্বয় কৃষ্ণনগরবাসী পণ্ডিত লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয়ের নিকট বিদ্যমান আছে। ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা নামক ধ্রুবানন্দ মিশ্রের রচিত গ্রন্থের টীকাকার হরিনদী গ্রামবাসী গোপাল শর্ম্মার নাম ইতিপূর্ব্বে সপ্তম প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। ১৬৭৩ শকের লিখিত ধ্রুবানন্দ মত-ব্যাখ্যা উক্ত লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে।

রামসুন্দর বিদ্যাবাগীশ—১৭৪৭ শকে সপ্ত পরিচ্ছেদে বস্তুতত্ত্ব রচনা করেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

শাকে সপ্তযুগাব্ধিচন্দ্রগণিতে, মাসে মাঘৌ,
বাসরে সূর্য্যাস্যে ২, মহেশদিব্যনগরে,
কৃষ্ণে দশম্যাস্তিথৌ।

*　　*　　*　　*

গ্রন্থোহয়ং শুভদঃ শুভো বহুমতঃ প্রাতঃ
সমাপ্তিংগতঃ॥

রামসুন্দরের এই গ্রন্থ কাশীধামে অবস্থান কালে বিরচিত হয়।

রামতোষণ শর্ম্মা—১৭৪৩ শকে গ্রন্থকার প্রণীত প্রাণতোষিণী নামে তন্ত্রসংগ্রহ খড়দহের জমীদার বিদ্যোৎসাহী প্রাণকৃষ্ণ দত্ত মহাশয়ের সাহায্যে ও উৎসাহে মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ইহা নানা তন্ত্রের সংগ্রহ মাত্র। গ্রন্থের নাম এরূপ ভাবে রাখা হইয়াছে যে, তদ্দ্বারা গ্রন্থকার ও তাঁহার আশ্রয়দাতার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

রাজবল্লভের জীবনচরিত।*

আমাদের দেশীয় জীবনচরিত-লেখকগণ প্রকৃত পক্ষেই লোকের উপর নিতান্ত দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই সকল চরিত লেখকদিগের ইহা স্মরণ থাকা উচিত যে, তাঁহারা মনুষ্যেরই জীবন চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দেব ও পাশব, এতদুভয়ের মিশ্রণই মনুষ্য প্রকৃতি। পশুভাববিহীন মনুষ্য জগতে বোধ হয় অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহারাই ঈশ্বরের পূর্ণ কিম্বা অংশাবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। যদি সংসারাসক্ত সমস্ত মনুষ্য পাশব প্রবৃত্তি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিত, তাহা হইলে আমরা (মানবজাতি) মানবের পরিবর্ত্তে "দেবতা" আখ্যা ধারণ করিতাম। কিন্তু এই সকল চরিত-লেখকদিগের জ্ঞান এমনই সংকীর্ণ যে, তাঁহারা দুকড়ি, ছকড়িকেও এক একটী পূর্ণ বা আদর্শ মানব না করিয়া বিরত হইতে পারেন না। আবার এই সকল অদ্ভুত গ্রন্থকারগণ যাঁহাদের জীবনচরিত লিখিবেন, তাঁহার

---

* Roy's Life of Moharajah Rajbullubh.—রাজনগরের মহারাজা রাজবল্লভ রায় রাইয়াঁ মলারজঙ্গ বাহাদুর ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের জীবনচরিত।

বিরুদ্ধে কোন কথা বলিলে তাঁহারা ভদ্রতার সীমা উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক গালিগালাজ করিতে কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করেন না। মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনচরিত-লেখক মহেন্দ্র বাবুর ব্যবহার দর্শন করিয়া আমরা অবাক হইয়াছি। আদিব্রাহ্মসমাজের সংসৃষ্ট দুই একজন ব্যক্তি অক্ষয় বাবুর দুই একটী দোষের কথা উল্লেখ করায় তিনি স্বয়ং এবং অন্যের দ্বারা আদিসমাজের পালনকর্ত্তা, সমস্ত বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে যে রূপে আক্রমণ করিয়াছেন, কোনও ভদ্রলোকে এরূপ করিতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস ছিল না। নব্যভাবতে এই অভদ্রতার কণিকা মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু কল্পনা নামক একখানি মাসিক পত্রিকা এই অভদ্রতার মুকুট শিরে ধারণ পূর্ব্বক ভাঙ্গা ঢাক বাজাইয়া স্বীয় মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন।

যাহা হউক, এই সকল কথা পরিত্যাগ করা যাউক। অদ্য আমরা যে গ্রন্থখানা হস্তে লইয়া পাঠকবর্গের নিকট উপস্থিত হইতেছি, সেই অদ্ভুতগ্রন্থে গ্রন্থকারের নাম নাই। কিন্তু এই গ্রন্থকারের দুইটী উদ্দেশ্য আছে। প্রথম উদ্দেশ্য—আমাদিগকে ব্যক্তিগত ভাবে গালিগালাজ করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—রাজবল্লভ ও তাহার উত্তর পুরুষগণের গুণ কীর্ত্তন করা। *

তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। তিনি স্বীয় উদারতা গুণে আমাদিগকে গালিগালাজ করিয়া যদি সুখানুভব করিয়া থাকেন, তবে আমরা তাঁহার সেই সুখ-স্বপ্ন ভঙ্গ করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু রাজবল্লভের জীবনচরিতে তিনি যে অনেকগুলি মিথ্যা কথা প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্‌পাঠে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি। আমরা দীর্ঘকাল যাবৎ বাঙ্গালার ইতিহাসের বিশুদ্ধতা সম্পাদন জন্য প্রাণপণে যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছি, এমতাবস্থায় কোন মহাত্মা অসত্য বাক্যদ্বারা সেই ইতিহাসকে কলুষিত করিতে চেষ্টা করিলে আমাদের হৃদয়ে কত দূর কষ্টানুভব হইতে পারে, তাহা সহৃদয় পাঠকগণ সহজেই অনুভব করিতে পারেন।

ইতিপূর্ব্বে ভারতী পত্রিকায় ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত সমালোচনা কালে এবং বান্ধব পত্রিকায় "রাজা রাজবল্লভ সেন" শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা রাজবল্লভের প্রতিকূলে যে সকল "চার্জ" উপস্থিত করিয়াছিলাম, গ্রন্থকার সেই সকল খণ্ডন করিবার জন্য আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি তাহা খণ্ডন করিতে অসমর্থ হইয়া আমাদিগকে গালিগালাজ করত তদ্দ্বারা তাহা খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহার প্রথম উদাহরণ বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

"ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ রাজবল্লভ সম্বন্ধে যদিও কোন স্থানে অযৌক্তিক দোষারোপ করিয়াছেন, তাহা উপেক্ষা করা যায়, কারণ তাঁহাদের সমস্ত বর্ণনা

* আমরা জনৈক বৈদ্যবংশজ বন্ধুর নিকট গ্রন্থকারের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা জানি রাজবল্লভের সহিত তাহার রক্ত সম্পর্ক রহিয়াছে। গ্রন্থে তিনি সেই সকল কথা গোপন করিয়া আপনাকে নিঃসম্পর্কীত ব্যক্তি প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহা কি সাধুতার কার্য্য হইয়াছে?

ও বিশ্বাস প্রকৃত বলিয়া ধরিতে গেলে আজ মেঃ লেথব্রিজের বর্ণনানুসারে মিথিলাধিপতি জনক রাজাকেও সূর্য্যবংশীয় রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কারণ তিনি এক স্থানে লিখিয়াছেন যে, সূর্য্যবংশীয় রাজা রামচন্দ্র ঐ বংশীয় অপর এক রাজার কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন।* * * * * *

কিন্তু তাই বলিয়া একজন দেশীয় লেখকের পক্ষে ইহা বড়ই লজ্জা ও দুঃখের বিষয়। সাধ্যানুরূপ এই সকল দোষ পরিহার এবং শুদ্ধ রাজবল্লভের লুপ্তপ্রায় জীবন বিবরণ সঙ্কলন উদ্দেশ্যেই ইহা লিখিত হইল।* * * * * * ভরসা করি, **রাজবল্লভ-নিন্দুক, স্বার্থপর, নিচাশয় ব্যক্তি** ভিন্ন সহৃদয় পাঠকগণ শুদ্ধ রাজবল্লভের জীবনচরিত বোধে যে কোন প্রকার ভ্রমপ্রমাদ হইয়া থাকে, তাহা ক্ষমা করিবেন। সরলভাবে কোন ভ্রম দর্শাইয়া দিলে সাদরে তাহা পরিগৃহীত হইবে।"

আমরা স্বীকার করি, ইংরেজদিগের লিখিত ইতিহাসে অনেক অযৌক্তিক কথা স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু এই কথা বলিলেই কি তদ্বারা আমরা রাজবল্লভের বিরুদ্ধে যে "চার্জ্জ" উপস্থিত করিয়াছি, তাহা খণ্ডন হইতে পারে। আর গ্রন্থকার লেথব্রিজের প্রতি যে দোষারোপ করিয়াছেন, ইহাতে লেথব্রিজের কোন রূপ ভ্রম কিম্বা ত্রুটী নাই।

আমাদের বিবিধ পুরাণাদিগ্রন্থে এই রূপ লিখিত আছে যে, মহারাজ ইক্ষ্বাকুর এক শত পুত্র জন্মে,তন্মধ্যে বিকুক্ষি, নিমি ও দণ্ডই প্রধান। এই বিকুক্ষি জ্যৈষ্ঠ বলিয়া পৈত্রিক সিংহাসন প্রাপ্ত হন, সুতরাং তাঁহার সন্তানেরাই ইক্ষ্বাকুবংশীয় বলিয়া পরিচিত হন। এই বংশে শ্রীরামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন। মহারাজ দণ্ড, দণ্ডকারণ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। নিমি পূর্ব্ব-ভারতে একটী রাজ্য স্থাপন করেন, ইহাই উত্তর কালে মিথিলা নামে খ্যাত হইয়াছিল। বশিষ্ঠ সাপে মহারাজ নিমি দেহহীন হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি বিদেহ নাম প্রাপ্ত হন। এই বিদেহের পুত্র জনক, তাহার অপর নাম বৈদহ ও মিথি। এই জনক নাম হইতে তাঁহার উত্তর পুরুষগণ সকলেই জনক আখ্যা প্রাপ্ত হইযাছিলেন। মিথি নাম হইতে তাঁহার অধিকৃত রাজ্য মিথিলা আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই জনকের পুত্র উদাবসু, তৎপুত্র নন্দীবর্দ্ধন, তৎপুত্র সুকেতু, তৎপুত্র দেবারত, তাহার পুত্র বৃহদ্রথ, তৎপুত্র মহাবীর্য্য, তাহার পুত্র সুধৃতি, তৎপুত্র ধৃষ্টকেতু, তাহার পুত্র হর্য্যশ্ব, তৎপুত্র মরু, তাহার পুত্র প্রতিবন্ধক, তৎপুত্র কৃতরথ, তাহার পুত্র কৃতি, তৎপুত্র বিবুধ, তাহার পুত্র মহাধৃতি, তৎপুত্র কৃতিরাত, তাহার পুত্র মহারোম, তৎপুত্র স্বর্ণরোম, তাহার পুত্র হ্রস্বরোম। হ্রস্ব রোমের দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ সীরধ্বজ কনিষ্ট কুশধ্বজ, এই সীরধ্বজ পৈত্রিক রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া জনক নামে অভিহিত হন, আর কুশধ্বজ স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বারা সাঙ্কাশ্য রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। সীরধ্বজ—জনকের জ্যেষ্ঠ কন্যা সীতাকে রাম বিবাহ করেন ও কনিষ্ঠা কন্যা উর্ম্মিলাকে লক্ষ্মণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুশধ্বজের দুই কন্যাকে ভরত ও শত্রুঘ্ন বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজস্থানের ইতিহাস লেখক টড সাহেব রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই সকল কাহিনী

তাঁহার জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। বেথব্রিজ সাহেব তাহা সঙ্খেপে স্বীয় গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। এইক্ষণ পাঠকগণ বিচার করিয়া বলুন, বেথব্রিজ দোষী কি গ্রন্থকার দোষী। পরের ভ্রম ধরিতে হইলে বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

গ্রন্থকার আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কেবল "স্বার্থপর" "নিচাশয়" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু কিরূপ স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা রাজবল্লভের চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছি, তাহা অবশ্যই প্রদর্শন করা তাঁহার উচিত ছিল। আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে পারি, ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার ব্যতীত আমাদের অন্য কোন স্বার্থ নাই। ঐতিহাসিক সত্য উদ্ধার করিতে যাইয়া যদি ব্যক্তি বিশেষের চরিত্র কলঙ্কিত হইয়া পড়ে, তবে আমরা কি করিব।

If an *offence* come out of the truth, *better* is it that the offence come, than the truth be concealed.

(Jerome.)

তৎপর গ্রন্থকার বলেন "রাজবল্লভ একে বংশানুক্রমে জমিদার সন্তান।" আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, ইহাতেও গ্রন্থকার সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। কিছুকাল গত হইল রাজবল্লভের জ্ঞাতি জপ্সা-নিবাসী ৺বাবু হরনাথ রায়ের পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দনাথ রায় স্বীয় বংশের যে বিবরণ লিখিয়া আমাদিগকে অর্পণ করিয়াছেন, আমরা তাহা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, "গ্রন্থকারের এই বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য নহে। বাবু আনন্দনাথ বলেন, "বেদগর্ভ সেন নামে এক ব্যক্তি বিক্রমপুরে পদার্পণ করিয়া কোন রাজকার্য্যে নিযুক্ত হন। তদ্দ্বারা তিনি যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিলদাওনিয়া জপ্সা ও ভোজেশ্বর প্রভৃতি তিনখানা গ্রামের কিয়দংশ খরিদ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাকে নাম মাত্র ভূমি সম্পত্তি বলিতে হইবে, কারণ তদ্দ্বারা তিনি এমন আয় সংস্থান করিয়া যাইতে পারেন নাই, যদ্দ্বারা তাহার সন্তানগণ সুখ সচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিতেন।"

বেদগর্ভের দুই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও নীলকণ্ঠ, বিলদাওনীয়া ও ভোজেশ্বর গ্রামে বেদগর্ভের যে সামান্য ভূমি সম্পত্তি ছিল, তাহা শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্ত হন। জপ্সা নীলকণ্ঠের অংশে পতিত হয়।

এই শ্রীকৃষ্ণের বংশে উত্তর কালে কৃষ্ণজীবন মজুমদার নামে এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। (ইহাতেই তিনি পুরুষানুক্রমিক জমিদার সন্তান।) আমরা লিখিয়াছিলাম "মোগলাধিকার কালে মালখাঁ নগর নিবাসী বসু মহাশয়দিগের হস্তে বিক্রমপুরের কাননগুই ভার ন্যস্ত ছিল। বিগত শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিলদাওনীয়া নিবাসী কৃষ্ণজীবন মজুমদার উক্ত বসু মহাশয়দিগের সেরেস্তায় মোহরের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। উক্ত কৃষ্ণজীবন রাজা রাজবল্লভের পিতা।"

গ্রন্থকার কৃষ্ণজীবনের অবস্থা গোপন করিয়া লিখিয়াছেন "উল্লিখিত মজুমদার মহাশয়ও অনেক ক্রিয়া কলাপ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করতঃ তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। ইত্যাদি" আমরা উদ্ধৃত অংশ ও তাহার পরবর্ত্তী কয়েকপংক্তি পাঠ করিয়া বঙ্গীয় বৈদ্য

সমাজের শীর্ষস্থানীয় সেনহাটীর সেনবংশ-জাত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র সেন মুন্সী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয় আপনার বিবেচনায় গ্রন্থকারের এই সকল বর্ণনা সত্য কিনা।" তদুত্তরে তিনি বলিলেন "আমার বিবেচনায় গ্রন্থকার এস্থলে সত্যের অপলাপ করিয়াছেন। আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি যে, রাজবল্লভের পিতা মালখাঁ নগর নিবাসী বসুদিগের বাটীর গোমস্তা ছিলেন। এইরূপ ক্রিয়াকলাপ ও মন্দিরাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক চিরস্মরণীয় হইবার উপযুক্ত ধন সম্পত্তি তাহার ছিল না।" সামান্য সামান্য ঘটনা সম্বন্ধে যে গ্রন্থকার মিথ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহার প্রদর্শন জন্য আমরা অন্য প্রমাণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল বৈদ্য বংশজাত মহাত্মাদিগের লিখিত কিম্বা কথিত বাক্যই উল্লেখ করিব। রাজবল্লভের প্রবল উন্নতির সময়েও যে তাহার পৈত্রিক প্রভু দেবীদাস বসু মহাশয়ের বাটী হইতে সরস্বতী পূজার কলম তাঁহার নিকট প্রেরিত হইত এবং তিনি তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন, ইহা অদ্যাপি বিক্রমপুর নিবাসী প্রাচীনগণ সকলেই অবগত আছেন। ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করাই আমাদের জীবনের ব্রত, ইতিহাসে মিথ্যা কথা প্রবেশ করাইবার জন্য আমরা লেখনী ধারণ করি নাই।

রাজবল্লভের জন্ম সম্বন্ধে কতকগুলি প্রবাদ প্রচলিত আছে—

১। রাজবল্লভ যখন মাতৃগর্ভে, তখন তাঁহার মাতা একদা স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, পূর্ণচন্দ্র তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছে।

মগধ দেশের অধীশ্বর খ্যাতনামা জরাসন্ধ কৃষ্ণজীবনের ঔরসে রাজবল্লভরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন ইত্যাদি। এই সকল প্রবাদ সম্বন্ধে আমরা লিখিয়াছিলাম যে, বোধ হয় চাটুকারবর্গ এই সকল প্রবাদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থকার তাহারও পাটা গাইয়াছেন। আমরা তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে ইচ্ছা করি না। সহৃদয় পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে প্রবাদগুলি বিশ্বাস করিতে পারেন।

রাজবল্লভের বাল্য ইতিহাস আমরা এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলাম "রাজবল্লভ শিশুকালে পৈতৃক প্রভু বসুদিগের আশ্রয়ে থাকিয়া পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপর তিনি মুরসিদাবাদে যাইয়া জগৎসেঠের সরকারে এক মোহরেরর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তদন্তে সুযোগক্রমে নবাব সরকারে প্রবেশ করেন। ১৬৫১ শকাব্দে মুরাদ আলী যখন ঢাকায় নওয়ারামহালের অধ্যক্ষ হইয়া প্রেরিত হন, সেই সময়ে প্রথমতঃ রাজবল্লভ তাঁহার সহিত "নাওরা" মহালের জমানবিস হইয়া আসেন। তৎপর পেস্কার হইয়াছিলেন।"

গ্রন্থকার বলেন, "রাজবল্লভের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাজারাম নবাব সরকারের কানুনগুই সেরেস্তার কার্য্য করিতেন। তিনি তাঁহার নিকট থাকিয়া পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করেন। (বসু মহাশয়েরা কানুনগুই ছিলেন, গ্রন্থকার কৌশলক্রমে তাহাদের নামটি উল্লেখ করেন নাই কেন?) তৎপর তিনি ঢাকায় নবাব সরকারের এক কার্য্যে নিযুক্ত হন। ক্রমে দক্ষতাগুণে মুরসিদাবাদ নবাব সরকারে প্রবিষ্ট হন। এই স্থানে কার্য্য করিতে করিতে তাহার দক্ষতা

বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তথায় কিয়ৎকাল দক্ষতার সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পুনর্ব্বার ঢাকায় নবাব সরকারে তৎকালিক কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া আইসেন।"

মিথ্যা! মিথ্যা! মিথ্যা! মিথ্যা!

মুসলমানদিগের শাসনকালে কালেক্টর আখ্যা-বিশিষ্ট কোন কর্ম্মচারী ছিল না। তথাপি যে কেন গ্রন্থকার সামান্য বিষয়েও সত্যগোপন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। প্রাচীন ইতিহাস লেখকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে "রাজবল্লভ প্রথমতঃ জমানবিসের কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎপর মুরাদ আলী দ্বারা পেস্কারের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন।"

বিখ্যাত ইতিহাস-লেখক মেজর ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছেন:—

"A. D. 1731 The Nawab (Suja Addin) gave the Government of Dacca to his son Serferaz Khan; but ordered him to send thither, as his deputy, Syad Galib Ali Khan, a person who asserted his descent from the King of Persia: he also nominated Jeswont Roy, who had been precepter to Serferaz Khan, to be Dewan, and to have the actual management of all affairs. The superintendence of the boat department was entrusted to Murad Ali Khan, who was married to a daughter of Serferaz Khan; and who had in his employment an accountant, named Raj bullub, of whom more will be hereafter related.

When these officers arrived at Dacca, Jeswont Roy was in obedience to the Nawab's orders, invested with the entire management of the revenues. He had been educated under the late Nawab, Moorshed Cooli Khan, whose example he emulated in piety, integrity, and indefatigable energy.

A. D. 1735. Attention to business; and in forming his arrangements to render them conducive to the general ease and happiness of the people, he abolished the monopolies which had been introduced by Meer Habbeeb, and also the impositions laid upon grain.

It was related, in the account of the Government of Shaista Khan, that when he left Dacca to return to Dehli, he built up the western gate, and inscribed over it an execration against any future Governor who should presume to open it till he had reduced the price of grain to a *dumree* per seer or 640 pounds weight for the rupee. The gate had continued closed to this time; when Jeswont Roy, having succeeded in reducing the price of grain to Shaista Khan's standard, ordered it to be opened.

By the prudent administration of a system of sound policy and humanity, the rich province of Dacca was cultivated in every part, and abounded in every thing requisite for the comfort and gratification of its inhabitants. Justice was administered with impartiality; and the conduct of Ghalib Ali Khan and Jeswont Roy gained great credit to their principal Serferaz Khan.

As the Nawab was far advanced in years, he relaxed in his attention to business, and entrusted the management of affairs much to his son.

A. D. 1737-8 After some time, Nuffusa Begum, persuaded her husband to recal Ghalib Ali Khan from Dacca and to promote his son-in-law, Murad Ali to the Goverment. This young man appointed Rajbullub to be Peshkar or head clerk, of the boat department; and commenced his Government with many acts of oppression. Jeswont Roy, the Dewan, who had gained so high a reputation for his conduct, beheld these measures with aversion, and resolving not to be a participator in them; resigned his appointment, and returned to Moor-

shedabad. Upon his resignation the new Government gave a loose to their rapacity and violence, till they reduced the country to a state of comparative poverty and desolation."

মোগলাধিকার কালে মগ, পর্তুগিস প্রভৃতি জাতি সমূহের অত্যাচার নিবারণ জন্য ঢাকায় কতকগুলি রণতরী থাকিত। এই সকলের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য ঢাকা, ত্রিপুরা, ময়মনসিংহ ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলা সমূহের অন্তর্গত কতকগুলি পরগণা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল। সেই সকল পরগণাকেই সাধারণতঃ নাওরা মহাল আখ্যা প্রদান করা হয়।

আমরা বিবিধ ইতিহাস হইতে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বে লিখিয়াছিলাম—"মুরাদ আলী ও রাজবল্লভ ক্রুর, নির্দ্দয়, ও স্বার্থপর ছিলেন। কার্য্য প্রবৃত্ত হইয়াই তাঁহারা প্রজার সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। মহাশয় যশোবন্ত সিংহ মুরাদ ও রাজবল্লভের অন্যায় আচরণ দর্শনে নিতান্ত ত্যক্ত হইয়া স্বীয় পদ পরিত্যাগ করিলেন। যশোবন্তের কার্য্য পরিত্যাগে সেই দুর্ব্বিনীতদিগের অত্যাচার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৎকালে পূর্ব্ববঙ্গের যেরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। কি প্রজা কি ভূম্যধিকারী, রাজবল্লভকে উৎকোচ দ্বারা সন্তুষ্ট না রাখিতে পারিলে কাহারও নিষ্কৃতি ছিল না। এই সময় রাজবল্লভ জমিদারদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া জমিদারি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। ভাটী প্রদেশস্থ বোজরগ উমেদপুর তাঁহার প্রথম ভূমি সম্পত্তি।"

এইরূপ বর্ণনা করায় গ্রন্থকার আমাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া যথাসাধ্য গালিগালাজ করিয়া লিখিয়াছেন "রাজবল্লভ একে বংশানুক্রমিক জমিদার সন্তান, তাহাতে নিজে ও পুত্রগণ এইরূপে উচ্চপদে কার্য্য করাতে ক্রমে বিস্তৃত জমিদারি ও বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইলেন।"

রাজবল্লভ কিরূপ জমিদারের পুত্র ছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তাঁহার জমিদারি সঞ্চয়ের অন্যান্য প্রমাণ আপাততঃ উল্লেখ করিব না। তাঁহার জ্ঞাতি পুত্র বাবু আনন্দনাথ রায় কি লিখিয়াছেন, তাহা পাঠকগণ শ্রবণ করুন: ("রাজবল্লভের জ্ঞাতি জপসা নিবাসী) লালা রামপ্রসাদ বোজরগ উমেদপুর পরগণাটী ক্রয় করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজবল্লভ চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে তপ্পে আবদুলা পুর ও অন্য কয়েক খানি গ্রাম মাত্র দিয়া উক্ত পরগণাটী আত্মসাৎ করেন।

পাঠকগণ! যে ব্যক্তি নিজের পরিবারবর্গের সহিত এইরূপ চক্রান্ত করিয়া স্বীয় স্বার্থ সাধন করিতে পারিয়াছিলেন, সে ব্যক্তি অন্যের প্রতি কিরূপ নির্দ্দয়তা প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা একবার বিবেচনা করিয়া দেখুন। বোজরগ উমেদপুর সম্বন্ধে রাজবল্লভের আরও অনেক কীর্ত্তি আছে, তাহার সামান্য অংশমাত্র উল্লেখ করিতেছি। উত্তর কালে যখন রাজবল্লভ ঢাকায় দেওয়ান হইলেন, তখন প্রাচীন জমাওয়াশীল বাকী কাটিয়া এই পরগণায় বার্ষিক পূর্ব্ব রাজস্ব ৪৬৪৭ টাকা লিখিয়া, বৃদ্ধি হারে তিনি ৬০০০ টাকা মাত্র প্রদান করিতেন। পরে যখন এই পরগণা তাঁহার হস্তচ্যুত হইল, তখন অমনি তাহার রাজস্ব একেবারে ৬০০০ হইতে ২০১২৯৪ টাকা হইয়া উঠিল। এইরূপ

অনুচিত রাজস্ব বৃদ্ধি হইতে দশ বৎসরও অতীত হয় নাই। তৎপরে আমরা রাজবল্লভের উন্নতির বিবরণ এইরূপ বর্ণনা করিয়াছিলাম ;—

১৬৬২ শকাব্দে আলিবর্দ্দি খাঁ বাঙ্গালার নবাব নাজিম হইয়া স্বীয় জ্যেষ্ঠ জামাতা সুবার দেওয়ান সহমত জঙ্গ নিবাইস মহম্মদকে ঢাকার নবাবের পদে নিযুক্ত করেন। নিবাইস মহম্মদ রাজবল্লভকে পূর্ব্বপদে স্থির রাখিয়াছিলেন। (পরে উন্নতিও হইয়াছিল।) কিন্তু তাঁহার অত্যাচারের লাঘব হইয়াছিল। রাজবল্লভ কিছু কাল বিড়ালতপস্বীর ন্যায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন। অনন্তর নিবাইস মহম্মদ অকালে পরলোক গমন করিলে, আলিবর্দ্দি স্বীয় দুহিতাকেই তাঁহার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই সময় রাজবল্লভই ঢাকার প্রধান রাজপুরুষ, ক্রমে বিধবা শাসনকর্ত্রীর সহিত তাহার ঘৃণিতসম্বন্ধ স্থির হইল। জনৈক প্রাচীন বিখ্যাত ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, নিবাইস পত্নীর সহিত রাজবল্লভের যে সম্পর্ক হইয়াছিল, তাহা জাতি,ধর্ম্ম,ব্যবহার ও বিধি বিরুদ্ধ বটে। যদিচ রাজবল্লভ এই সময়ে নবাব উপাধি ধারণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু, কার্য্যত নিবাইস মহম্মদের সমস্ত সম্পত্তি ও অধিকার (!!!) তাহার করায়ত্ত হইয়াছিল। (গ্রন্থকার এই সকল কথা খণ্ডন করিতে পারেন নাই, তাহার উত্তরে তিনি এইমাত্র লিখিয়াছেন যে, সাহেবদিগের সকল কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে, উদাহরণ রামের সহিত জনক নন্দিনীর বিবাহ।)

ক্রমে রাজবল্লভ বিস্তৃত জমিদারি ও বিপুল অর্থ সঞ্চয় করিলেন। তিনি নানাবিধ অট্টালিকা নিজ নিকেতনে নির্ম্মাণ করিয়া বিলদাওনীয়াকে রাজনগর আখ্যা প্রদান করিলেন। তিনি যে সকল অট্টালিকা নির্ম্মাণ ও দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন, তৎসমস্তই করাল কালরূপিণী কীর্ত্তিনাশার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত। ভগবান মনু বলিয়াছেন ;—

অধর্ম্মেণৈধতে তাবৎততো ভদ্রাণি পশ্যতি।
ততঃ সপত্নান জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি॥

রাজবল্লভের সাতপুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামদাস পিতার সহকারী স্বরূপ ঢাকার রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছিলেন। রামদাস নিতান্ত অসচ্চরিত্র ছিলেন। সতীর সতীত্ব নাশ তাহার নিত্য কার্য্য ছিল। অদ্যাবধি ঢাকানিবাসীদিগকে তাহার এই কার্য্য স্মরণ করিলে ম্রিয়মাণ হইতে হয়। দুর্ব্বৃত্ত রামদাস পিতার বর্ত্তমানেই জীবলীলা সংবরণ করেন। তৎকনিষ্ঠ কৃষ্ণদাস। গ্রন্থকার বলেন, ইনি প্রথমতঃ ঢাকার শাসন কার্য্যে, পরে মুরসিদাবাদে নবাবের মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন। ইনি কোন নবাবের সময় মন্ত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা উল্লেখ করা তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। আমরা কোন ইতিহাসে ইহা প্রাপ্ত হই নাই। আমাদের বিবেচনায় গ্রন্থকার অনেক স্থলে এইরূপ সত্যের শিরে পদাঘাত করিয়া রাজবল্লভ ও তাহার বংশধরগণের গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। রাজবল্লভের তৃতীয় পুত্র রাজা গঙ্গাদাস, গ্রন্থকারের মতে ইনি মিরজাফরের সময়ে পাটনার শাসন কার্য্যে নিযুক্ত হন। আমরা কোন ইতিহাসে ইহা প্রাপ্ত হই নাই। আমরা দৃঢ়রূপে জানি যে, ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। কারণ রামনারায়ণ ও তৎপর রাজা সিতাবরায় পাটনায় গবর্ণর হইয়াছিলেন।

রাজবল্লভের অন্যান্য পুত্রগণের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের কোন সংশ্রব নাই, সুতরাং রাজবল্লভের বংশধর ও তাহাদের কন্যা গর্ভসম্ভূত ব্যক্তিগণ প্রতিমা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তাঁহাদিগের পূজা করিলেও আমরা কোন শব্দ করিব না।

শেষ বঙ্গেশ্বর হতভাগ্য নবাব সিরাজ-উদ্দৌলা কি জন্য রাজবল্লভ ও তৎপুত্র কৃষ্ণ দাসের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের মূল বর্ণনীয় বিষয়। এই কথা আমরা পূর্ব্বে বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করিয়াছিলাম বলিয়াই রাজবল্লভের বংশধর ও তাহাদের আত্মীয় ও অনুচরবর্গ আমাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছেন। আমরা কেন রাজবল্লভের কুকার্য্য সমূহ প্রকাশ করিয়া সিরাজের কলঙ্ক কালিমা প্রক্ষালন করিতে যত্ন করিলাম, ইহাই আমাদের প্রধান অপরাধ। শত সহস্র ইতিহাস লেখক সিরাজের কলঙ্ক ঘোষণা করিয়াছেন, আমরা কেন তাহাদের সহিত "ডিটু" প্রদান করিলাম না, ইহাই আমাদের প্রধান অপরাধ। যে সকল বিশ্বাসঘাতক ভৃত্য চক্রান্ত করিয়া সিরাজের সর্ব্বনাশ করিয়াছিলেন, আমরা কেন তাঁহাদিগকে দেবোপম আদর্শ মানব বলিলাম না, ইহাই আমাদের প্রধান অপরাধ। যে সকল বঙ্গ-কুলাঙ্গার বঙ্গে দাসত্বের পরিবর্ত্তে দাসিত্বে স্থাপন করিয়া-গিয়াছেন, আমরা কেন তাহাদের গুণ গান করিলাম না, ইহাই আমাদের প্রধান অপরাধ। যে সকল মূঢ় নিদাঘের আতপ তাপে তাপিত হইয়া প্রজ্বলিত পাবক শিখায় প্রবেশ করিয়াছিলেন, আমরা কেন তাহাদের গুণানুবাদ করিলাম না, ইহাই আমাদের প্রধান অপরাধ। যে সকল বঙ্গসন্তান পাদপমূল পরিহার পূর্ব্বক ফণির ফণাতলে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমরা কেন তাহাদের যশোগান করিলাম না, ইহাই আমাদের প্রধান অপরাধ। যে সকল বঙ্গ-ভূষণ কলুষনাশিনী ভাগীরথির দেব-বাঞ্ছিত পবিত্র উদক পদে ঠেলিয়া কর্ম্মনাশার জলে অবগাহন করিয়াছিলেন, আমরা কেন তাহাদের যশোকীর্ত্তন করিলাম না, ইহাই আমাদের প্রধান অপরাধ। যে সকল বঙ্গ-সন্তান লোভাক্রান্ত হইয়া জন্মভূমিকে চির-কালের জন্য দাসত্ব নিগড়ে বদ্ধ করিয়া অবশেষে দগ্ধবস্তা ভোজন করিয়াছিলেন, আমরা কেন তাহাদের যশ কাহিনী বর্ণনা করিয়া পবিত্র ইতিহাস কলুষিত করিলাম না, ইহাই আমাদের প্রধান অপরাধ।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৈলাসচন্দ্র সিংহ।

সংক্রামক রোগ।

আমাদের উদ্দেশ্য যত কেন বিভিন্ন হউক না, স্ব স্ব উদ্দেশ্য সুচারুরূপে সাধন করিতে হইলে একটী বস্তু আমাদের সকলেরই আবশ্যক হইয়া থাকে। ধন, মান, যশ অথবা জ্ঞানের জন্য সকলে আকাঙ্ক্ষী করেন না, কিন্তু কেনা সুস্থতার জন্য লালায়িত? সুস্থতাই আমাদের সুখের মূলীভূত কারণ। রুগ্ন শরীর লইয়া আমরা কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হই না। যক্ষ্মাক্লিষ্ট উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন। তিনি

শাপগ্রস্ত হইয়া যখন জরার পরিবর্ত্তে তাহার সন্তানদিগের নিকট যৌবনের প্রার্থনা করেন, তখন তাহারা জরার নানা দোষ বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম পুত্র যদু বলিয়াছিলেন, "জরাগ্রস্ত ব্যক্তির পান ভোজন সম্বন্ধে অনেক দোষ ঘটে, তাহারা দুর্ব্বল ও কৃশ হয়, কোন কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না, যৌবনে বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইয়া অন্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিরানন্দ চিত্তে জীবনাতিপাত করিয়া থাকে এবং তাহাদের শরীর বিকৃত হয়। মাংস সকল শিথিল হয়, অঙ্গের নানা স্থানে ক্ষত দৃষ্ট হয় এবং কেশ ও শ্মশ্রু সকল পতিত হয়।" তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র তুর্ব্বসু বলিলেন, "জরাগ্রস্ত ব্যক্তিরা সুখ ঐশ্বর্য্য কিছুই ভোগ করিতে পারে না, তাহাদের বল, রূপ, বুদ্ধি, প্রাণ সকলই নাশ হইয়া থাকে, অতএব সে জরা আমি গ্রহণ করিতে বাঞ্ছা করি না।" তাঁহার তৃতীয় পুত্র দ্রুহ্য বলিলেন "জরাগ্রস্ত ব্যক্তিরা রথ, অশ্ব, গজ এবং সুখ ঐশ্বর্য্য কিছুই ভোগ করিতে পারে না। এবং এমন কি, উহারা বাক্‌শক্তি হারাইয়া থাকে, সুতরাং জরা লইতে আমি ইচ্ছা করি না।" তাঁহার চতুর্থ পুত্র অনু বলিলেন "জরাগ্রস্ত ব্যক্তি-দের শিশুর মত আচার ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহাদের আহারের সময় অসময় থাকে না। তাহারা সর্ব্বদাই অশুচি থাকে সুতরাং আহুতি প্রদান প্রভৃতি ধর্ম্মকার্য্য করিতে অশক্ত হয়, সেই জন্য আমি জরা গ্রহণ করিতে অভিলাষ করি না।

বাস্তবিক পৃথিবীতে অধিক দুঃখের কারণই রোগ ও দরিদ্রতা। যত প্রকার রোগ আছে তন্মধ্যে সংক্রামক রোগ মনুষ্যের অধিক অনিষ্টকারী ও ভয়ানক। এই রোগ নিবারণের উপায় কিয়ৎ পরিমাণে প্রত্যেক মনুষ্যের এবং অধিকন্তু রাজার আয়ত্তাধীন বলিয়াই আমরা এ বিষয়ের অবতারণা করিতেছি। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন দোষে লিপ্ত না হইলেও কেবল অল্পমাত্র অবিমৃষ্যকারিতা বা অসাবধানতা দোষেই অনেক সময় দুঃসহ সংক্রামক রোগের হস্তে পতিত হইয়া থাকি। রোগের কারণ না জানিলে রোগ আরোগ্য করা সুকঠিন। যদিও সংক্রামক রোগের কারণ কতকটা সংক্রামক শব্দের দ্বারায় প্রকাশ পাইতেছে এবং যদিও প্রকৃত পক্ষে এই রোগের কারণ সম্বন্ধে এখনও কোন নিশ্চয় হয় নাই, তথাপি এ বিষয়ে ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের বর্ত্তমান মতগুলি প্রকাশ করিলে বোধ হয় অপ্রীতিকর হইবে না।

এখন দেখা যাউক, এ রোগের উৎপত্তি কিরূপ। যে রোগ কোন মনুষ্য বা প্রাণী হইতে অন্য মনুষ্য বা প্রাণীতে স্পর্শ দ্বারায় অথবা জল, বায়ু, বস্ত্র,পুস্তক প্রভৃতি বাহ্যবস্তু দ্বারায় সংক্রামিত হয়, তাহাকে সংক্রামক রোগ বলে। ইংরাজীতে ইহার দুইটী শব্দ আছে। প্রথম Infectious disease. দ্বিতীয় Contagious disease. বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিতে হইলে প্রথমটী সংক্রামক অর্থাৎ জল বায়ু প্রভৃতির সাহায্যে যাহা মনুষ্য শরীরে সংক্রামিত হয়, দ্বিতীয়টী স্পর্শ-সংক্রামক অর্থাৎ যাহা কোন মনুষ্য বা অন্য প্রাণী হইতে অন্য মনুষ্য বা প্রাণীতে স্পর্শ দ্বারায় সংক্রামিত হয়।

এ রোগের বীজ কিদৃশ, সে বিষয়ে অনেক মতভেদ আছে। পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণ ইহার কোন মীমাংসা করিয়া

যাইতে পারেন নাই এবং বর্ত্তমান সময়ে যে ইহার স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। তবে আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে ইহার বীজ দুই জাতীয়, এক চেতন, অপর অচেতন। চেতনবাদীরা বলেন যে, ইহা এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় উদ্ভিদ বা ভৌতিক অণু বিশেষ হইতে সমুৎপন্ন। উহারা বায়ুতে ভাসমান থাকিয়া জীবদেহে প্রবিষ্ট হয় এবং শরীরে প্রবেশ করিয়া স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে সংক্রামক রোগের উৎপত্তি করে। ইহাঁদের মধ্যে আবার কেহ কেহ বলেন যে, ঐ সকল জীবাণু বা উদ্ভিদাণু গুলিই রোগ অর্থাৎ উহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে রোগের সৃষ্টি করে। অন্য এক সম্প্রদায়ের মতে উহারা রোগ উৎপত্তির কারণ হইলেও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নহে, পরম্পরা সম্বন্ধে বটে ; যে হেতু উহারা রোগের বীজকে বহন করিয়া শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয় মাত্র, পরে সেই বীজ জীব শরীরে সঞ্চারিত এবং বর্দ্ধিত হইয়া বিকৃত ভাব উৎপাদন করে।

অচেতনবাদীরা বলেন যে, প্রাকৃতিক বস্তু সকলের রাসায়নিক সংযোগ বিশেষ হইতে এই রোগের অণু উৎপন্ন হয়। ইহারা ইহাদের তিন প্রকার আকার নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কঠিন, তরল ও বায়বীয়। তরলের মধ্যে কতকগুলি আগুলালিক অর্থাৎ অণ্ডলালের ন্যায় অনতিতরল পদার্থ। এই বস্তটী অনুকূল-সংযোগ-প্রবণ হওয়ায় বিভক্ত হইবা মাত্র ইহার উৎপাদনভূত পদার্থ সকল অন্য পদার্থের যোগে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। যাহা হউক, বিবেচনা করিয়া দেখিলে চেতনবাদীগণের মধ্যে যাঁহারা জীবাণু বা উদ্ভিদাণুদিগকে উক্ত রোগের বীজ সকলের বাহক বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহারা অনেকাংশে অচেতনবাদিদিগের মতের পরিপোষক ; কারণ, অচেতন পদার্থের অণুই জীবাণু বা কীটাণু সহযোগে অধিকাংশ সময়ে জীব শরীরে নীত হয়।

সংক্রামক রোগের অণু, জীবাণু বা উদ্ভিদাণু নানারূপ দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে প্রথমত কতকগুলি পরাঙ্গপুষ্ট অর্থাৎ পরগাছার আকার, ইহা দক্রুরোগে বিশেষরূপে দৃষ্ট হয়। উহারা এক প্রকার উদ্ভিদাণু।

(২) মনাড বা ব্যাক্‌টীরিয়া নামক ক্ষুদ্রতম প্রাণী বিশেষ। কেহ কেহ বলেন, ইহারা ক্ষয়কাশ রোগে দৃষ্ট হয়।

(৩) কোষাকার—ইহা ক্যানসার বা একরূপ মারাত্মক জাতীয় রোগে দৃষ্ট হয়। স্কারলেটিনা রোগে এপিথিলিয়মতে রোগ-বীজ থাকে।

(৪) তরল রসময় পদার্থ, যথা বসন্ত রোগের রস।

(৫) লালা—যথা ক্ষিপ্ত কুক্কুরদংশনে ক্ষত দিয়া শরীরে প্রবিষ্ট হয়, যথা হাইড্রোফোবিয়া রোগে।

(৬) গাঢ় রস বা পূযের আকার, যথা মেহ পূয়জ চক্ষুপ্রদাহ।

(৭) বায়বীয় স্কারলেটিনা হাম প্রভৃতি রোগে রোগীর নিশ্বাস ত্বক হইতে নির্গত বায়ু দ্বারায় সঞ্চারিত হয়। সংক্রামক রোগীর বিষ্ঠাদির দুর্গন্ধেও রোগের উৎপত্তি হয়।

এই রোগ নানা প্রকারে শরীরে প্রবেশ করে (১) চর্ম্মভেদ বা ঘর্ষণ দ্বারায় শোণিতের সহিত মিলন যথা উপদংশ।

(২) মাংস বা চর্ম্ম ভেদ না [illegible] শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির সহিত স্পর্শমাত্র সংযুক্ত [illegible] যথা মেহ চক্ষুপ্রদাহ। চর্ম্মরন্ধ্রে প্রবেশ

করিয়াও কোন কোন স্থানে রোগের উৎপত্তি করিতে দেখা যায, যথা পাচড়া।

(৩) বায়ুর দ্বারায় নিঃশ্বাস বা মুখ-পথে শরীরে প্রবিষ্ট হওন যথা হাম।

(৪) আহার ও পানীয় সামগ্রী দ্বারায় দেহগত হওন, যথা বিসূচিকা।

(৫) মক্ষিকাদির দ্বারায় কখন কখন রোগ-বীজ শরীরে নীত হয়।

ইহারা শরীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিযা (১) স্থানিক অসুস্থতা উৎপাদন করে, যথা মেহ।

(২) প্রথম স্থানিক পরে দৈহিক বিকার আনয়ন করে, যথা উপদংশ রোগে।

(৩) প্রথম দৈহিক পরে স্থানিক বিকারের লক্ষণ প্রকাশ পায়, যথা বসন্তরোগে।

যখন ইহারা শরীর হইতে বহির্গত হয, তখন (১) রক্তবাহিনী শিরা হইতে তন্তু বা টিস্যু এবং তদনন্তর চর্ম্মে পরিব্যাপ্ত হইয়া নিঃশেষিত হয়।

(২) লালা, প্রস্রাব মল প্রভৃতির দ্বারায়ও শরীর হইতে নির্গত হয।

ইহাদের চিকিৎসা ও নিবারণের উপায়।—

সংক্রামক রোগ বহুবিধ, ইহাদের সকলের বিস্তারিত বিবরণ বর্ণনে পাঠকদিগের ক্লান্তিরই সম্ভাবনা, সুতরাং তাহা হইতে বিরত হইলাম। কিন্তু প্রধানতর কতকগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ জানিতে পারিলে রোগের প্রারম্ভ হইতেই উহা নিবারণের চেষ্টা এবং বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করা যাইতে পারে বলিয়া এখানে কতকগুলির সংক্ষেপ বর্ণনা করা গেল।

বসন্ত রোগের সংক্রামক শক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহার বীজ নিঃশ্বাসে স্খলিত [illegible] বা রসে বর্ত্তমান থাকে। ইহার বীজ বহুদূর দেশেও নীত হইয়া রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহার বিষ শরীরে প্রবেশ করিযা১০।১২ দিবস গুপ্তভাবে থাকে, পরে অধিকক্ষণ স্থায়ী কম্প হইয়া জ্বর, বমন, গাত্র পৃষ্ঠ বেদনা প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। জ্বরের তিন দিবস পরে গাত্রে কণ্ডু বহির্গত হয। পঞ্চম দিবসে উহাতে পুয হয। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে গো-বীজের টীকার প্রথা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এই রোগে প্রত্যেক পাঁচ জনের মধ্যে দুই জনের মৃত্যু হইত। এবং যাঁহারা ইহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতেন, তাহাদের কোন না কোন অঙ্গের বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইত। গোবীজের টীকা লইলে বা একবার বসন্ত রোগ হইলে পুনরায় উহা হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। সহস্র ইংরাজী টীকাধারীর মধ্যে কেবল ৭।৮ জনের উহা হইবার সম্ভাবনা, কিন্তু ইহাদের এই রোগে [illegible] বনা অতি অল্প। এক সহস্র টীকা বিহীন ব্যক্তির মধ্যে ৩৬০ জনের এই রোগ হইবার সম্ভাবনা এবং ইহাদের মধ্যে শতকরা ৩৩ জনের মৃত্যুর সম্ভাবনা।

এই রোগের অনিষ্টকারিতার দুই একটী দৃষ্টান্ত এস্থলে বলিতেছি।

একবার মরিসস্ দ্বীপে একটী জাহাজ প্রায় ৫০০ শত ভারতবর্ষীয় কুলি লইয়া যায। সেই জাহাজে বসন্ত রোগ উৎপন্ন হয়। সেইজন্য আরোহীদিগকে স্বতন্ত্র একটী ক্ষুদ্র দ্বীপে অবরোহণ করান হয়। সেখানে তাহাদিগকে প্রায় ৯ মাস থাকিতে হয়, কেন না রোগ ক্রমে ক্রমে একজনকে ছাড়িয়া অন্য জনকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে দুই শত লোকের এবং দুইজন ডাক্তারের মৃত্যু হয়। এইরূপ পৃথক করিয়া

ব্যক্তি সকল লোকদিগকে রাখা না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় মরিশসে ঐ রোগের প্রাদুর্ভাব অনেক দিন পর্য্যন্ত থাকিত ও অনেক লোকের প্রাণ হানি হইত।

সম্প্রতি এই মহা নগরীতে কোন এক জমিদারের গৃহে পানবসন্ত হইয়া কতদূর বিস্তারিত হইয়াছিল এবং কত দিন সেই পরিবারের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, শুনিলে অনেকেই আশ্চর্য্য হইবেন। ১৮৮৮ সালে জানুয়ারি মাসে জমিদারের নিজের ও তাঁহার প্রধান প্রিয় ভৃত্যের পানবসন্ত হয়। এই সময়ে কলিকাতায় অনুসন্ধান করিয়া কোথাও যে ঐ রোগ হইয়াছিল, এরূপ জানা যায় নাই। ইহাদের আরোগ্যের [illegible] জনের ঐ রোগ হয়। এইরূপে ১০।১২ দিন অতীত হয়, আর ৫।৭ জনে এই রোগে আক্রান্ত হন। ক্রমে ক্রমে পরিবারবর্গ কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গ লইয়া প্রায় ২০০ শত লোকে ইহার হস্তে পতিত হয়। যে সকল বন্ধু বান্ধব ঐ গৃহস্থের লোকদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিত, তাঁহাদেরও অনেকের ঐ রোগ হইয়াছিল। একজন কম্পাউণ্ডার বাবু ডাক্তার বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিল। ডাক্তার বাবু তখন ঐ রোগ ভোগ করিতেছিলেন। কম্পাউণ্ডার বাবু ঘণ্টা কয়েক থাকিয়া তাহার বাটী বর্দ্ধমানে যান। সেখানে প্রথম তাহার পানবসন্ত হয়, পরে তাহার প্রতিবেশী ও পরিবারের অনেকেই ইহার দ্বারায় আক্রান্ত হয় এবং ঐ জমিদারদিগের দেশে (কলিকাতা হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে) ইহার বীজ নীত হয় এবং সেখানে অনেকেরই ঐ রোগ হয়। এইরূপে এই রোগ প্রায় ৩ মাস কাল চারিদিকে স্থায়ী হয়।

(২) হাম।—[illegible] বালক বালিকা প্রভৃতি অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে আক্রমণ করে। ইহার বীজ ত্বক ও শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি হইতে নির্গত হয়। দেহমধ্যে ১০।১৫ দিবস গুপ্তভাবে থাকে, পরে সর্দ্দি ও জ্বর দৃষ্ট হয় এবং ৩।৪ দিন পরে চর্ম্ম ঈষৎ লাল বর্ণ ও কণ্ডু হয়। ইহার সঙ্গে যে কাশি পীড়া থাকে, তাহা অনিষ্টকারী। আরোগ্য হইবার পূর্ব্বে প্রায় উদরাময় হইয়া থাকে।

(৩) বিসূচিকা—ইহা আমাদের এত পরিচিত হইয়াছে যে, ইহার আবির্ভাব সকলেই বুঝিতে পারেন। চাল ধোয়া জলের ন্যায় মুহুর্মুহু ভেদ ও বমন, পিপাসা, হাত পায় খিল ধরা, শরীর-জ্বালা ইহার প্রধান লক্ষণ। রোগী অত্যন্ত ছট ফট করিতে থাকে।

ইহার বীজ শরীরে যে কত দিন গুপ্তভাবে থাকে, তাহা স্থির হয় নাই। ১ দিন হইতে ৪০ দিন পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে।

ইহাতে প্রায় শতকরা ৫০ জনের মৃত্যু হয়। অধিকাংশের মতে মল মূত্রেই ইহার বীজ অবস্থিতি করে। জল বায়ু ও খাদ্যের দ্বারা শরীরে প্রবিষ্ট হয়।

অন্যান্য সংক্রামক রোগ যথা—Typhus, Typhoid fever, Erysipelas, Puerperal fever, Consumption, Whooping Cough. প্রভৃতি চিকিৎসকের সাহায্য বিনা নির্ণয় করা সুকঠিন বলিয়া তাহাদের বিবরণ দেওয়া হইল না।

সংক্রামক রোগ নিবারণের উপায় বা [illegible]ক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবে [illegible] আমাদের কি করা কর্ত্তব্য, তাহার বিষয় [illegible] আমরা সংক্ষেপে আলোচনা [illegible] কার প্রস্তাব [illegible]

(১) রোগীকে অপরের সংস্রব হইতে বিচ্ছিন্ন করিবে। রোগীর সেবার জন্য ২।৩ জন যাঁহারা থাকিবেন, তাঁহারা কদাচ সুস্থ ব্যক্তির সহিত মিশিবেন না, কেননা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, সংক্রামক রোগের বিস্তার রোগী বা রোগীর সংস্পর্শের লোক বা বস্ত্র প্রভৃতির দ্বারায় হইয়া থাকে।

(২) রোগীর গৃহে অপ্রতিহত বায়ু প্রবাহ প্রবাহিত করিতে দেওয়া উচিত, কেননা তাহা হইলে রোগ বীজের বিষবৎ শক্তি অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এরূপ সাবধান হওয়া উচিত, যাহাতে রোগীর অঙ্গে শীতল বায়ু প্রবাহিত না হয়।

(৩) রোগীর গৃহে অধিক পরিমাণে দ্রব্যাদি রাখা নিষিদ্ধ, কারণ সেই দ্রব্য সকল দ্বারা রোগ-বীজ অন্য স্থানে সঞ্চারিত হইবার সম্ভাবনা।

(৪) রোগীর পরিষ্কারতা ও পরিচ্ছন্নতা সম্পাদন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, বিছানার চাদর বালিসের ওয়াড় প্রভৃতি প্রত্যহ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

(৫) সংক্রামক রোগীর নিঃশ্বাস লওয়া কদাচ বিধেয় নহে।

(৬) রোগীর গৃহে যে সকল খাদ্য দ্রব্য থাকে, তাহা কদাচ সুস্থ লোকে ব্যবহার করিবে না।

(৭) সংক্রামক রোগীর নিকট হইতে আসিবামাত্র বস্ত্র পরিবর্ত্তন ও মুখাদি প্রক্ষালন করা বিধেয়।

(৮) সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় আহারের বিষয়ে সাবধান হওয়া সকলেরই উচিত। অধিক ভোজন বা গুরুপাকদ্রব্য ভোজন, রাত্রি জাগরণ ও অতিরিক্ত পরিশ্রম নিষিদ্ধ। পানীয় জল বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। বিশেষতঃ বিসূচিকা রোগের আধিক্যের সময় পানীয় জলের একটী পুষ্করিণী স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যক। তাহাতে স্নান বা বস্ত্র ধৌত করা একেবারে নিষিদ্ধ করিবে।

(৯) বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় যাহাদের টিকা হয় নাই বা টিকার চিহ্ন একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে তাহাদের পুনরায় টিকা দেওয়া আবশ্যক।

(১০) রোগীর মল মূত্র শ্লেষ্মা প্রভৃতি আলকাতরা বা কারবলিক এসিডময় পাত্রে গ্রহণ করত সত্বর পুতিয়া ফেলিবে এবং বাটীর মলিন পদার্থ সকল যাহাতে নির্দ্দেশরূপে স্থানান্তরিত হয়, তাহার উপায় করিবে। বাটীর পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইবে।

(১১) সুবিধা হইলে অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে অন্য স্থানে প্রেরণ করিবে, কেন না ইহাদেরই সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইবার অধিক সম্ভাবনা।

(১২) এই সময়ে যদি কাহার সামান্য অসুস্থতা থাকে, তাহা উপেক্ষা না করিয়া তাহার প্রতিকার বিধানে যত্নবান হইবে।

(১৩) ভয় মনুষ্যকে যেরূপ দুর্ব্বল ও কার্য্যকরণে অশক্ত করে, এমন আর কিছুতেই নহে—ইহা সকলেই বিদিত আছে এবং দুর্ব্বল শরীরে সকল রোগই শীঘ্র তাহার কার্য্য করিয়া থাকে, সেই জন্য কদাচ ভয়ের বশীভূত হইবে না। চিন্তা ও উদ্বেগ দূর করিয়া বরং রোগের প্রতিকারের চেষ্টা করিবে, মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল, সংযত ও সৎকার্য্যে অনুরক্ত রাখিবে।

(১৪) রোগ-বীজ বা তাহার সংক্রামক-শক্তি-নিবারক নিম্নলিখিত কয়েকটী ঔষধ, যাহা সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা ব্যবহার করিবে।

(১) গন্ধক পোড়াইবে, কিন্তু কেহ যেন উহার ধূম গ্রহণ না করেন। গৃহের রঙ্গিন বস্ত্রাদি স্বতন্ত্র রাখিবে, কেননা উহার বর্ণ ইহার ধূমে বিবর্ণ হইতে পারে।

(২) কারবলিক এ্যাসিড কোন অনাবৃত পাত্রে রাখিয়া রোগীর ঘরের এক পার্শ্বে স্থাপন করিবে।

(৩) হীরাকস, চূণ, ফিট্‌কিরি, তুঁতে এবং কারবলিকএ্যাসিড রোগীর মল মূত্রে মিশাইয়া স্থানান্তরিত করিবে।

উপরোক্ত ব্যবস্থা সকল পালন করা সকলেরই আয়ত্বাধীন। মনোযোগ ও সাবধানতার সহিত উহা প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করিলে যে অনেক অনিষ্ট নিবারণ হইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আশা করি, ব্যবস্থাগুলি অনেকের নিকট পুরাতন কথা বলিয়া কেহ অবহেলা করিবেন না। এরূপ অনেক পরিচিত সত্য কার্য্যে পরিণত করি না বলিয়াই আমরা অনেক দুঃখ কষ্ট পাইয়া থাকি।

শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মিত্র।

হরগৌরী।

সীমা প্রকৃতি, অসীম পুরুষ। প্রকৃতি বৈচিত্র্য-জননী, সীমা রূপ-মাতা। পুরুষ নির্গুণ, অসীম অরূপ। যে শক্তির গর্ভ হইতে বিচিত্র সৃষ্টির বাহ্যপ্রকাশ হইয়াছে, সাংখ্যকার সেই আদিম মূল মহাশক্তিকে প্রকৃতি বলিয়াছেন। গুণাতীত পুরুষকে প্রকৃতির পরিচালক বলিয়াছেন। অন্ধ-পঙ্গু ন্যায়ের উদাহরণ দ্বারা এ কথা সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়াছেন। কার্য্যক্ষম অন্ধ মনুষ্যের স্কন্ধে কার্য্যাক্ষম চক্ষুষ্মান্ পঙ্গু উপবিষ্ট হইলে, তদুভয় দ্বারা যেরূপ ব্যাপার সম্পন্ন হয়, প্রকৃতি পুরুষের যোগে তাহাই হইতেছে। সাংখ্যকার পুরুষ প্রকৃতিকে অচ্ছেদ্যসম্বন্ধ-নিবদ্ধ বলিয়াছেন।

পরিচালন এবং ধারণ, এই দুইয়ের রূপগত পার্থক্য আছে কিন্তু প্রকৃতিগত পার্থক্য নাই। আমি প্রভাতের বাগান হইতে একটী গোলাপ ছিঁড়িয়া লইলাম, পরে আমি যেখানে যেখানে গেলাম ফুল আমার সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল স্থানেই গেল। অনিচ্ছা সত্ত্বে কিম্বা ইচ্ছা সত্ত্বে গোলাপকে লইয়া এইরূপে নানাস্থানে বেড়াইলে ফল একই হইবে। এখানে আমি গোলাপটীকে ধারণ করিয়াছি বা বহন করিতেছি কিম্বা পরিচালন করিতেছি, যাহাই বলি না কেন, প্রকৃতপক্ষে কার্য্য একই হইতেছে। কিছু ধারণ করিলেই তাহা পরিচালিত হয়, পরিচালন করিতে গেলেই ধারণ করিতে হয়। একটী বস্তুকে স্থিরভাবে হাতে করিয়া রাখিলেও তাহা পরিচালিত হয়। কারণ তাহার স্বাভাবিক গতি ছুটিয়া চলিয়া যাইবার, কিন্তু আমি

তাহাকে আমার দিকে টানিয়া রাখিয়াছি। ইহাদ্বারা তাহাকে আমার দিকেই চালাইতেছি। ক্রিয়ার বাহ্য-প্রকাশ মাত্র ঘটিতেছে না।

অশ্বাদি যখন চালাই, তখন মুখরজ্জু প্রভৃতি দ্বারা তাহাকে ধরি। যখন কোন বাহিরের উপায়ে তাহাকে না ধরিয়া তাড়াইয়া লইয়া যাই বা স্বেচ্ছামত চালাই, তখনও একরূপ ধারণের কাজ হয়। আমার শক্তি দ্বারা যখন অপরের শক্তিকে বাধা দেই, তখনই আমার ধারণ করা হয়। কখনও শারীরিক শক্তি দ্বারা, অপরের শারীরিক বা মানসিক শক্তিকে বাধা দিয়া থাকি। উভয় প্রকার বাধারই ফল অপরের গতি পরিবর্ত্তন করা। যে গতিকে পরিবর্ত্তন করা হয়, তাহা কখনও শারীরিক, কখনও বা মানসিক হইয়া থাকে। স্থূল কথা পরিচালন এবং ধারণ দুইটী শব্দ হইলেও ইহাদের প্রকৃতি একই।

সীমা ছাড়া বৈচিত্র্য সম্ভবপর নয়। বহুসংখ্যক বিশেষ বিশেষ আকারের সম্মিলনেই বাহ্য জগতের বৈচিত্র্য ফুটিয়াছে। সাধারণ হইতে বিশেষ নির্দ্ধারণ করিতে হইলেই, সীমা বা অবচ্ছেদের প্রয়োজন হয়। আবার বৈচিত্র্যই সৃষ্টি। সৃষ্টির অপর কোন অর্থ হইতে পারে না। সুতরাং সীমাই সৃষ্টির প্রতিপাদক।

শুধু সীমা হইলেও হয় না, অসীম চাই। অসীমই সৃষ্টিকে ধারণ করিয়াছে। সীমা বৈচিত্র্য সম্পাদন করে। কিন্তু ধারণ করিতে পারে না। কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট সীমা দ্বারা এক গৃহ হইতে অপর গৃহ, এক বাটী হইতে অপর বাটী, এক গাছ হইতে অপর গাছ, এক মানুষ হইতে অপর মানুষ বিভিন্ন করিয়া বুঝিতে পারি। কিন্তু সীমাবিশিষ্ট পদার্থগুলি একটা অসীমের বক্ষে অবস্থিতি করিতেছে।

অসীম আছে বলিয়াই সৃষ্টি হইয়াছে, সীমা আছে। অসীমই নিজ দেহে সীমাকে ধরিয়া আছে। কিন্তু আমরা সীমাই চিনি। আমরা যাহাকে অসীম বলি, তাহা সুবিস্তৃত সীমা মাত্র। আমাদের মনের প্রকৃতি স্থিতিশীল। আমরা সম্পূর্ণ অনবস্থাতে উপস্থিত হইতে পারি না। যতই দূরে যাই না কেন, অবশেষে একটী অবস্থা কল্পনা না করিয়া থাকিতে পারি না। নতুবা আমাদের বক্ষ ফাঁক ফাঁক বোধ হয়। যেন দম বন্ধ হইয়া আসে। মন-বিহঙ্গ খুব সুতীক্ষ্ণ কল্পনার পাখায় ভর করিয়াও সীমার শেষ সীমা ছাড়াইয়া অসীমে পৌঁছিতে পারে না। সীমার শেষ সীমাকেই অনেক সময় আমরা অসীম—অসীম—অসীম—বলিয়া আস্ফালন করিয়া থাকি। মনুষ্য বুদ্ধি সীমাবোধের অতীত নয় বলিয়াই, জড় জগতে পরমাণুর, আধ্যাত্মিক জগতে মনগড়া ঈশ্বরের সৃষ্টি করিয়াছে। কালবশে জড়জগৎ হইতে পঞ্চভূত গিয়াছে, আটষট্টিভূত গিয়াছে, ইথার গিয়াছে, এক সর্ব্বব্যাপী শক্তিতে তৎসমস্তই সমাহিত হইয়াছে। আবার এক জীবন্ত মহতী ইচ্ছার বক্ষে সেই এক সার্ব্বভৌম শক্তিরও সমাধি প্রস্তুত হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক জগৎ হইতেও গাছ, পালা, মাটী, পাথর, নদী, নালা, আগুন, বাতাস, বিদুরিত হইয়াছে, পুতুল গিয়াছে, জড় শক্তি গিয়াছে, মানবীয় শক্তিও বিতাড়িত হইয়াছে, এ সকলই সর্ব্বশক্তিমান, অনন্ত দয়াবান সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মাগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়াছে।

বলি, এই করিয়াই কি মানুষ সীমার অতীত হইতে পারিয়াছে? কি করিয়া একথায় সায় দিব? যত শক্তি জ্ঞান বা অনুমান করিতে পার, তৎসমুদয় একত্র করিলে যে একটী শক্তি সমষ্টি হয়, তাহার নামই ত সর্ব্বশক্তি? যত জানিবার বিষয় আছে বলিয়া তুমি অনুমান বা কল্পনা করিতে পার তৎসমুদয়ের সম্পূর্ণ জ্ঞানই ত সর্ব্বজ্ঞান? যদি বল যে, আমার অনুমানাদির অতীত কি শক্তি বা জানিবার বিষয় নাই? এ কথার উত্তর দিতে তোমার বা আমার অধিকার নাই। কারণ, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া আমরা হাঁ বা না কথা ব্যবহার করিব, তাহাই যে আমাদের অনুমান, বা কল্পনার অন্তর্ভূত হইয়া যাইবে। বিশেষতঃ "সর্ব্ব" এই কথাটী দ্বারা যখন একটী সুস্পষ্ট পরিমাণ পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিতেছ, তখন তোমার আপত্তি কি করিয়া শুনিব? স্থূল কথা এই, সর্ব্বশক্তি বা সর্ব্বজ্ঞ এই দুইটী কথা দ্বারা কোন বিষয়ে কোন কিছুর অসীমত্ব প্রতিপাদিত হয় না। যদি বল, সর্ব্বের পরিবর্ত্তে যদি অসীম বা অনন্ত এই দুইটীর মধ্যে কোন একটী কথা ব্যবহার করি? তোমার আমার মুখ বিনিঃসৃত বা জ্ঞানসম্ভূত সর্ব্ব এবং অসীম, অনন্ত একই অর্থবোধক। কারণ, অসীম বা অনন্ত কথাও আমরা সর্ব্বের ন্যায় সুবিস্তীর্ণ পরিমাণার্থেই ব্যবহার করিয়া থাকি। এইরূপে আমরা দয়াটাকেও অসীম, অনন্ত প্রভৃতি কথা দ্বারা খুব বড় করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হয় না। বস্তুতঃ এসকল গুণযুক্ত ঈশ্বরও মন গড়া বস্তু।

এখন বলিতে পার, যদি সীমা বা অনন্ত মনুষ্যবুদ্ধির অতীতই হয়, তবে তুমি অসীম— অসীম—, অনন্ত—, অনন্ত—, বলিয়া একটা ভীষণ কলরব করিতেছ কেন? তুমিও ত মানুষ? আমি বলিতেছি, অসীম আমাদের বুদ্ধির অতীত, ধারণার অতীত, জ্ঞানের অতীত। অসীম আমার বুদ্ধি বা জ্ঞানগোচর, একথা আমি বলিতেছি না। বলিতেছি, আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধারণার অতীত যাহা অর্থাৎ যাহা বুঝি না, জানি না, ভাবিতেও পারি না, তাহার একটা নাম যদি রাখিতে ইচ্ছা কর, তবে অসীম বা অনন্ত এই নাম ব্যবহার করিতে পার। তবে ঈশ্বরকে এই অর্থেই অসীম বলি না কেন? তাহা বলিতে পার। অর্থাৎ যাঁহাকে জানি না, বুঝি না, ধারণা করিতে পারি না অর্থাৎ "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ" তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতে পার। কিন্তু জ্ঞান, শক্তি বা দয়াকে তুমি অসীম বলিলে, অসীমের এখনকার এই অর্থ থাকে না। কারণ ও সকল তোমার জানা বিষয়। ও সকলকে বড় করিতে করিতে সীমার শেষ সীমা পর্য্যন্ত বাড়াইতে পার। কিন্তু অবস্থা হইতে অনবস্থায় নিয়ে ফেলিতে পার না। কারণ, সেখানে তোমার মস্তিষ্ক যাইতে পারে না। ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অতএব এইমাত্র যাহাকে অসীম ঈশ্বর বলা হইল, তাঁহার উদ্দেশে সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, অনন্তকরুণাময় এই সকলজাতীয় বিশেষণ ব্যবহৃত হইতে পারে না। কারণ এই গুলির বাচ্য পদার্থ এবং তিনি বিভিন্ন। অতএব ঈশ্বর এই নামটীও ব্যবহার না করিলে ভাল হয়। শুধু অসীম বা ব্রহ্ম বলিলেই ঠিক হয়। ব্রহ্ম এই কথার প্রকৃত বাচ্য অসীম এবং অসীমের প্রকৃত বাচ্য ব্রহ্ম। এই জন্য

আর্য্য ঋষিগণ আধ্যাত্মিক জগতে অগাধ জ্ঞানরাশি উপার্জ্জন করিয়া শেষটা বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম নির্গুণ।" বলিয়াছেন, "যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ" তিনিই ব্রহ্ম বা অসীম পুরুষ। সমস্ত শূন্যের সহিত বিশ্বসৃষ্টি ইহাঁতেই অবস্থিত রহিয়াছে এবং ইনিই এই সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সূর্য্য চন্দ্র তারা খচিত নীল নভস্তল, গোলাপ যূঁই বেল মালতী গন্ধরাজ চামেলি প্রভৃতি অগণ্য অসংখ্য পুষ্প রাজিতে ভূষিত, স্নিগ্ধ সবুজ তরু লতা সৌধবিমণ্ডিত, সমুদ্র নদী তড়াগ হ্রদসমন্বিত, নীল ধবল গিরিরাজি এবং উৎস ঝরণালঙ্কৃত, বিহঙ্গ কলরব-কূজিত এই ঐশ্বর্য্যময়, সৌন্দর্য্য ময়, আনন্দ সুখময়, বিচিত্র ধরাধাম, সকলই ইহাঁকে অবলম্বন করিয়া স্ব স্ব সত্বায় বিরাজ করিতেছে। ইনিই হর।

ইনি রূপের অতীত বা অরূপ। সমস্ত রূপরাশি এখানেই বিধ্বস্ত হইয়াছে। রূপ বা স্থূলত্ব কিম্বা সীমাকে হরণ করিয়া— আপনাতে বিলীন করিয়া ইনিই হর এই আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি যেমন সমগ্র সৃষ্টিকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, তেমনই সকল বিশেষত্বকে সাধারণত্ব বা একত্ব হইতে বিভক্ত করিয়াছেন। বিভক্ত বিশেষ বস্তু সকলের আধার এবং অবকাশ এই অসীম। সুতরাং ইনিই হর। ইনিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করিয়া সকলের সকল প্রকার বিঘ্ন বিপদ ভয় হরণ করিয়াছেন। অতএব ইনিই হর। অরূপ গুণাতীত হর শুভ্রবর্ণ বা অম্বর বর্ণ কল্পিত হইয়াছেন। হরের বীজমন্ত্র ব্যোম। ভক্ত কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে আকাশরূপে ধ্যান করিতে হইবে।

গৌরী বা প্রকৃতি কে? প্রকৃতি, সীমা—বৈচিত্র্য-জননী, রূপ-মাতা। যাহা আমাদের জ্ঞাত, যাহা আমরা বুঝি, ধারণা করিতে পারি, ভোগ করিতে পারি, তাহাই সীমা। যে ঋষি বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ" তিনিই বলিয়াছেন, "আনন্দম্ ব্রহ্মণোবিদ্বান ন বীভেতি কুতশ্চনম।" অসীম বা ব্রহ্ম হইতে যে চিদানানন্দ ধারা নিত্য কাল প্রবাহিত হইতেছে আমরা কেবল তাহাই জানি, তাহাই প্রাণে ধারণ করিতে পারি, তাহাই ভোগ করিয়া, পান করিয়া বাঁচিয়া আছি। আনন্দ কাহাকে বলি? যাহা চিৎ অর্থাৎ আলোকময়। আলোকই রূপ, আলোকই বৈচিত্র্য, আলোকই সৃষ্টি। আনন্দের আরও লক্ষণ আছে। আনন্দ নিত্যোচ্ছ্বাস বা নিত্যতরঙ্গময়। পলকে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সমাধা করাই তাঁহার কার্য্য অথবা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় আনন্দ মহাসমুদ্রের বুদ্‌বুদ্ মাত্র। আমাদের এই ক্ষুদ্র অকিঞ্চিৎকর মানবহৃদয়মধ্যে যে বিন্দু আনন্দের আভাস পাই, তদ্দারাই সকলে আপনার আপনার ভিতরে এ কথার জাজ্বল্যমান প্রমাণ পাইতে পারিবেন। সুতরাং অন্য প্রমাণ প্রয়োগের কোন প্রয়োজন নাই।

এখন দেখা যাইতে
হইতে এই বিচিত্র সৃ
য়াছে, সেই আদি
চিদানন্দ। '
সীমা, আন
কবি গৌ
প্রতিমা
ইয়াছে
কাব

[illegible] গৌরী কে ? ঘনীভূত আনন্দ—[illegible]—বিশ্বব্যাপী ব্রহ্ম-প্রেম। [illegible]—আদ্যাশক্তি কেন ? গৌরী হইতেই এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডাদি সমুদ্ভূত ও প্রকাশিত, গৌরীই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় কারিণী, চিদ্ঘনানন্দ বা প্রেমই ব্রহ্মের শক্তি। গৌরী সেই আনন্দময়ী—প্রেমময়ী। তাই তিনি মহাশক্তি—আদ্যাশক্তি। সত্যযুগে যিনি গৌরী, দ্বাপরে তিনিই রাধিকা। গৌরীর জন্য ভোলা পাগল, রাধার জন্য শ্যামরায় কদমতলে দাঁড়াইয়া যমুনার জল উজান বহাইয়া দিনরাত বাঁশীর স্বরে কাঁদিয়াছেন। এ কেমন সুন্দর সঙ্কেত! যাঁহাকে সৃষ্টির মধ্য দিয়া, সীমার শেষ সীমায় পৌছিয়া, মস্তিষ্ক ঘুরাইয়া, বুদ্ধি বিদ্যা একবারে ক্ষয় করিয়া ধরিতে পারিলে না, দেখ তিনি এই প্রেম ডোরে বাঁধা, এই প্রেম পিঁজরায় আপনি ধরা দিয়াছেন। সাধে বলে, "ভক্তের অধীন ভগবান ?"

শ্রীবিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায়।

ইংরাজ-শাসনে বঙ্গসাহিত্য।

(৩য় প্রস্তাব।)

এই বার আমরা পুরাতন সাহিত্য-জগতের সীমা উত্তীর্ণ হইয়া নূতন সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করিলাম। এই সময় হইতে ভাগীরথী-বক্ষে টেম্‌সের তরঙ্গ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইল। ইংরাজী ভাব, ইংরাজী চিন্তা বাঙ্গালী লেখকের হৃদয়ের উপর সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিল। বাস্তবিক [illegible], এই সময় হইতে বর্ত্তমান মহা সাহিত্যের সূত্রপাত হইল। যাঁহারা [illegible]হিত্যের সৃষ্টি ও পুষ্টি-[illegible]দের বিষয় সংক্ষেপে [illegible]। প্রথমে আমরা [illegible] পুরুষ শ্রীযুক্ত [illegible]গর নিকট [illegible]বর সহিত [illegible] ইচ্ছা [illegible]

[illegible]র,

বঙ্গের সাহিত্য-গুরু শিষ্ট, সদালাপী,
দীক্ষাপথে বৃদ্ধ ঠাকুর, স্নেহে জ্ঞান-বাপী।
উৎসাহে গ্যাসের শিখা, প্রাচ্যে শাল কড়ি,
কাঙ্গাল বিধবা বন্ধু, অনাথের নড়ি।
প্রতিজ্ঞায় পরশুরাম, দাতা কর্ণ দানে,
স্বাতন্ত্রে শেঁকুল কাটা, পারিজাত ঘ্রাণে।
ইংরেজির ঘিয়ে ভাজা সংস্কৃত "ডিস্"
টোল স্কুলী অধ্যাপক দুয়েরই "ফিনিশ।"

এই বিস্তীর্ণ বঙ্গ-সমাজে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম কয়জনের নিকট অপরিচিত আছে ? আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের নিকট তিনি পরিচিত। কেন হইবেন না ? যাহার হৃদয় বঙ্গের হতভাগিনী বিধবা ও বহুবিবাহ নিপীড়িতা দুঃখিনী কুলীন কামিনী কুলের দারুণ দুরবস্থায় একান্ত কাতর; যাঁহার নিয়মিত মাসিক দান পাঁচ শত মুদ্রারও অধিক; যিনি গভর্ণমেন্টের মুখাপেক্ষী না হইয়া, ইউরোপীয় অধ্যাপকের সাহায্য গ্রহণ না করিয়া, দেশের মধ্যে

একটী অত্যুৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর কলেজ সংস্থাপন দ্বারা ভারতবাসীগণের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন; যিনি বাল্যকালে নিতান্ত দারিদ্রের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়া, কেবলমাত্র স্বীয় অধ্যবসায় ও আত্ম-নির্ভর গুণে স্বদেশ-বাসীগণের মধ্যে অতি উচ্চাসন লাভে সমর্থ হইয়াছেন; যাঁহার ন্যায় তেজস্বী, কর্ত্তব্য-পরায়ণ, স্বাধীন-চেতা সংস্কারক বঙ্গদেশে নিতান্ত বিরল এবং সর্ব্বোপরি যিনি বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের জনক, তাঁহাকে চিনে না কে? অধিক কি, তৈজসে তাঁহার নাম, বস্ত্রে তাঁহার নাম

"সুখে থাকুক্ বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে,
সদরে কর্‌ছে রিপোর্ট বিধবার হবে বিয়ে।
কবে হবে সেদিন, প্রকাশিবে এ আইন,
দেশে দেশে জেলায় জেলায় বেরবে হুকুম,
বিধবা নারীর বিয়ে লেগে যাবে ধুম।
মনের সুখে থাক্‌ব মোরা মনোমত পতি লয়ে।
এমন দিন কবে হবে, বৈধব্য-যন্ত্রণা যাবে,
আভরণ পরিব সবে, লোকে দেখ্‌বে তাই—
আলো চাল, কাঁচ কলা, মাল্‌সার মুখে দিয়ে ছাই,
এয়ো হ'য়ে যাব সবে বরণ ডালা মাথায় ব'য়ে।"

১২৫৪ সাল বঙ্গ সাহিত্যের চিরস্মরণীয় বৎসর। এই সালে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার সর্ব্বপ্রথম পুস্তক "বেতাল পঞ্চবিংশতি" প্রণয়ন করেন। ইহা হিন্দী পুস্তকের অনুবাদ। এই গ্রন্থে বিশুদ্ধ প্রণালীতে গদ্য লিখিবার যেরূপ প্রথা অবলম্বিত হইয়াছে, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ নিজের। মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্ত ভিন্ন আর কেহই ইতিপূর্ব্বে এ প্রকৃতির গদ্যে প্রস্তাব রচনা করিতে পারেন নাই। "বেতাল পঞ্চবিংশতির" ভাষা তাঁহার অন্যান্য পুস্তকের ভাষার ন্যায় মধুর হয় নাই। ইহার পর তিনি উপর্য্যুপরি নিম্ন-লিখিত গ্রন্থ গুলির রচনা করেন।—মার্শমান সাহেব প্রণীত History of Bengal এর অনুবাদ; Chamber's Biography হইতে সঙ্কলিত "জীবনচরিত" Chamber's Rudiments of Knowledge অবলম্বনে লিখিত 'বোধোদয়' "উপক্রমণিকা ব্যাকরণ," ১ম, ২য়, ৩য় ভাগ "কৌমুদী ব্যাকরণ" পঞ্চতন্ত্র, রামায়ণ, হিতোপদেশ, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারত হইতে সঙ্কলিত তিনভাগ "ঋজুপাঠ", কালিদাস কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তলের উপাখ্যান ভাগ অবলম্বনে লিখিত "শকুন্তলা" "বিধবা-বিবাহ বিষয়ক ১ম ও ২য় পুস্তক; দুইভাগ বর্ণ পরিচয়, Esop's Fables অবলম্বনে লিখিত "কথামালা," "চরিতাবলী" "সংস্কৃত-ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব," সংস্কৃত মহাভারত আদিপর্ব্বের অনুবাদ; উত্তর-চরিত ও রামায়ণ হইতে অনুবাদিত ও সঙ্কলিত "সীতার বনবাস"; বিবিধ ইংরাজী পুস্তক হইতে সঙ্কলিত দুই ভাগ" আখ্যান-মঞ্জরী", "ব্যাকরণ কৌমুদী" ৪র্থ ভাগ; Shaksepeare's Comedy of Errors এর উপাখ্যান ভাগ অবলম্বনে লিখিত "ভ্রান্তি-বিলাস," বহুবিবাহ হওয়া উচিত কিনা," এবং উত্তর রামচরিত, মেঘদূত, শকুন্তলা প্রভৃতির সটীক সংস্করণ সর্ব্বশুদ্ধ ৩০ খানি পুস্তক তাঁহার এ প ... কাশিত হইয়াছে।

বিধব'
পুস্তকগু
ধারণ
শাস্ত্রজ্ঞ.

এরূপ পুস্তক ভাষার গৌরব স্বরূপ। বিধবা-বিবাহ বিষয়ক পুস্তকের শেষভাগ এরূপ সকরুণ ভাষায় লিখিত যে, তাহা পাঠ করিতে নিতান্ত পাষাণ হৃদয়ও একেবারে দ্রবীভূত হইয়া যায়। "সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব"টী আদ্যন্ত মৌলিক। ইহা বঙ্গভাষার এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। আমাদের বিবেচনায় "সীতার বনবাস" বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার ভাষা যেরূপ সুধাবর্ষিণী, রচনাও সেইরূপ হৃদয়গ্রাহিণী। কয়েকটী স্থলের রচনা ভিন্ন ইহাকেও মৌলিক গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিলে বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয় যে বিদ্যাসাগর মহাশয় করুণ রসের অবতারণায় অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন। তাহার আর অধিক আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। শিক্ষিত বঙ্গবাসীর মধ্যে এমন একজনকেও দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত কোন না কোন পুস্তক পাঠ করেন নাই। ইংরাজীতে যাঁহাকে Self-made man বলে, বঙ্গদেশে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহার এক উজ্জ্বল উদাহরণ।

এইবার আমরা যে মহাত্মার নিকট উপস্থিত হইতেছি, তাঁহার কথা মনে হইলে কোনক্রমেই অশ্রুজল সম্বরণ করা যায় না। কি পরিতাপের বিষয়! যিনি দ্বাদশ বর্ষকাল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সর্ব্ব প্রথম সম্পাদকীয় ভার গৌরবে সহিত বহন করিয়াছেন, যাঁহার পী[illegible] ন্দিনী রচনা পাঠের [illegible] ষ্ট ভাষা- [illegible] বঙ্গবাসী- [illegible] া, যিনি [illegible] সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত সমস্ত রজনী লেখনী হস্তে অতিবাহিত করিয়া, পূর্ণযৌবনেই উৎকট শিরোরোগে আক্রান্ত হইয়া, অবশিষ্ট জীবন নিতান্ত হতভাগ্যের ন্যায় যাপন করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী লেখকের মধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রথম নীতি-শিক্ষক, এবং বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যিনি সেই রোগ জীর্ণ শরীরে মৃতকল্প অবস্থায়, ২য় ভাগ "উপাসক সম্প্রদায়" স্বরূপ মহামূল্য রত্নহার বাঙ্গালীজাতির কণ্ঠদেশে বিলম্বিত করিয়া দিয়া, কীর্ত্তিদেবীর চিরানুগ্রহ-ভাজন হইয়াছেন এবং স্বদেশবাসীগণের অপকট কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক শ্রদ্ধার পবিত্র কুসুমাঞ্জলী লাভে সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়াছেন, সেই মহাপুরুষের নাম কি শিক্ষিত বঙ্গবাসীর অবি[illegible]াছে? তিনিই প্রথিত নামা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়। শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম প্রথম ইঁহার রচনা সংশোধন করিয়া দিতেন; কিন্তু ক্রমশঃ দত্ত মহাশয়ের রচনা এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়া উঠিল যে, আর কাহারও সংশোধনের অপেক্ষা রহিল না। তিনি "তত্ত্ববোধিনী" পত্রিকা ও "প্রভাকর" হইতে স্বপ্রণীত প্রবন্ধাবলী সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত আটখানি পুস্তক মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। তিন ভাগ "চারুপাঠ", দুই ভাগ "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার" "ধর্ম্মনীতি" 'পদার্থবিদ্যা' এবং প্রথমভাগ "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়।" শুনিয়াছি তিনি বাল্যকালে কবিতা লিখতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। কিন্তু কবি-কেশরী ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বিবেচনা করিয়া তাহা হইতে বিরত হন। কেহ কেহ বলেন, তিনি "অনঙ্গমোহন" কাব্য-প্রণয়ন করিয়াছেন।

তাঁহার তিনভাগ চারুপাঠ দেশ মধ্যে এত দূর প্রচলিত যে, এস্থলে তাহাদের পরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। এই সকল প্রবন্ধ যে বিবিধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে তাহা তিনি স্বয়ং বিজ্ঞাপনে বলিয়া না দিলে কেহই এ গুলিকে মৌলিক রচনা বলিতে সঙ্কুচিত হইত না। এই বিশ্বরাজ্য যে কিরূপ প্রকাণ্ড এবং ইহা ভগবানের যে কেমন বিচিত্র লীলাস্থল, তাহা চারুপাঠ রচয়িতা বাঙ্গালীকে সর্ব্ব প্রথম বুঝাইয়া দিয়াছেন। জনক জননী যেমন কোন গুরুতর বিষয় বুঝাইয়া দিয়া সন্তানের কৌতূহল চরিতার্থ করেন, মহামতি অক্ষয়কুমার দত্ত সেইরূপ, যে এক অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ স্রষ্টা সৃষ্টের মধ্যে অদৃশ্যভা [illegible] বিরাজ করিতেছে, তাহা বাঙ্গালী পাঠকে[illegible] বুঝাইয়া দিয়াছেন। বিশেষতঃ তৃতীয় ভাগ চারুপাঠ মধ্যে বর্ণিত "ব্রহ্মাণ্ড কি প্রকাণ্ড" "মিত্রতা" এবং "স্বপ্নদর্শন" বিষয়ক প্রস্তাবত্রয়, যিনি মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে, বঙ্গ-সাহিত্যে অক্ষয় বাবুর কি অসামান্য অধিকার! বাহ্য-বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার দুই ভাগ জর্জ কুম্ব সাহেব প্রণীত "Constitution of man" নামক পুস্তক হইতে সঙ্কলিত। ঈশ্বরের নিয়ম পরিপালনে সুখ এবং তাহার লঙ্ঘনে দুঃখ, এই দুরূহ তত্ত্ব এই গ্রন্থের প্রতি[illegible] বিষয়। তাঁহার ধর্ম্মনীতি [illegible] দম্পতির পরস্পর ব্যবহার পিত[illegible] র প্রতি সন্তানের এবং সন্তানের প্র[illegible] জননীর কর্ত্তব্য, শারীরিক ও [illegible] উন্নতি সাধন প্রভৃতি বিবিধ [illegible] বষয়ের উপদেশ আছে। তাঁহার [illegible] তবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় প্রথ[illegible] [illegible]ণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন "মহাশয় বলেন, H. H. Wilson সাহেব Asiatic Research "এবং" Religious sects of the Hindus" নামক যে একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, অক্ষয়বাবু তাহাই অবলম্বন করিয়া "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" ১মভাগ রচনা করিয়াছেন। এইজন্য ন্যায়রত্ন মহাশয় নারপর নাই দুঃখিত ও লজ্জিত। কিন্তু আমরা বহু অনুসন্ধানেও পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের এই গভীর দুঃখ ও লজ্জার মূলকারণ বাহির করিতে পারিলাম না বলিয়া ততোধিক দুঃখিত ও লজ্জিত আছি। Wilson সাহেবের উল্লিখিত প্রবন্ধের ছায়ায় উপাসক সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে স্বীকার করিলেও ইহাতে দত্ত মহাশয়ের নিজের সম্পত্তি এত প্রচুর পরিমাণে আছে যে, ইহাকে মৌলিক গ্রন্থ বলা যায়, কোনরূপ দুঃখ বা লজ্জার কারণ নাই, একথা সাহসপূর্ব্বক ন্যায়রত্ন মহাশয়ের গোচর করিতেছি। বিশেষতঃ এই পুস্তকের প্রারম্ভে ১০৬ পৃষ্ঠা দীর্ঘ যে একটী উপক্রমণিকা সংযুক্ত আছে; তাহাতে দত্ত মহাশয়ের পাণ্ডিত্য ও লিপি নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইবার আমরা বঙ্গভাষার অক্ষয় গৌরব-স্তম্ভ স্বরূপ ২য় ভাগ "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের" নিকট উপস্থিত হইলাম। ইহা ৬১৪ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। ইহার মধ্যে ২৮২ পৃষ্ঠা উপক্রমণিকা দ্বারা অধিকৃত। এই প্রকাণ্ড পুস্তক যেরূপ শারীরিক অবস্থায় বিরচিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে বিস্ময় ও ভক্তিরসে মন একেবারে আর্দ্র হইয়া যায় এবং তাঁহার ন্যায় মহাত্মা এবম্বিধ পরিণাম স্মরণ করিয়া হৃদয় [illegible]

ও কাতর হইয়া উঠে ও কোন রূপেই উচ্ছ্বলিত শোকাশ্রু সম্বরণ করা যায় না। তিনি এই সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, সুদীর্ঘ হইলেও তাহার কোন কোন স্থল উদ্ধৃত না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। দত্ত মহাশয়ের লিখিতেছেন—

"এবার এই পর্য্যন্ত। আর চলিয়া উঠিতেছে না। শরীরের যেরূপ শোচনীয় অবস্থায় এতদূর চলিল, তাহা কি বলিব? না লিখন, না পঠন, না চিন্তন, না গ্রন্থ-শ্রবণ, কোনরূপ মানসিক ও শারীবিক কার্য্যেই আমি সমর্থ নহি। ইহার কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত মাত্রেই মানসিক কষ্ট হইতে থাকে। এরূপ অবস্থায় এ ভাগের কি রচনা কি শোধন, কি মুদ্রাঙ্কন, যে কিছু কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার প্রতি একটী বারও নেত্রপাত করিতে পারি নাই। অনেক সময়ে অনেকানেক প্রগাঢ় ভাব সম্বলিত চিন্তা প্রবাহ প্রবাহিত হইয়া মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য ক্ষয় করিতেছে স্পষ্ট অনুভব করিতেছি, তথাপি তাহা নিবারণ করিবার সামর্থ থাকে না। কষ্ট হয় বলিয়া অন্যমনস্ক হইবার উদ্দেশে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় অবলম্বন করি, কিছুতেই সে চিন্তার স্রোত মন্দীভূত হয় না। যতক্ষণ সে সমুদায় এবং যাহা কিছু অল্পরূপে জানিতে পারি, তাহাও লিপিবদ্ধ করা না হয়, ততক্ষণ মস্তিষ্ক মধ্যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইতে থাকে। আমার কর্ম্মচারীকে অথবা অন্য কোন ব্যক্তি নিকটে থাকিলে তাঁহাকে লিখিয়া রাখিতে বলি। কেহ নিকটে না থাকিলে যান বাহন দ্বারা দূরস্থিত বন্ধু বিশেষের সমীপে গমন পূর্ব্বক লিখিতে অনুরোধ ... যাহার যত্ব ণত্ব জ্ঞান কিছুমাত্র নাই অপার্য্যমানে কখন কখন এরূপ অশিক্ষিত ও অযোগ্য লোকের দ্বারাও লিখাইতে হইয়াছে। অৰ্দ্ধরাত্রেও নিদ্রা-কাতর কর্ম্মচারীকে আহ্বান করিয়া, কতবার কত বিষয়ই লিখাইতে হইয়াছে। নতুবা উপস্থিত বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আন্দোলন হইয়া সে রজনীতে নিদ্রার সম্ভাবনা থাকিত না। মনোমধ্যে এরূপ কোন বিষয়ের উদয়েও কষ্ট, তাহার চিন্তন ও আন্দোলনেও কষ্ট নিজে দূরে থাকুক, অন্যদ্বারা তাহা লিপিবদ্ধ করাইতেও কষ্ট, এবং যে পর্য্যন্ত তাহা লিপিবদ্ধ করা না হয়, সে পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অধিক কষ্ট অনুভূত হইতে থাকে। সেই যন্ত্রণা নিবারণ উদ্দেশেই লিপিবদ্ধ করাইতে হইয়াছে এবং ইহাতে অতীব অল্পে অল্পে পুস্তকখানি একরূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে। কোন বিষয়ের প্রমাণ প্রয়োগ উদ্দেশে কোন গ্রন্থার্থ অবগত হইবার প্রয়োজন হইলে, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করিতে হয়। তাহাই কি যে সে দিনে ও যে সে সময়ে শুনিতে পারি, না সমুচিত মনঃসংযোগ করিতেই সমর্থ হই? শরীরের অবস্থা অনুসারে দিন বিশেষ ও সময় বিশেষে ঔষধাদি ব্যবহার করিতে হইয়াছে। এইরূপ করিয়া কখন পাঁচ সাত পংক্তি, কখন দুই চারি পংক্তি, কখন দুই চারিটী বা দুই একটী শব্দমাত্র, এবং কদাচিৎ কিছু অধিক বিরচিত হইত। সেই সমস্ত একত্র সং ... রিয়া উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগে ... াংশ প্রস্তুত হইয়াছে। সেই সমুদায় ... ষ প্রথমে যথাস্থানে পর পর লিখি ... পাঠকগণ এরূপ মনে করিবেন না। ... বাক্যটী কোন স্থানে বা কোন বা ... নি-

বেশিত হইবে; উক্তরূপে লিপিবদ্ধ করাইবার সময়ে তাহা কিছুই স্থির থাকে না। সে সমুদায় যে দিবস একত্র সঙ্কলন করিতে হয়, সেই দিনই বিভ্রাট। পূর্ব্বোক্ত রূপে শরীরের অবস্থানুসারে, দিন বিশেষ ও সময় বিশেষে তদর্থ ঔষধবিশেষ সেবন ও অন্যান্য নানারূপ প্রক্রিয়া করিয়া বহুকষ্টে সেটী কথঞ্চিৎ সম্পন্ন করিয়াছি।"

তাহার পর দত্ত মহাশয় লিখিয়াছেন—"এ অবস্থায় গ্রন্থপ্রণয়নে অভিলাষ করা অনুচিত ও অসঙ্গত কার্য্য। ওদিকে চির জীবনে নিশ্চেষ্ট মনে কালহরণ করাও অসহ্য। যে গুরুতর বিষয়ে একবার কৃত সংকল্প হইয়াছি, পার্য্যমানে দূরে থাকুক অপার্য্যমানে তাহা পরিত্যাগ করা আমার পক্ষে অতীব কষ্টের বিষয়। এই নিমিত্তই এরূপ করিয়া কার্য্য সাধন করিতে হইয়াছে। যখন গুরুতর কার্য্যে মনঃসংযোগ করিবার পথ একেবারে বন্ধ হইল, মনোহর পূর্ব্ববাসনা সমুদায় স্বপ্নকল্পিত ব্যাপার হইয়া গেল, এবং অনেক বৎসর একাদিক্রমে নানা প্রকার চেষ্টা পাইয়াও যখন রোগের শান্তি হইল না, তখন কেবল ঔষধ সেবন পথ্য গ্রহণ দ্বারা রোগের সেবায় জীবন ক্ষেপ করা অপেক্ষা এরূপ কষ্ট স্বীকার তৃপ্তির বিষয়।"

অক্ষয় বাবু অন্যত্র লিখিয়াছেন—

"আমার জরাজীর্ণ কম্পবান, লেখনীকে আর একটীবারও নিজ হাতে ধারণ করিয়া মনের ক্ষোভ নিবারণ করিতে পারিলাম না। ষোড়শ বা সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে রীতিমত শিক্ষা আরম্ভ করিয়া, পঁইত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম অতীত না হইতেই দুর্জ্জয় রোগ প্রভাবে চিরদিনের মত অসমর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িলাম। যে সময়ে মনোমত কার্য্য সাধনের কেবল উদ্যোগ পাইতে ছিলাম, সেই সময়ে চিরজীবনের মত গুরু, লঘু সকল কর্ম্মেই অক্ষম হইলাম, তদবধি আমার বাসনা রূপ বৃক্ষ-বাটিকায় না ফল, না পুষ্প, আর কিছুই উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা রহিল না। শাখা পল্লবাদি সমস্ত শুষ্ক হইয়া গেল।*"

গ্রন্থকারের এই পরিদেবিত পূর্ণ আত্মবিবরণ পাঠ করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই লজ্জিত হওয়া উচিত। তিনি রুগ্ন শরীরে, ভগ্ন হৃদয়ে, ক্ষুণ্ণ প্রাণে জননী জন্মভূমির জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, আমাদের মধ্যে কয়জন স্বাস্থ্য সুখে সৌভাগ্যশালী হইয়া, তদনুরূপ কার্য্য করা দূরে থাকুক, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাবলী পাঠ করিয়া উঠিতে পারেন? ধিক্ আমাদিগকে! ধিক্ আমাদের শিক্ষাভিমানকে!

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "পদ্মিনীর উপাখ্যান" "শূর-সুন্দরী" "কর্ম্মদেবী" প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা; এইগুলি; ইতিবৃত্ত মূলক কাব্য। টড্ সাহেব প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাস হইতে এই সকল কাব্যের উপাখ্যানভাগ সংগৃহীত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় রঙ্গলালবাবুই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী কবির অনুকরণে কাব্য লিখিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ ধর্ম্ম, প্রেম ও সমাজ লইয়া কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। এ গুলি ব্যতীত অন্য বিষয় অবলম্বনে যে কবিতা রচিত হইতে

* ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের ন্যায়রত্নের মতের সমালোচনা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি প্রণীত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্তের ৮৫ পৃষ্ঠা দেখ।

পারে, তাহা তাঁহারা অবগত ছিলেন না। রঙ্গলাল বাবুই বঙ্গবাসীকে কাব্য লিখিবার স্বতন্ত্র বিষয় দেখাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার বিষয়—জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগ। "পদ্মিনীর উপাখ্যান', তাঁহার সর্ব্ব প্রথম ও সর্ব্ব প্রধান কাব্য। ইহাতে বিশুদ্ধ প্রণালীতে কবিতা লিখিবার রীতি বিশেষরূপ রক্ষিত হইয়াছে। পদ্মিনীর তেজস্বিতা ও সতী-ভাব সুন্দররূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। বঙ্গভাষায় ইহা এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য। নমুনা স্বরূপ কয়েক ছত্র উর্দ্ধৃত হইল—

যোগ্য পাত্রে মিলে যোগ্য, সুধা সুরগণ-ভোগ্য,
অসুরের পরিশ্রম সার।
বিকশিত তামরসে, অলি আসি উড়ে বসে,
ভেক-ভাগ্যে কেবল চীৎকার॥

পুনশ্চ—
অবলা তরলতৃণ তরঙ্গের প্রায়,
যেদিকে বাতাস বহে সেই দিকে ধায়।

অন্যত্র—
"অদূরে আরোহী তার, প্রদোষের পদ্মাকার,
আধ-বিমুদিত নেত্রে পড়ি।
যে তনু কাঞ্চন সম, ছিল প্রিয়া-প্রিয়তম,
ধূলায় যেতেছে গড়াগড়ি॥
যে অধর সুধাকর, যে নয়ন ইন্দীবর,
ছিল প্রেয়সীর প্রিয় ধন।
সেই অধরেতে আসি, বায়সী সুখেতে ভাসি,
চঞ্চে চঞ্চু করিছে ঘাতন॥

এক্ষণে আমরা বিষম সঙ্কট-স্থলে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। এইবার যাঁহার বিষয় উল্লেখ করিতে অগ্রসর হইতেছি, তাঁহাকে লইয়া দেশ মধ্যে বিলক্ষণ মতদ্বৈধ দৃষ্ট হয়। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে মহাত্মা মধুসূদন দত্তের সপক্ষ ও বিপক্ষ অনেক আছেন। শত্রু সংখ্যা অপেক্ষা মিত্র-সংখ্যা যে অনেক অধিক ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তবে পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় দ্বয়ের ন্যায় কাহাকেও মধুসূদন-সম্বন্ধে অযথা নিন্দাবাদ ঘোষণা করিতে দেখিলে, মনোমধ্যে বাস্তবিকই বিষম দুঃখের ও ক্ষোভের উদয় হয়। ন্যায়রত্ন মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ কৃতবিদ্য এবং মাতৃভাষার একান্ত অনুরাগী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইউরোপীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন, বাঙ্গালার অগ্রগণ্য লেখকগণকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে বোধ হয় তিনি সর্ব্বদা প্রস্তুত নহেন। রাজনারায়ণ বাবু সুশিক্ষিত, চিন্তাশীল এবং সুলেখক, তিনি কবির সহাধ্যায়ী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, "তিনি আনুবীক্ষণিক সমালোচনার অতিরিক্ত মাত্রায় পক্ষপাতী।

ষোড়শ বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিল, প্রাতঃস্মরণীয়, কবি-কেশরী মধুসূদন দত্ত ঐহিক তাবত্ জ্বালা যন্ত্রণার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া দিব্য-ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। এক্ষণে তৎ প্রণীত গ্রন্থাবলী সমালোচিত হইলে তাঁহার আর কোনরূপ ক্ষতি বৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। কেন না, সেই মহাপুরুষ এইক্ষণে পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। আমাদের প্রশংসা-বাদ আর তাঁহাকে হর্ষ-বিকশিত করিতে পারিবে না। আমাদের নিন্দা-ঘোষণায় তিনি আর বিষাদ-সঙ্কুচিত হইয়া পড়িবেন না। কিন্তু তাঁহার পুস্তক সমালোচনায় আমাদের বিলক্ষণ উপকার আছে। উপকার আছে বলিয়াই, আজ আমরা তল্লিখিত গ্রন্থাবলী

সম্বন্ধে কয়েকটী কথা অতি সংক্ষেপে বলিতে অগ্রসর হইলাম।

তিনি বার খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। চারি খানি নাটক—শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী ও মায়াকানন; দুই খানি প্রহসন—একেই কি বলে সভ্যতা? ও বুড় শালিখের ঘাড়ে রোঁ।

অমিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত তিনখানি কাব্য, তিলোত্তমা সম্ভব, বীরাঙ্গনা ও মেঘনাদ-বধ। মিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত ব্রজাঙ্গনা। ইংরাজি সনেটের অনুকরণে লিখিত চতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী,—এবং হেক্টর-বধ নামক এক খানি গদ্য কাব্য। ইঁহার নাটক সকল বঙ্গভাষার উৎকৃষ্ট নাটক। আমাদের বিবেচনায়, কৃষ্ণকুমারী নাটকের ভাষা, গভীর ভাবপূর্ণ, বঙ্গীয় নাটকাবলীর ভাষার আদর্শ হওয়া উচিত। নাটক গুলিতে কয়েকটী অতি সুন্দর সঙ্গীত আছে। প্রহসন দুইখানির মধ্যে "একেই কি বলে সভ্যতা" অতিশয় দক্ষতার সহিত লিখিত হইয়াছে! মধুসূদন ইংরাজী সনেটের নিয়মানুসারে বঙ্গভাষায় সর্ব্বপ্রথম চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। কবি যে সময়ে ফ্রান্স দেশের অন্তঃপাতী ভরসেলস্ নগরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের একশত দুইটী চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করিয়া মাতৃভাষানুরাগের সুস্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এবং এই গুলি এরূপ উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, আজিও বঙ্গভাষায় ইহাদের তুল্য সনেট লিখিত হয় নাই।

মধুসূদন গদ্য রচনায় কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি হোমর প্রণীত "ইলিয়দ" মহাকাব্যের উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া "হেক্টর-বধের" রচনা করিয়াছেন। ইহাতে প্রশংসা-যোগ্য বিষয় কিছুই নাই। সাহিত্য রচনায় যত প্রকার দোষ ঘটিতে পারে, তাহাদের একত্র সমাবেশ, বঙ্গভাষায় কেবল এই গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। আমার বিলক্ষণ ভরসা আছে, অতঃপর যাঁহারা বঙ্গভাষায় দোষ পরিচ্ছেদ লিখিবেন, তাঁহাদিগকে উদাহরণ সংগ্রহের জন্য আর আয়াস স্বীকার করিয়া বিবিধ গ্রন্থ পাঠ করিতে হইবে না। কেবল মাত্র "হেক্টর-বধ" পড়িলেই চলিবে। "বিপদার্ণব," "রণ-যূথ," "পতি-বিরহ-কাতর কলত্র বৃন্দ" প্রভৃতির ন্যায় পদ-প্রয়োগ এই পুস্তকের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। মধুসূদন কাব্য ও নাটক প্রণয়ন করিয়া যে যশ উপার্জ্জন করিয়াছেন, এই অসার গ্রন্থে তাহার কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। ইহা দত্ত কবির রচনা বলিয়াই এত গুলা কথা বলিলাম, নতুবা, এই জঘন্য পুস্তক লইয়া এত সময় অতিবাহিত করিতাম না।

"ব্রজাঙ্গনা কাব্য" মিত্রাক্ষর ছন্দে বিরচিত। ইহার এক সর্গ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। শ্যাম-বিরহ-বিধুরা ব্রজাঙ্গনা রাধিকার গভীর মর্ম্ম-দাহ ও অদম্য হৃদয়োচ্ছ্বাস এই কাব্যের অক্ষরে অক্ষরে অতি উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হইয়াছে। আমরা সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি, যতদিন বঙ্গভাষা থাকিবে, ততদিন "ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কোমলকান্ত পদাবলীর বীণাধ্বনি বঙ্গীয় পাঠকের কর্ণকুহরে অমৃত-ধারা বর্ষণ করিবে। যদি মধুসূদন এই একখানি মাত্র গীতিকাব্য লিখিয়া লেখনীকে বিশ্রাম দিতেন, তাহা হইলেও আমরা তাঁহাকে বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতি-কবিগণের পার্শ্বে সিংহাসন প্রদান করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইতাম না।

বাস্তবিকই "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" বঙ্গভাষার "গীত-গোবিন্দ।" এই সম্বন্ধে একটী কৌতুকজনক গল্প আমাদের মনে পড়িল। "ব্রজাঙ্গনা-কাব্য" মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবার প্রায় এক মাসের পর, একদা মধ্যাহ্ন কালে একজন পরম বৈষ্ণব, বৃদ্ধ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বহুবাজারস্থ ষ্টানহোপ যন্ত্রালয়ে আসিয়া জনৈক কর্ম্মচারীকে বলিলেন, "মধুসূদন কোথায়? আমি তাঁহার সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব।" জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি সেই মুণ্ডিত-মস্তক, নগ্ন-পদ, থান-পরিহিত, নামাবলী-উত্তরীয়, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কবিবরের গৃহ দেখাইয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই কর্ম্মচারী-নির্দ্দিষ্টগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, দেখিলেন, পেণ্টুলেন-পরিহিত একজন "সাহেব" এক খানি চেয়ারে উপবিষ্ট হইয়া নিবিষ্ট-চিত্তে কি লিখিতেছেন। ব্রাহ্মণ কোন সাহেবের গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, মনে করিয়া, শঙ্কিত চিত্তে বাহির হইয়া আসিতেছেন, এমন সময় সেই সাহেব তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —"আপনি কাহার অনুসন্ধান করিতেছেন?" ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"মধুসূদনের সহিত একবার সাক্ষাৎ করিব—তিনি কোথায় মহাশয়?" প্রশ্ন হইল,—"প্রয়োজন কি—আপনি কোথা হইতেই বা আসিতেছেন?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় উত্তর করিলেন,—"ব্রজাঙ্গনা-কাব্য পাঠ করিয়া আমি যারপর নাই মুগ্ধ হইয়াছি। একবার সেই পুণ্যবান মধুকে দেখিব বলিয়া নবদ্বীপ হইতে আসিতেছি।" এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই চেয়ারোপবিষ্ট ব্যক্তি ঈষৎ হাস্যবদনে কহিলেন—"মহাশয় আমারই নাম মধুসূদন দত্ত।" ইহাতে ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ বিহ্বলের ন্যায় কবিবরের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা!—তুমি শাপ-ভ্রষ্ট!"

তাহার পর তাঁহার তিলোত্তমা, বীরাঙ্গনা ও মেঘনাদ-বধ। এই তিনখানি কাব্য অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। "তিলোত্তমা-সম্ভব" বঙ্গভাষার সর্ব্বপ্রথম অমিত্রাক্ষর-লিখিত কাব্য। ইহা প্রথমে "রহস্য-সন্দর্ভে" প্রকাশিত হয়। কবির প্রথম উদ্যমের এই ফল তাদৃশ উৎকৃষ্ট হয় নাই বটে, কিন্তু ইহার স্থানে স্থানে অতি উচ্চদরের কবিত্ব-শক্তি দৃষ্ট হয়। বীরাঙ্গনা কাব্যের অন্তর্গত নায়িকাগুলির প্রকৃত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে কাব্যের নাম নির্ব্বাচনে কবিকে তাদৃশ সৌভাগ্যশালী মনে করিতে পারা যায় না। এই কাব্যে অসাধারণ কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। বিশেষতঃ "নীলধ্বজের প্রতি জনা" শীর্ষক সর্গটী বঙ্গভাষার এক অতুল উপাদেয় পদার্থ। এরূপ গর্ব্ব-প্রেম-অভিমান-পূর্ণ কবিতা বঙ্গভাষায় অতি অল্পই পড়িয়াছি। তাহার পর কবির মেঘনাদ বধ। একটী স্বতন্ত্র প্রস্তাবে এই কাব্যের বিস্তৃত সমালোচনা করিবার ইচ্ছা আছে বলিয়া, এস্থলে ইহার সম্বন্ধে অধিক আর কিছু বলিব না। দৃষদ্বতী তটে, হিন্দু বীর-কুল-রবি পৃথ্বীরাজের পতন-কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে, "বৃত্র-সংহার" ব্যতীত "মেঘনাদ-বধের" ন্যায় মহাকাব্য আর একখানিও রচিত হয় নাই, একথা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব। "ভারতীর" বিকট ভ্রূ-ভঙ্গে, "ছুছুন্দরী বধকাব্যের" কুটিল-কটাক্ষ-পাতে, অথবা ব্যঙ্গ-প্রিয় ভট্টাচার্য্যের—

"টেবেলিলা টেবেলক সুন্দর টেবল,
(আহা কাঁঠালের কাঠে! !)

প্রভৃতি কবিতার তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণে, মেঘনাদ-বধ কাব্য-রচয়িতার প্রকৃত কবি-গৌরবের কিছুমাত্র অঙ্গ-হানি হইবে না, ইহা স্পর্দ্ধার সহিত নির্দ্দেশ করিতে পারি। সকল দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্বর্গীয় মহাত্মা মধুসূদন দত্তকে বাঙ্গালার সর্ব্ব-প্রধান কবি বলিতে ইচ্ছা হয়।

মধুসূদনের কবিতার যে দুইটী বিশেষত্ব আছে, এস্থলে তাহাদের বিষয় আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

১ম—বঙ্গভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রথম প্রচলন।

মহাত্মা মধুসূদন দত্ত মাতৃভাষায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রথম প্রবর্ত্তিত করিয়া, এই মিত্রাক্ষর-প্রবাহ-প্লাবিত বঙ্গ-ভূমে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। তিনি বঙ্গভাষাকে মিত্রাক্ষর-শৃঙ্খলপীড়িতা দেখিয়া অতিশয় ব্যথা পাইয়াছিলেন। তাই তিনি রোষে, ক্ষোভে গর্জ্জন করিয়া জগত-সমীপে জলদ-গম্ভীর স্বরে গাহিলেন।

"বড়ই নিষ্ঠুর আমি ভাবি তারে মনে,
লো ভাষা, পীড়িতে তোমা গড়িল যে আগে,
মিত্রাক্ষররূপ বেড়ি; কত ব্যথা লাগে,
পর যবে এ নিগড় কোমল চরণে—
স্মরিলে হৃদয় মোর জ্বলি উঠে রাগে।
ছিল না কি ভাব-ধন, কহলো ললনে,
মনের ভাণ্ডারে তার, যে মিথ্যা সোহাগে
ভুলাতে তোমারে দিল এ তুচ্ছ ভূষণ?—
কি কাজ রঞ্জনে রাঙ্গি কমলের দলে?
নিজরূপে শশিকলা উজ্জ্বল আকাশে।
কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে?
কি কাজ সুগন্ধি ঢালি পারিজাত দলে?
প্রকৃত কবিতারূপী প্রকৃতির বলে—
চীন-নারী সম পদ কেন লৌহ ফাঁসে?

বাস্তবিক তাঁহার এই হৃদয়োচ্ছ্বাস গৈরিক নিঃস্রাবের ন্যায় অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। বাস্তবিকই তিনি মাতৃভাষার এই অভাব ও অপূর্ণতা দেখিয়া হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইয়াছিলেন। তাঁহার এই রোদন "লোক দেখান" নহে। তাঁহার এই কবিতা লিখন বাহাদুরি লইবার জন্যও নহে। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন, কাজেও তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। অঙ্গ-হীনা বঙ্গভাষাকে সর্ব্বাবয়ব সম্পন্না করিয়া, জাতীয় সাহিত্য-ক্ষেত্রে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বঙ্গীয় কাব্য-গগনে বিজয় বৈজয়ন্তী সগৌরবে উড্ডীন করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রথমে মিত্রাক্ষর ছন্দের পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং উক্ত ছন্দের অপূর্ণতা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। মিত্রাক্ষর ছন্দে লিখিত "আত্ম-বিলাপ" শীর্ষক তাঁহার তৎকালের একটী কবিতা "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়" প্রকাশিত হয়। সে আজি প্রায় ২৮ শ বৎসরের কথা। সেই একটী কবিতায় মধুসূদনের কবি নাম সার্থক হইয়াছে। তবে কি অমিত্রাক্ষর ছন্দের নবাগত বিলাতী মহাজন বঙ্গভাষাকে একচেটিয়া করিয়া লইবেন? তবে কি মিত্রাক্ষর ছন্দের দেশী ব্যবসায়ী "কাঁদ-কাঁদ-মুখে, বহুকালের পৈতৃক দোকান পাট বন্ধ করিবেন? আমরা কিন্তু এ মতের বিন্দুমাত্রও পোষকতা করিতে লজ্জা বোধ করি। আমরা বলি, কাব্য-প্রতিপাদ্য বিষয় ও রস বুঝিয়া, ছন্দ বাছিয়া লওয়া আবশ্যক। শান্তি, করুণ, প্রভৃতি রসের বর্ণনাস্থলে মিত্রাক্ষর ছন্দ অপেক্ষাকৃত সুললিত ও সুমধুর হয়। এবং বীর, রৌদ্ররস প্রধান

কাব্যে অমিত্র ছন্দ বিশেষ উপযোগী। মিত্রাক্ষর-ছন্দে কবিকে মিলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হয়। সুতরাং ভাবের পূর্ণ-গতি ইহাতে প্রকাশ পাইতে পায় না। সকলেই যেন ধরা-বাঁধা,—মাপা জোঁকা। কিন্তু অমিত্রাক্ষরে ভাব-প্রবাহ যত দূর ইচ্ছা ততদূব ছুটিতে পায—যতক্ষণ না সে হাঁপা-ইয়া পড়ে, ততক্ষণ তাহার গতির বিরাম নাই। এরূপ স্থলে, আয়তনের সংকীর্ণতা নিবন্ধন কবিকে কষ্ট পাইতে হয় না। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন, "আমাদের বোধ হয়, মাই-কেল একটা নূতন রূপ কাণ্ড করিয়া, নাম বাহির করিবার ইচ্ছায়, এই অমিত্রাক্ষর ছন্দে গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন।" ন্যায়রত্ন মহাশয় এইরূপ এক দেশ-দর্শী মত প্রকাশ করিয়া যে, বিষমভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা আর কাহাকেও কষ্ট পাইয়া বুঝাইতে হইবে না। যখন অমিত্রাক্ষর ছন্দ বঙ্গভাষায় প্রথম প্রবর্ত্তিত হইল, তখন অনেকেই ইহার উপর খড়্গ-হস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। যখন কোন বিষয় নূতন উদ্ভাবিত হয়, তখন সহজে কেহ তাহার আদর করিতে চায় না, ইহা সর্ব্বকালে ও সর্ব্বদেশে দেখিতে পাওয়া যায়, সুতরাং এরূপ স্থলে প্রথম প্রথম অনে-কেই যে ইহার বিরোধী হইয়া দাঁড়াইবেন, তাহা বিচিত্র নহে। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এরূপ লোকের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে। আমরা ছন্দ লইয়া যে এতক্ষণ কাটাইয়া দিলাম, ইহার কারণ ছন্দই কবি-তার পরিচ্ছদ। কিরূপ বেশ পরিধান করিলে স্বাস্থ্যের কোন অপকার হইবে না, অধিকন্তু শারীরিক লাবণ্য বর্দ্ধন হইবে, ইহা দেখা যেরূপ আবশ্যক, সেইরূপ কোন ছন্দে কাব্য লিখিলে, ভাব-স্রোত অপ্রতিহত বেগে বহিবে, অলঙ্কার, রস, অক্ষুণ্ণ থাকিবে, ইহাও দেখা প্রয়োজনীয়।

২য়—প্রথা-বহির্ভূত নিয়মে ক্রিয়া পদ ব্যবহার। ইহার জন্য কেহ কেহ মধুসূদনকে অযথা নিন্দা করেন। 'দানিল' 'চেতনিল' 'দীপিছে' 'পশি' 'ইচ্ছি' 'মুক্তিল' প্রভৃতি ক্রিয়াপদ-প্রয়োগ তাঁহার নিজের বটে। আমরা বলি, ইহাতে নিন্দার কথা ত কিছুই নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণ-ব্যবসায়ীগণ যতই কেন নিন্দা করুন না,পণ্ডিত রামগতি ন্যায়-রত্ন মহাশয় এ গুলিকে "চক্ষু-শূল" প্রভৃতি বিশেষণে যতই কেন অভিহিত করুন না, আর কিছুতেই এরূপ ক্রিয়াপদ প্রয়োগ বঙ্গভাষা হইতে রহিত হইবে না, এবং হই-বার কথাও নহে। বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষা নহে যে, ইহার সর্ব্বত্রই সংস্কৃত ব্যাক-রণের নিয়মানুসারে চলিতে হইবে। সংস্কৃ-তের মূল হইতে বাঙ্গালার উৎপত্তি হইলেও বাঙ্গালা মিশ্র ভাষা। সংস্কৃত, প্রাকৃত,পারসী, হিন্দী, ইংরেজী প্রভৃতি ভাষার সাহায্যে বঙ্গ-ভাষা গঠিত হইতেছে এবং এই গঠন-কার্য্য স-ম্পূর্ণ হইতে যে আর কতদিন লাগিবে, তাহা কে বলিতে পারে? বঙ্গভাষার আজিও ব্যাক-রণ হয় নাই। বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ বলিয়া যাহা বিদ্যালয়ে বালকগণ কর্ত্তৃক অধীত হয়, বাস্তবিক তাহা বাঙ্গালা ব্যাকরণ নহে—বাঙ্গালা অক্ষরে সংস্কৃত ব্যাকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহে। যখন বঙ্গভাষার ব্যাকরণ লিখিত হইবে, তখন এইরূপ ক্রিয়াপদ-প্রয়োগ আর দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইবে না। পারি ত এ সকল কথা সময়া-ন্তরে সবিস্তারে বর্ণন করিব।

যখন আমার মনে হয়, প্রাতঃস্মরণীয় মহাকবি মধুসূদন দত্ত দুই বৎসরের মধ্যে এতগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন বিস্ময় ও ভক্তি ভরে আমি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ি। কি অসাধারণ শক্তি-সমূহের অধিকারী হইয়া তিনি ভূমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নানা ভাষায় দক্ষাগ্রগণ্য ছিলেন। তাঁহার হৃদয়-কাননে নানাদেশীয় ভাবের কুসুম সতত বিকশিত ছিল। তিনি তাহাদের কতকগুলি চয়ন করিয়া, মালা গাঁথিয়া তাঁহার স্বদেশীয় ভ্রাতা ও ভগ্নীগণের কণ্ঠে পরাইয়া দিয়া গিয়াছেন মাত্র। মহাত্মা মধুসূদন যদি "পুণ্যখণ্ড ইয়ুরোপে" জন্মগ্রহণ করিতেন; তবে আজি তাঁহাকে ভিন্ন মূর্ত্তিতে দেখিতে পাইতাম। তিনি দুর্ভাগ্যদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়া, দুর্ভাগ্য সাহিত্যের জন্য জীবনপাত করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য সকলে তাঁহার জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে।

এইবার আমরা বর্ত্তমান কবিকুল-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট আসিলাম। তিনি এ পর্য্যন্ত "চিন্তাতরঙ্গিনী" "বীরবাহু কাব্য" "নলিনী বসন্ত নাটক" দুইভাগ "কবিতাবলী" "আশাকানন", "ছায়াময়ী", দুইভাগ "বৃত্র-সংহার," "দশমহাবিদ্যা"—এই কয়খানি পুস্তক এবং বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা সমূহ বঙ্গ-ভাষার এক অপূর্ব্ব পদার্থ। তাঁহার গীতি-কাব্য গুলি ইংরাজী গীতি-কাব্যের অনু-করণে রচিত হইলেও এতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে যে, কোন কোন স্থলে তাঁহারা আদর্শকেও অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। "কবিতাবলী" গ্রন্থ মধুর, ললিত গম্ভীর ও মহান্ ভাবপূর্ণ গীতি-কাব্যমালার সমষ্টি; এই সকল কবিতা পাঠ করিতে করিতে পাঠকের চিত্ত কখন প্রেম ও করুণায় বিগলিত হইয়া যায়, কখন বা স্ব-দেশানুরাগ স্বরূপ স্বর্গীয় অগ্নিতে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তাহার "বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ্ এই রবে" কবি-তার বজ্র গম্ভীর ধ্বনি কখন ভুলিতে পারিব না। কালচক্র শীর্ষক কবিতায় কি অপূর্ব্ব কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। ব্যঙ্গকাব্য প্রণয়নেও তাঁহার ক্ষমতা অপরিসীম। 'দশ মহাবিদ্যার' কলেবর অতীব ক্ষুদ্র—৫৬ পৃষ্ঠা মাত্র। কিন্তু এই ৫৬ পৃষ্ঠা ক্ষুদ্র কাব্যে কবি অসাধারণ প্রতিভা শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইহার কল্পনা যেরূপ অনন্তগামিনী, রচনাও সেইরূপ বর্ণনার উপযোগিনী। কবি যে স্থলে যে রসের অবতারণা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, ভাষাও অমনি পরিচারিকার ন্যায় সেই স্থলে তাঁহার মন যোগাইয়া চলিয়াছেন। বাস্ত-বিক এই কাব্য পাঠ করিয়া হেম বাবুর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা দশগুণ বর্দ্ধিত হই-য়াছে। তাঁহার লেখনীর উপর পুষ্প বৃষ্টি হউক্। কিন্তু এরূপ পুস্তকের সংবাদ বঙ্গ দেশে কয় জনে রাখেন? এই কাব্য পাঠ করা দূরে থাকুক, অনেকে ইহার নাম পর্য্যন্তই শ্রবণ করেন নাই। [illegible] সেই সৌভাগ্য-রবির উদয় হইতে এখনও বহু বিলম্ব আছে, যখন বাঙ্গালী পাঠক 'স্ত্রীর সহিত কথোপকথন' ছাড়িয়া 'উপাসক সম্প্রদায়' পড়িতে শিখিবে; যখন 'মডেল ভগিনীর' ন্যায় অলীক কুৎসাপূর্ণ গ্রন্থ ছাড়িয়া গভীর চিন্তাপূর্ণ 'শকুন্তলা তত্ত্বের' আলোচনায় বিমল আনন্দ সম্ভোগ করিতে থাকিবে। তাহার

পর হেম বাবুর মহাকাব্য 'বৃত্র-সংহার' তুলনায় সমালোচন করিবার আমাদের ইচ্ছা আছে বলিয়া, এস্থলে কেবল দুই চারিটী কথা বলিয়া নিরস্ত হইব। বিজ্ঞান ও কবিত্বের সংমিশ্রণে যে কি এক অপূর্ব্ব উপাদেয় পদার্থ প্রস্তুত হইতে পারে, হেম চন্দ্র 'বৃত্র-সংহারে' বঙ্গবাসীকে তাহাই উজ্জল ভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি স্বীয় কাব্যের কোন কোন স্থলে মেঘনাদ বধের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন সত্য বটে, কিন্তু তাহাতে বৃত্র-সংহারের কিছুমাত্র অঙ্গ হানি হয় নাই। আর এইরূপ সাহায্য গ্রহণও অপরিহার্য্য। কেন না, মধুসূদন ও হেম চন্দ্র--উভয়েই সম কালিক কবি,এবং কাব্য-ক্ষেত্রে মধুসূদন তাঁহার আদর্শ ও পথ-প্রদর্শক। কিন্তু বৃত্র সংহারের কোন কোন বিষয় যে মেঘনাদ বধের অপেক্ষা উৎকর্ষতা লাভ করিয়াছে, ইহা হেম বাবুর সামান্য প্রতিভার পরিচায়ক নহে। মেঘনাদ বধের চরিত্রাঙ্কনে মধুসূদন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কাব্যাংশে মেঘনাদ বধের ইহা সামান্য অঙ্গহীনতা নহে। কিন্তু কবিকেশরী হেমচন্দ্র বৃত্র-সংহারে যে সকল চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, সে গুলি অতীব মনোহর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। তাঁহার ঐন্দ্রিলা, ইন্দু-বালা, শচী, বৃত্র, রুদ্রপীড়কে আমরা ভুলিতে পারিব না। ইন্দ্রের দধিচীর আশ্রমে গমন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন এবং দেবগণের হিতার্থ দধিচীর কলেবর পরিত্যাগের ন্যায় উদার, গম্ভীর ও সকরুণ দৃশ্য বঙ্গদেশে হেম বাবুর ন্যায় আর কোন্ কবি দেখাইতে পারিয়াছেন? সর্ব্বোপরি হেমচন্দ্রের এই মহাকাব্যে যে জ্বলন্ত স্বদেশানুরাগ, যে পবিত্র আর্য্য-ভাব, যে বজ্র-বিদ্যুন্ময় সৌন্দর্য্য-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, বঙ্গভাষার আর কোন কাব্যে সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন এ পর্য্যন্ত দুই ভাগ 'অবকাশ-রঞ্জিনী' "পলাসীর যুদ্ধ," ক্লিওপেট্র, "রঙ্গমতী" ও "রৈবতক" কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। রৈবতক কাব্য অল্প দিন হইল প্রকাশিত হইয়াছে। মহাভারত কি, কৃষ্ণ-চরিত্রই বা কি, ইহাতে কবি তাহাই বুঝাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার এত চেষ্টা শ্রম সকলই ব্যর্থ হইয়াছে,—নবীন বাবু এই কাব্য খানি না ছাপাইলেই ভাল করিতেন। ইহার কোন কোন স্থলের রচনা সুন্দর ও ক্ষমতার পরিচায়ক হইলেও, এই কাব্য শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেনের নামের গৌরব রক্ষা করিতে পারে নাই, একথা অবশ্য বলিতে হইবে। অবকাশরঞ্জিনী বঙ্গভাষার একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গীতি-কাব্য—ইংরাজী বীরত্ব ও অগম্য প্রেমের পূর্ণ বিকাশ স্থল। তাঁহার তেজস্বিনী বর্ণনা বাইরণের যোগ্য। "পলাশীর যুদ্ধ" কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট গীতি-কাব্য মালার সমষ্টিমাত্র। রাণী ভবানীর উক্তি আমরা প্রাণান্তেও ভুলিতে পারিব না। পলাশীর যুদ্ধের বর্ণনাটী যার পর নাই মনোহর হইয়াছে। এরূপ যুদ্ধ বর্ণনায় বাঙ্গালী জাতির গৌরব আছে। কিন্তু এই কাব্যের বিষয় নির্ব্বাচনে কবিকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারিলাম না। দেশের কলঙ্ক ও জাতীয় অবনতি সাহিত্যে চিরস্থায়ী করিবার জন্য, নবীন বাবুর অসাধারণ প্রতিভা যে এইরূপ অপব্যয়িত হইয়াছে, ইহাতে আমরা বাস্তবিকই দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ আছি। তাহার পর তাহার "রঙ্গ-

মতী।" ইহার সম্বন্ধে আমরা যে কি বলিব, তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। এই কাব্যের যাহা কিছু বুঝিতে পারিয়াছি, তাহার সহস্রাংশের একঅংশও পাঠকদিগকে বুঝাইতে পারিব কি না, সন্দেহ। এই অপূর্ব্ব কাব্যের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু বুঝাইতে পারা যায় না। আমার মনে হয়, সৌন্দর্য্য অশরীরী হইল কেন? সৌন্দর্য্য দেখিবার পদার্থ না হইয়া কেবল অনুভবের বস্তু হইল কেন? তাহা না হইলে বুঝি সকলেই রঙ্গমতী বুঝিতে. পারিতেন। স্বভাব বর্ণনা রঙ্গমতীর প্রাণ। নিসর্গের অনন্ত উচ্ছ্বাস, গভীর, অব্যক্তভাব উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিতে বঙ্গদেশে নবীন চন্দ্রের ন্যায় আর কোন কবিই সক্ষম নহেন। এই কাব্যের অক্ষরে অক্ষরে কেমন এক অব্যক্ত, উদাস সৌন্দর্য্য ফুটিয়া পড়িতেছে! বিরহিণী চন্দ্রকলার বার মাসের অবস্থা বর্ণনা, শিকারীর গীত, জুমিয়া রমণীর সরল, মর্ম্মভেদী উচ্ছ্বাস বঙ্গ-সাহিত্যে অতুল্য।

শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয় "বঙ্গ-সুন্দরী", "সারদাসুন্দরী" প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা। তাঁহার কবিতার ন্যায় সুললিত ও সুমধুর কবিতা বঙ্গ-সাহিত্যে অতি অল্পই আছে। তাঁহার কবিতা সকলে কেমন একটী দুঃখের তান আছে, যাহা এক্ষণকার কোন কবির রচনায় শুনিতে পাওয়া যায় না। তাঁহার "নারী-বন্দনা শীর্ষক কবিতায়. ভাবুকতা, সহৃদয়তা, সুরুচি ও কবি-শক্তির একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। সারদা মঙ্গল কাব্য খানি কবি হৃদয়ের দর্পণ স্বরূপ। ইহাতে বিহারী বাবুর মর্ম্মের উচ্ছ্বাস দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া যাই। কবি যেন কোন আশৈশব পোষিত আশায় চিরদিনের মত নিরাশ হইয়া, জলন্ত প্রতিভাগ্নি হৃদয়ে ধারণ করিয়া, কক্ষ-ভ্রষ্ট ধুমকেতুর ন্যায়, এই সংসার-মরুভূমিতে হা হা করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। উপহার পত্রে কবি—

"হয় তো হল না দেখা,
এ লেখাই শেষ লেখা,
অন্তিম কুসুমাঞ্জলী স্নেহ—উপহার,—
ধর ধর স্নেহ-উপহার"

বলিয়া, প্রিয়তমাকে স্নেহোপহার প্রদান করিয়াছেন। গ্রন্থ শেষে কবি শান্তি লাভ করিয়া, "হৃদয়-দুয়ারে খুলি" গাহিতেছেন

"প্রেয়ে,
কি মধুর মনোহর মূরতি তোমার।
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার।।
সদা যেন ঘরে ঘরে,
কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেব-বীণা বাজে সারদার!
ধাইয়ে হরষ ভরে,
কল-কোলাহল করে,
চারিদিকে হাসে খেলে কুমারী কুমার।
হয়ে কত জ্বালাতন,
করি অন্ন আহরণ,
ঘরে এলে উলে যায় হৃদয়ের ভার!
মরুময় ধরাতল,
তুমি শুভ-শতদল,
করিতেছ ঢল ঢল সমুখে আমার।
ক্ষুধা, তৃষ্ণা দূরে রাখি,
ভোর হয়ে ব'সে থাকি,
নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার।—
তোমায়, দেখি অনিবার!
তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হোগ্‌গে এ বসুমতী যার খুসি তার।।"

কি প্রসন্ন—তৃপ্তির ভাব!

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র মজুমদার ও হরিশ্চন্দ্র মিত্র পূর্ব্ববঙ্গের দুই জন প্রাচীন কবি। "সদ্ভাব শতক" সদ্ভাব ও শান্তিপূর্ণ অত্যুৎকৃষ্ট [illegible] সমষ্টি। ইহা পারসী দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ কবি হাফেজকে আদর্শ করিয়া রচিত। "সীতা নির্ব্বাসন" এক খানি উৎকৃষ্ট কাব্য।

"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর "স্বপ্ন-প্রয়াণ ও তত্ত্ব-বিদ্যার" রচনা করিয়াছেন। হেমচন্দ্রের "আশা কানন" ও "স্বপ্ন-প্রয়াণের" ধরণের কাব্য বঙ্গভাষায় আর একখানিও নাই। ইহাতে বিচিত্র কবি-শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। এই কাব্য আদ্যন্ত রূপক পূর্ণ। দর্শন কল্পনার হস্তে কেমন খেলা করে, কবি "স্বপ্ন প্রয়াণে" তাহাই দেখাইয়াছেন। ইহা বঙ্গসাহিত্যে এক উপাদেয় কাব্য। দ্বিজেন্দ্র বাবু কয়েক বৎসর অতি দক্ষতার সহিত "ভারতী" সম্পাদন করিয়াছেন।

শ্রীহেমনাথ মিত্র।

স্বপ্ন।

অমর ধামের তুই ফুল্ল পারিজাত রে মধুর স্বপন,
যখন তোমারে পাই, জগৎ ভুলিয়া যাই,
নিরাশ জীবনে খেলে আশার পবন।
এই যে দুঃখের ধরা, শোক দুঃখ তাপ ভরা,
ক্রন্দন নিনাদ যথা দহে প্রাণ মন।
পুত্র শোকাতুরা মাতা, ছিন্ন-প্রেম-ডোর ভ্রাতা,
চিরবিরহিনী জায়া বিষণ্ণ বদন।
হায় মুহূর্ত্তের তরে, ভুলে সেই শোক নরে,
বিহরে ত্রিদিব পরে মর্ত্ত্য নরগণ।
দ্বাপরে ব্যাসের বরে, যথা এ ধরণী পরে,
বিরহ বিধুরা কুরু কুলবধূগণ।
নিরখি আপন কান্ত, শোকানল করি শান্ত,
সবাই ত্রিদিব ধামে করিল গমন।
তেমন তোমার বরে, মর্ত্তে মুহূর্ত্তের তরে,
ত্রিদিবের ধন সবে করি দরশন।

রে স্বপন কি কুহক তোর।
বহুদিন যেই জনে, দেখিনি ভাবিনি মনে,
বহুদিন ছিড়িয়াছে যে বন্ধন ডোর।
মর্ত্তের আঁধারে থাকি, স্বর্গের প্রেমের পাখী,
নিরখি ভাবেতে মন হয়রে বিভোর।
তো হতে কুহকে যার, মৃত্যু করে ছারখার,
কোথা আমি কোথা মম প্রাণাধিক জন।
এই স্থানে দুই জন, আজি বসি হৃষ্ট মন,
কালি কোথা হায় সেই যতনের ধন।
খুজিয়া সকল ক্ষিতি যদিও বেড়াই নিতি,
তবু দরশন তায় পাবনা কখন।
যবে এ ভবের মেলা, আমার(ও)ফুরাবে বেলা
সেদিনেও পাব কিনা কে জানে এখন?
কিন্তু তোর মায়াবলে, মরণ পড়েরে তলে
মরণের লুক্কায়িত ধন পুন মিলে।
শত রত্ন বিনিময়ে, সদা লালায়িত হয়ে,
না পেলেও তোর বলে পাই কুতূহলে।

জীবনের উষাকালে, সুখের কিরণ জালে,
হৃদয়ের কম-কায়া ছিল আলোকিত'।
আজি এ আঁধার ঘোর, নৈরাশ্য জলদ ঘোর,
কে পারে করিতে পুন তারে প্রজ্বলিত !
কিন্তু তোর আগমনে, রে কুহকী এইক্ষণে,
বিগত শৈশব সুখ যৌবনেও পাই।
যেন নবসৌর করে, ফুল্ল কমলিনী সরে,
নবীন জীবনাকাশে মলিনতা নাই।
সেই সব বন্ধু সনে, বিহরি আনন্দ মনে,
স্বর্গের সংবাদ পাই বসি এই লোকে।
বিরহ ভুলিয়া যাই, হৃদয় খুলিয়া গাই,
নাচি হাসি শিশুসম ভুলি দুঃখশোকে।
এই যে রয়েছি একা, তথাপিও পাই দেখা,
চির বিস্মরিত পূর্ব্ব পুজনীয়গণে।
যাঁদের ঘুচেছে নাম, খুঁজিলে এ ধরা ধাম,
চিহ্ন মাত্র নাহি হেরি ঘুরি প্রাণপণে।
পুত্র কন্যা বন্ধু জায়া, ত্যজিয়া মরত কায়া,
অমরধামেতে যার করেছে গমন।
হায়রে আঁধারে বসি, তোর মায়া হৃদে পশি,
অমর ধামেতে করে স্বর্গের মিলন।
সেই ধামে যেই স্থানে, অন্তিমে সঁপিব প্রাণে,
তার তরে খুলে যায় হৃদয় দুয়ার।
তুচ্ছ বোধ হয় ক্ষিতি, যায় মরণের ভীতি,
ইচ্ছা হয় সেই দেশে করিতে বিহার।
স্বপন, দেখালি যাহা, লয়ে চল দেখি তাহা,
আর এ দুঃখের ভবে নাহিরে বাসনা।
কেবল মরণ যথা, বিরহ দুঃখের কথা,
পাপের কুহক আর লাভের কামনা।
অই যে বাজিছে ভেরী, মধুর আলোক হেরি,
স্বর্গের পবিত্র জ্যোতি স্ফুরিছে কেমন।
সংসার বিদায় দাও, অসার বাসনা যাও,
স্বপনের দেশে মন কররে প্রয়াণ।

শ্রীপ্যারিশঙ্কর দাস।

সঙ্গীত-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

সংসার শোক তাপ চিন্তা পূর্ণ। একেবারে নিশ্চিন্ত ও ষোল আনা সুখের অধিকারী এখানে কেহই নাই। কি দীন দরিদ্র, কি রাজাধিরাজ সকলেই সমান অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছেন। যাহার যাহা অভাব, অন্যকে তাহার অধিকারী দেখিলে, সে অন্যকে সুখী মনে করে; কিন্তু সকল অভাব কাহার পুরিয়াছে? জানি না, অভাব-শূন্য হইতে পারিলে সুখী হইতে পারা যায় কি না, কিন্তু সংসারে যে অভাব শূন্য কেহ থাকিতে পারে না, ইহা এক প্রকার নিশ্চিত। সুতরাং সকলের প্রাণেই কতকটা শূন্য স্থান পড়িয়া আছে, এদিকে স্বাভাবিক নিয়মে, কি বহির্জগতে, কি অন্তর্জগতে সর্ব্বত্রই শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে হইবে। সেই কারণে, আমরা প্রবল অভাবের মুখ ফিরাইয়া, যাহা সহজ-লভ্য তাহাতে লইয়া ফেলি এবং সুবর্ণের অভাব ধূলি দিয়া পূর্ণ করিবার প্রয়াস পাই। যে, যে পরিমাণে এই অভাবের গতি অন্যদিকে ফিরাইতে পারে, সে সেই পরিমাণে সুখী ও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে। অভাবের অবাধ্য মুখ ফিরাইবার দিক্‌ও পৃথক পৃথক। কেহ ধনের কাঙ্গাল; কিন্তু বিদ্যোপার্জ্জনে ধন

তৃষ্ণা কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্তি করিয়াছে। কেহ পুত্রের কাঙ্গাল; কিন্তু সদাব্রতে অপুত্রক যন্ত্রণা যথা সম্ভব মিটাইয়াছে। এই রূপে, এক এক প্রকার অভাব এক এক প্রকারে কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণ করিয়া লোকে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে এবং দুগ্ধের স্বাদ ঘোলে মিটাইয়া দিন যাপন করিতেছে। কিন্তু এমন কোন উপায় নাই, যদ্দারা সকল প্রকার অভাবের বেগ এক দিকে ফিরাইতে পারা যায়। এক দ্রব্য সকল অভাব পূর্ণ করিতে পারে, এমন সামগ্রী সংসারে দেখি না এবং এক দ্রব্য সকল লোকের মনে সমান কার্য্য করিতে পারিবে, ইহা সম্ভব বলিয়াও বোধ হয় না। যদি তাহা পারিত, তাহা হইলে সংসার এত বৈচিত্র্যময় হইত না। তবে এক সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায় বটে, যাহা ক্ষণকালের জন্য হৃদয়ে স্থান লাভ করিয়া সকল প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা হইতে অবাধ্য চিন্তা-স্রোতকে ফিরাইয়া বিস্মৃতির গর্ভে লইয়া যাইতে পারে। যদিও তাহা ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু তাহার শক্তি সামান্য নহে। এই কারণে, দেবাদিদেব মহাদেব তাহার সাধক; কলাবতী সরস্বতী তাহার সখী; ইহারই নাম সঙ্গীত। যদি সংসারের শোক তাপ চিন্তা হইতে ক্ষণকালের জন্যও অব্যাহতি দিবার সামগ্রী কিছু থাকে, তাহা সঙ্গীত। ইন্দ্রাদি দেবতারাও ইহার সেবক। সঙ্গীত আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারে নাই, এমন মনোরাজ্য নাই। আবাল বৃদ্ধ সকলের উপরেই ইহার সমান প্রভাব। মনুষ্য কেন, হরিণ, সর্প প্রভৃতি ইতর প্রাণীও ইহার বশীভূত। শুনা যায়, জড় জগতও ইহাতে মুগ্ধ হয়। সঙ্গীতে পাষাণ বিগলিত হয় ও মেঘ বারি বর্ষণ করে। আর্ফিয়সের সঙ্গীত শুনিবার জন্য বৃক্ষ সকল উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে ছায়া প্রদান করিত, এবং শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাজাইলে 'যমুনা বহে উজান (বাঁশীর) গান শুনিতে।'

পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, প্রণয়ের মূলে সঙ্গীত আছে। বস্তুতঃ সুকণ্ঠ পক্ষীগণকে বিনা আয়াসে পত্নী লাভ করিতে দেখা গিয়াছে। কোন কোন কামিনীকে সুগায়ক পুরুষে এবং পুরুষকে সুগায়িকা কামিনীতে আত্ম সমর্পণ করিতে মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সঙ্গীতে মন এত দূর মুগ্ধ হয় যে, লোক তাহার বশবর্ত্তী হইয়া সকলই দিয়া বসে। পতি পত্নীর সদ্ভাব দৃঢ় ও প্রণয় গাঢ় করিবার জন্য অনেক রসজ্ঞ পণ্ডিত সঙ্গীত শিক্ষার বিধান করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা মনুষ্য চরিত্র অনেক পরিমাণে বুঝিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু আমাদিগের সমাজে আজ কাল সঙ্গীতের বিশেষ আদর দেখা যায় না এবং ইহার প্রয়োজনীয়তাও বিশিষ্টরূপে অনুভূত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সঙ্গীত এক্ষণে অপবিত্র বলিয়া অনেকের নিকট ঘৃণিত। কিন্তু স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ইহার ন্যায় হৃদয়কে আর কেহই পবিত্র করিতে পারে না। এই কারণে দেবারাধনায় সঙ্গীতের অবতারণা হইয়াছে। সুর স্বয়ং ব্রহ্ম এবং বেদগানে যেমন দেবতা প্রসন্ন হন, তেমন আর কিছুতেই হন না। বিশেষতঃ সঙ্গীত কবিত্বের সারাংশ এবং সেই কারণে ইহার দ্বারা হৃদয় যত দূর পরিষ্কাররূপে খুলিতে পারা যায়, তেমন আর কিছুতেই পারা যায় না। দশ

পৃষ্ঠা শুষ্ক গদ্য অপেক্ষা এক চরণ পদ্য অধিক ভাবপ্রকাশক এবং দশ পৃষ্ঠা পদ্য অপেক্ষা এক পদ গীত অধিক ভাবপ্রকাশক। যাহা হৃদয়-ভাবপ্রকাশক, তাহা যদি অপবিত্র, তবে সংসারে পবিত্রতা কোথায়? প্রকৃত প্রস্তাবে সঙ্গীত অপবিত্র নহে; কিন্তু আমাদিগের সমাজ ও শিক্ষার দোষে ইহা পবিত্রতা হারাইয়া এক বিকট ভাব ধারণ করিয়াছে। বয়স্য ব্যতিরেকে অপর কাহাকেও ইহার সাক্ষী ও শ্রোতা পাইবার উপায় নাই। যাহারা বয়ঃজ্যেষ্ঠ বা বয়ঃকনিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট সঙ্গীত বিদ্যার পরিচয় দেয়, তাহারা অত্যন্ত নির্লজ্জ ও মুখর বলিয়া পরিগণিত হয়। আবার যদি স্ত্রীলোকে সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা করে, তাহা হইলে তাহাকে গণিকার সমশ্রেণীতে নামিয়া যাইতে হয়। আমাদিগের সমাজে সঙ্গীতের এতাদৃশ হতাদর ও শোচনীয় অবস্থা বড়ই দুঃখের বিষয়। আমাদিগের শিক্ষা-গুরু ইংরাজদিগের সমাজে সঙ্গীত বিশেষ আদরনীয়, এবং সংগীত বিদ্যায় যাঁহার পারদর্শিতা নাই, তিনি শিক্ষিত পদবাচ্য নহেন। যে ইংরাজ-মহিলা নৃত্য করিতে কি পিয়ানো বাজাইতে শিক্ষা করে নাই, তাহার শিক্ষাই হয় নাই এবং তাহার সম্ভ্রান্ততার পক্ষেও বিশেষ সন্দেহ। এ বিষয়ে আমরা ইংরাজের অনুকরণ করিতে শিখি নাই,—শিখিয়াছি সুরা পান করিতে এবং তাহাও পূর্ণ মাত্রায়।

সঙ্গীত সহজেই স্থিতিস্থাপক মনের উপর আধিপত্য করিতে পারে। এই জন্য দেবারাধনায় স্বর গ্রামের অবতারণা হইয়াছে। বেদপাঠের স্বরতরঙ্গের সহিত কাহার না হৃদয় নাচিয়া উঠে? যে কাশী ধামে বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়াছে, সে ঘোর নাস্তিক হইলেও ভক্তিরসে পরিপ্লাবিত হইয়াছে। উপাসনায় মন উন্নত হইয়া স্বর্গদ্বারে উপনীত হইতে পারে; কিন্তু সঙ্গীতে স্বয়ং স্বর্গ নামিয়া আসে। আর কিছুই সঙ্গীতের ন্যায় মনকে প্রফুল্ল করিতে পারে না। যাহার যেমন প্রবৃত্তি ও স্বাভাবিক প্রবণতা, সে তদনুরূপ সঙ্গীতে যেমন মোহিত হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। সুতরাং ধর্ম্মে যাহার মতি, ধর্ম্ম বিষয়ক একটী গীতে সে যেমন আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ করিবে, সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ খানা পাঠ করিয়া তাহার তাদৃশ আনন্দ ও তৃপ্তি লাভ না হওয়াই সম্ভব। প্রণয়ে যাহার মন মজিয়াছে, সে একটী প্রণয় সঙ্গীতে যেমন মোহিত হইবে, তেমন আর কিছুতেই হইবে না। বস্তুতঃ যাহার যে দিকে মতি, সেই বিষয়ক ও তদুপযোগী সঙ্গীত তাহাকে সেই দিকে অনেক দূরে লইয়া যাইতে সক্ষম। যে বীর, সে সঙ্গীত সহায়ে সমরে প্রাণ দানে অগ্রসর হন; যে প্রেমিক সে মাতিয়া উঠে, যে সংসার-বিরাগী, সে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। এই সকল কারণে, প্রবৃত্তি অনুসারে লোকে যদি সঙ্গীতালোচনা করে, তাহা হইলে তাহারা অনায়াসেই এক এক পথের চরম সীমায় উপস্থিত হইতে পারে। সঙ্গীতের এ ক্ষমতা বা গুণ তাহার সহজাত; সুতরাং কোন মতেই তাহা অতিক্রম করিবার উপায় নাই। এমনও দেখা যায় যে, যাহার যে দিকে আদৌ প্রবণতা নাই, সঙ্গীত তাহাকেও সে দিকে ফিরাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, মনুষ্য-হৃদয়ে সকল প্রকার প্রবৃত্তির বীজই সুপ্তাবস্থায় লুক্কায়িত আছে, এবং তাহাকে জাগ্রত করিয়া অঙ্কুরিত করি-

বার উপযুক্ত উপকরণ মিলিলেই তাহা জাগরিত ও অঙ্কুরিত হয়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে যে, সুপ্ত ভাব সকল সঙ্গীত সহায়ে যতদূর জাগরিত হয়, তত আর কিছুতেই হয় না। বহুকালের আবদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া সঙ্গীতের ন্যায় অগাধ নিদ্রাগত ভাব সকলকে আর কেহই নাচাইয়া তুলিতে পারে না। সুতরাং যাহার যে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক, সঙ্গীত তাহার পক্ষে যেমন উত্তেজক, যাহার সে প্রবৃত্তি স্বাভাবিক নহে, তাহার পক্ষেও তেমনই উত্তেজক বলিতে হইবে।

কাব্য যেমন সহজে হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিয়া নানা প্রকার ভাবের তরঙ্গ তুলিয়া দেয়, সঙ্গীত এ কার্য্যে তাহা অপেক্ষা ক্ষমতাশালী। সুতরাং কাব্য অপেক্ষা সঙ্গীতের আদরও অধিক; বিশেষতঃ সুর লয়ে ভূষিত হইয়াছে বলিয়া সঙ্গীত এক মোহিনী বেশ ধারণ করিয়া সকল মনের উপর আপন আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হইয়াছে। এই কারণে সঙ্গীত শিক্ষাকে আমরা হৃদয়ের শিক্ষা বলিতে সাহস করি। যখন কাব্য এক প্রকার অতর্কিতরূপে হৃদয়ের শিক্ষক বলিয়া মান্য, তখন সঙ্গীত শিক্ষা যে হৃদয়ের শিক্ষক বলিযা গ্রাহ্য হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? প্রকৃত প্রস্তাবে ইহার দ্বারা হৃদয়ের শিক্ষা যেমন সম্পূর্ণতা লাভ করে, তেমন আর কিছুরই দ্বারা করিতে পারে না। কিন্তু হৃদয়-শিক্ষায় যাহার এমন ক্ষমতা, তাহার অবস্থা আজ অতি শোচনীয়! হৃদয়-শিক্ষার গুণে যে ভারত চিরকাল জগতের আদর্শ, কবিত্ব যে ভারতের অস্থি মজ্জা এবং সঙ্গীত যাহার প্রাণ, সেই ভারতে আজ সঙ্গীতের অনাদর! ইহা কি সামান্য পরিতাপের বিষয়? ভাগ্যে কয়েকটা রঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাই হাড় গোড় ভাঙ্গা হইয়া সঙ্গীত একটা বিকৃত অবস্থায় তিষ্টিয়া আছে; নতুবা অভিধানে ইহার একটা সুদীর্ঘ সংজ্ঞা লিখিতে হইত।

ফলতঃ ভারতে হৃদয়-শিক্ষা ক্রমে লুপ্ত হইয়া আসিতেছে। প্রেম, বাৎসল্য, ভক্তি, দয়া সকলেরই মুখ ভোঁতা হইয়া আসিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী বিজ্ঞান-শিক্ষা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার সাহায্যে এক যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। জড়-শিক্ষা অনেক পরিমাণে আমাদিগের হাড়ে হাড়ে প্রবেশ করিতেছে, এবং হৃদয়কেও জড়বৎ করিয়া তুলিয়াছে। যে হৃদয় এক দিবস স্নেহ, ভক্তি, দয়া প্রভৃতির উৎস ছিল, আজি তাহা কেবল মাত্র রক্তস্থালীতে পরিণত হইতেছে এবং ভক্তি প্রীতির পরিবর্ত্তে তাহাতে কেবল অম্লযান যবক্ষারযান প্রভৃতি পাষাণ মাত্র লক্ষিত হইতেছে। যে হিন্দু পরিবার হৃদয়-শিক্ষার গুণে জুড়াইবার স্থান ছিল, আজি তাহা জড়বাদের গুণে কঠোর বলিয়া বোধ হইতেছে। বিজ্ঞানের আলোচনায় জ্ঞান বৃদ্ধি কর, তাহাতে আপত্তি করি না; কিন্তু তাই বলিয়া হৃদয়কে জড়পিণ্ডবৎ করিয়া ফেলিবে কেন? যাঁহার হৃদয় নাই, তিনি যদি জ্ঞানে অদ্বিতীয় হন, তথাপি তাঁহার সহিত মিত্রতা করিতে চাহি না; আর হৃদয়বান যদি নিরক্ষর হন, তথাপি তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিতে প্রস্তুত আছি। বস্তুতঃ যাঁহার হৃদয়ের শিক্ষা হয় নাই, তিনি যদি জ্ঞানী, তবে মূর্খ কে? হৃদয়হীন জ্ঞানে প্রয়োজন কি? জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত সমাজ অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়বান সমাজ অপেক্ষা অনেক অংশে হীন। যদি বর্ত্তমান হারে হৃদয়-শিক্ষার

অবনতি হয়, তাহা হইলে সমাজের অধঃপতন সুদূরস্থিত নহে। কেবল কঠোরতা কোন সমাজেরই মূল ভিত্তি হইতে পারে না,—অমিশ্র জ্ঞানের সমাজ চলে না। কঠোরতার সহিত কোমলতার বিমিশ্রণ অনিবার্য্য—জগৎ সংসার কঠোরে কোমলে রচিত,—এক জগৎকারণও পুরুষ ও প্রকৃতির মিশ্রণে উৎপন্ন।

এই জন্য বলিতেছিলাম, সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনা করা বর্ত্তমান সমাজের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় বিষয়। সঙ্গীতে যে হৃদয় কোমল হইবে এবং হৃদয় কোমল হইলে হৃদয়-শিক্ষার পক্ষে বিলক্ষণ উপযোগী হইবে, তৎপক্ষে কিছু মাত্র সংশয় নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে, ইংরাজ শাসনের প্রণালীতে, জ্ঞানজনিত অভাব বৃদ্ধি নিবন্ধন এবং ইত্যাকার কয়েকটী কারণে আমরা জড়বাদী হইতে বসিয়াছি, এবং আমাদিগের হৃদয়ের মহত্তর ভাব সকল লুপ্তপ্রায় হইতেছে। আমাদের সংসারও সেই সংক্রামকতা দোষে এক অভিনব বিকটরূপ ধারণ করিতেছে। অতএব যদি সমাজের মঙ্গল চাও, তবে হৃদয়-শিক্ষায় মনোযোগী হও এবং হৃদয়-শিক্ষার এক প্রধান শাখা সঙ্গীত-শিক্ষার পক্ষপাতী হও। যদি পুরুষ ও প্রকৃতিতে বিশ্বাস থাকে, তবে কঠোরে কোমলে মিলন করিতে শিক্ষা কর।

শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

আর্য্যাবর্ত্তে বঙ্গ-মহিলা।

লৌহদ্বার। (গেট।)

দুর্গে প্রবেশ করিতে হইলে এই ভীমকায় অভেদ্য লৌহদ্বার অতিক্রম করিতে হয়। ইহা অচল অটলভাবে প্রহরী স্বরূপ দাঁড়াইয়া অদ্যাপি যেন রাজপুরী—কেল্লা রক্ষা করিতেছে। দুর্জ্জয় অনীকিনীর অনিবার্য্য তরঙ্গাভিঘাতে তাহার ঐতিহাসিক বিপুল কলেবরে একটুমাত্র শিথিলতা স্পর্শ করিতে পারে নাই, সে লৌহতনু এমনি সুদৃঢ়রূপে গঠিত যে, অতীতের শত শত বীরবাহুর বজ্র প্রহার এবং সমরোন্মত্ত হস্তীর উৎপীড়ন কেবল মাত্র উদার বক্ষে সহ্য করিয়াছে এবং অবিচলিত রুদ্ধ প্রাণে প্রভুর রাজ্য ঝন্ ঝনাৎ শব্দে রক্ষা করিয়া কর্ত্তব্য পালনে রত রহিয়াছে। তাহাকে স্বর্গের প্রথম সোপান, মুক্তির দ্বার বলিতে পারা যায়। এই দ্বার পথে প্রবেশ করিয়া দুর্গ-হৃদয়স্থ বিচিত্র রাজনগরী সহসা চক্ষের উপর প্রভাসিত দেখিলে দ্রবীভূত হৃদয়ও আনন্দে শতধা উথলিয়া পড়ে। বিস্ময়প্লাবিত নেত্র কি ছাড়িয়া কি দেখিবে, তাহা বুঝিতে পারে না, অনিমিষে চাহিয়া চাহিয়া কেবল মুগ্ধপ্রায় হইয়া থাকে।

কেল্লা।

দরবার নিকেতন "দেওয়ানআম ও দেওয়ানখাস" "রঙ্গমহল মতি মসজিদ" এবং স্নান-সৌধ "হামাম" প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন স্বনামখ্যাত চারু হর্ম্ম্যে বিরাজিত কেল্লা শারদীয় প্রতিমাসম ত্রিদিব সৌন্দর্য্যে বিভাসিত। কত মণি মুক্তার প্রবাল ভূষণে এই সকল রমণীয় সৌধমালার কমনীয় কান্তি যেন

শশাঙ্ক-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এখন যদিও সে দিনের সে পৌর্ণমাসী দীপ্তিনিভ জীবন্ত মধুরিমা আজ নাই, তবুও ধরাতলে এ দ্বিতীয় ইন্দ্রালয় অতুলনীয় রূপে চির প্রস্ফুটিত। এ রাজপ্রাসাদ অদ্য পরিত্যক্ত ও জীবনবিহীন নির্জ্জনতায় বিষাদপূর্ণ। সম্রাটহীন সাম্রাজ্য, প্রাণীশূন্য স্থআশ্রম এবং পতি-বিয়োগ-বিধুরা হিন্দুনারী যেমন অশ্রু-ময় শোকের প্রতিচ্ছায়া, ইহাও তেমনি।

"হামাম"
(স্নানাগার)

রাজকীয় গৌরবের এবং বাদসাহী বিলাসের চরমোৎকৃষ্ট পূর্ণ নিদর্শন এই অবগাহন মন্দির। শুভ্র মর্ম্মর-বিনির্ম্মিত স্তম্ভময় তিন বৃহৎ মনোহর প্রকোষ্ঠ অতি উপাদেয় প্রস্তর খণ্ডে সুসজ্জিত এবং তাহার প্রতি কক্ষের অন্তরবস্থিত কৃত্রিম উৎসময় রম্য সরিৎসহ বহুবিধ নল এমনি সুকৌশলে সংলগ্ন রহিয়াছে যে, তাহাতে বিনা সাহায্যে স্নানকালীন স্বচ্ছ বারি আপনা হইতে নির্গত হয়। কোন নল উষ্ণ, কেহ বা আবার সুশীতল নীরধারা মুগ্ধ প্রাণে বহন করিয়া সরসীমাঝে সম্মিলিত আলিঙ্গনে উছলিয়া পড়ে। সেই লীলাময় স্নিগ্ধোষ্ণ প্রেম-প্রপাতে চারু অঙ্গ ভাসাইয়া জোৎস্নাময়ী বিদ্যাধরী রূপিণী নৃপেন্দ্র-কণ্ঠহার মহিষীগণ যখন জলকেলী করিতেন, তখন সুবাসিত উৎস-সলিলে রূপলহরী আহ্লাদে ছুটাছুটি করিত। চকিত বায়ু-গবাক্ষপথে সে সৌন্দর্য্য-চুম্বিত সুরভি মাখিয়া রাজসমীপে বার্ত্তাবহন করিলে, সুবাস-সেবিত সমীরণে প্রিয়তমার সাঙ্কেতিক স্পর্শানুভবে স্বয়ং দিল্লীশ্বরও চঞ্চলচিত্ত হইতেন এবং সভাভঙ্গে প্রেয়সী বেগম সহিত বিলাসাবগাহনে মধ্যাহ্ন প্রণয়োপভোগ করিতেন। জানিনা, এই শিল্প চারু চির-বসন্তময় শীতল শিলা-হর্ম্ম্যে সুরভি নির্ঝর-নীরে, প্রিয়জন-মিলিত নিদাঘ মধ্যাহ্ন-স্নান, এ তাপ-দগ্ধ দেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর কোন ভগিনী কল্পনায় অনুভব করিয়া হিংসনীয় মনে করেন কিনা।

"ময়ূর সিংহাসন।"

একে একে হর্ষ বিষাদে আমরা মোগল-গৌরবের চিহ্নগুলি দর্শন করিয়া ক্রমে দুর্গ-পরিহার সময় "ময়ূর সিংহাসন" দেখিতে গেলাম। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" পূর্ব্বে যে সিংহাসন আলোকিত করিয়া বসিতেন, সেই দেবদুর্ল্লভ "ময়ূর সিংহাসন" বহুদিবস পারস্যে চলিয়া গিয়াছে। এখন তাহার স্থানে শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের এক সামান্য সিংহাসন সাক্ষীগোপাল রূপে রক্ষিত হইয়াছে। রূপ গুণসম্পন্ন একমাত্র প্রিয়পুত্র বিয়োগে ধনবতী বিধবার শূন্যগৃহ যেমন উপগণ্ড পোষ্য পুত্রদ্বারা পূর্ণ করা হয়, এও তেমনি। আবার যেমন প্রাণাধিক পুত্ররত্ন জাহ্নবী-তীরে জ্বলন্ত চিতায় ভস্মীভূত করিয়া দিয়া, শোকাকুলা জননী, ইহ সংসারে নিজ শিশুর জীবনের ছায়ারূপী পালিত পোষ্যমুখ দর্শনে কখনও দগ্ধ-হৃদয় জুড়াইতে পারেন না, সেই প্রকার পূর্ব্বের সে তপ্ত-কাঞ্চন-গঠিত ময়ূর শরীরে নানাবিধ মাণিক্য-প্রতিফলিত-বর্ণের অপূর্ব্ব সিংহাসনের বিনিময়ে এ ব্যঙ্গাত্মক শিলাসন ভারতবাসীর নয়নে কেবল মাত্র শোক-চিহ্ন।

সুবর্ণ-খচিত কিংখাপে মৌক্তিক ঝালর শ্রেণীর আবরিত চন্দ্রাতপ তলে বিচিত্র 'বারখাম্বা' বেষ্টিত ময়ূর সিংহাসনে উপবিষ্ট ভারতেশ্বর যেন—

"কনক আসনে বসি দশানন বলী"

যৎকালে 'পাত্রমিত্র সভাসদ' সহ সেই ভূতলে অতুল সভায়, উৎসব দিনে, আম-খাসে বাদসাহগণ ময়ূরাসনে দরবারে বসিতেন, তখন রত্নরাজির রশ্মিপ্রভায় নিশীথে সূর্য্যোদয় হইত এবং বিভাবরী তামসী অঙ্গে ভানু-দীপ্তি নিরীক্ষণ করিয়া বিষণ্ন মনে যেন অনাশ্রয়ে দিল্লীর সুদূর প্রান্তরে একক ঘুরিয়া ঘুরিয়া পথ খুঁজিয়া বেড়াইত।

"জুম্মা মসজিদ্।"

'রত্নসৌধ কিরীটিনী' দুর্গ ছাড়িয়া দিন-মণির কিরণমালা-শোভিত জুম্মামসজিদে যখন পৌঁছিলাম, তখন দিবসের কলরব থামিয়া চারিধারে কেবল নীরব শান্তি বিরাজ করিতেছিল, ক্লান্ত আমরা জুম্মার শীতল সোপানে ক্ষণকাল বিশ্রামার্থে বসিলাম। অসময় ভ্রমণে পশ্চিমের দুরন্ত মার্ত্তণ্ড তাপে আমাদিগের মস্তক বড় ব্যথিত করিয়াছিল।

হিন্দুর জগন্নাথ দেবমন্দির এবং মুসলমানের জুম্মা ভারতীয় সৌধ-জগতে দুই অলৌকিক কীর্ত্তি। এমন বৃহৎ অপরূপ শিল্পময় ভজনালয় ভারতে কুত্রাপি আর নাই। রাজেন্দ্র-দুর্লভ প্রেমজাত 'অপ্রতিম অপার্থিব' তাজ সমাধি পরে, এই পবিত্র জুম্মা মস্জিদ্ অমূল্য মর্ম্মর প্রস্তরে তুষার ধবল লাবণ্যে রচিত। শরচ্চন্দ্রের নির্ম্মল কৌমুদীহাস্য কঠিন শিলাখণ্ডে সযত্নে জমাইয়া যেন জ্যোৎস্নায়, বিরহীর বিজন সঙ্গীতের সুখস্বপ্ন তুলিকায়, স্বর্গ-শিল্পী স্বয়ং ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়া, ইহার প্রকাণ্ড বরবপুঃ ললিত পাষাণ পটে চিত্র করিয়া গিয়াছেন। বহু যোজন বিস্তৃত করিয়া, উচ্চ ভূমি অধিকার করিয়া, উন্নত গগন-স্পর্শীশিরে জুম্মা মস্জিদ্ এমনি সগৌরবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে যে, দিল্লী মহানগরীর সর্ব্বত্র হইতে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।*

শুভ্র মস্জিদ-প্রাঙ্গণ-সরোবরে পূত যমুনা-বারি অন্তঃসলিলে বহিয়া অদৃশ্য-খনিত খাতযোগে ধীরে ধীরে আসিয়া থাকে এবং বর্ষা সমাগমে বারি পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

"কামিনীর কমনীয় কণ্ঠ ভূষাহারে,
দ্যুতিমান মধ্যমণি যেমন সুন্দর সেইরূপ"

সর্বা নীরে উচ্ছ্বসিত এই মানস-সরসী অপ্রতিম শোভা ধারণ করে। নমাজ কালীন বাদসাহগণের, মনের নহে, পাপমালিন্য হস্ত পদের প্রক্ষালনার্থে ইহার সৃষ্টি। এখনও কতক পানীয় স্বচ্ছ সলিল ইহাতে দেখিয়া আমরা আগ্রহে তাহা চোখে মুখে সিঞ্চন করিয়া দারুণ তৃষ্ণা এবং পথ শ্রান্তি দূর করিলাম।

সে কালের সৌভাগ্য দিনে, বিশেষ কোন পর্ব্বোপলক্ষে, বিংশতি সহস্রাধিক মুসলমান নাকি বাদসাহ সহিত জুম্মা মসজিদে একত্র উপাসনা করিত এবং তাহার ভিতর প্রথিত দুই পৃথক পাষাণ মঞ্চে আরোহণ করিয়া সম্রাটগণ পুরোহিত

* "In all Delhi, the highest building is the Jumma Musjeed, towering above every other object, and seen from every part of the city."

Travels of a Hindoo.

(মোল্লা) সহ তার স্বরে সাধারণের নিমিত্ত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন। সাজাহান ও বাহাদুরসার হস্তাক্ষর "কোরাণ সরিফে" এখানে প্রতিবিম্বিত রহিয়াছে। সুবিখ্যাত জুম্মার নির্ম্মাণ কার্য্য পরিসমাপ্ত করিতে প্রায় বিংশতি বর্ষ এবং দশ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে।*

"হেন শান্ত সুপবিত্র আশ্রমে" বাদসাহ আরঙ্গজীব দিবসে একবার যখন রাজকীয় সমারোহে দেবারাধনে আসিতেন, সে সময় দিল্লীর সুপ্রশস্ত রাজবর্ত্ম উৎসাহিত জনস্রোতে তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিত, এবং সম্রাট-দর্শনাভিলাষী সচঞ্চল প্রাণী কল্লোল থামাইতে শান্তিরক্ষকও পরাজয় মানিত।

অদ্যকার এই তমসাচ্ছন্ন নীরব জুম্মামন্দিরে দাঁড়াইয়া ভূতস্মৃতি-জীবিত আমি অতীতের সে দৃশ্যময় স্বজনতা কল্পনার দিব্য চক্ষে আমার চারি দিকে যেন জীবন্ত রূপে ভাসমান দেখিতে পাইলাম। সে শোভার কাল্পনিক চিত্র আমার দ্রবীভূত হৃদয়কে মন্ত্রমুগ্ধবৎ করিয়া তুলিল—প্রাচীন দিল্লী—প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ—প্রাচীন রোম, প্রাচীন এথেন্স—প্রাচীন অযোধ্যা, তোমরা আজ কোথায়?

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ-ক্ষিপ্ত সিপাইগণ সদলে জুম্মার পবিত্রশান্তি ভঙ্গ করিয়া তাহাদিগের উন্মত্ত সহবাসে জুম্মাকে হিংস্রক শ্বাপদ-সঙ্কুল ভীষণ অরণ্যে পরিণত করে এবং তাহাকে ধ্বংশপুরে পাঠাইয়া দুরন্ত সিপাইগণকে বিতাড়িত করিবার সময়োচিত রাগান্ধ পরামর্শ ইংরাজ গবর্ণমেন্ট কার্য্যে প্রতিপালন না করিয়া অবশ্যই সমগ্র ভারতবাসীর নিকট অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

রজনী সন্দর্শনে আমরাও বাসায় ফিরিলাম। "শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত যামিনীর" নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সুদূর প্রাসাদ শিরে কে তখন গাইতেছিল, তা জানি না, কিন্তু তাহার সে বালকণ্ঠ নৈশ নীলাম্বর প্রতিধ্বনিত করিয়া আমার প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিল। তাহাতে এক যুগের সুখ দুঃখের অস্ফুটস্মৃতি জাগিয়া উঠিলে, সকল দিনের প্রিয়দৃশ্য বিস্মৃতি ছায়ায় রাখিয়া দিয়া, সেই সঙ্গীতের স্বরস্রোতে আমি কোথায় ভাসিয়া গেলাম, বলিতে পারি না। সে গীত যে না শুনিয়াছে, তাহার জীবনই বৃথা। বৈষ্ণবকবিগণই যথার্থ প্রেমিক।

(সুহই।)

"বঁধু কি আর বলিব আমি,
জীবনে, মরণে, জনমে জনমে,
প্রাণনাথ হৈয় তুমি।
তোমার চরণে আমার পরাণে,
বান্ধিল প্রেমের ফাঁসি,
সব সমর্পিয়া এক মন হৈয়া,
নিশ্চয় হলাম দাসী।"

চণ্ডীদাস।

(ধানসী।)

"রূপ লাগি আঁখি ঝরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিত লাগি থির নাহি বান্ধে।'

জ্ঞানদাস।

* The Jumma musjeed was commenced in 1629, and finished in 1648. It is said to have cost ten lacs of Rupees."

Travels of a Hindoo.

এই অপূর্ব্ব মহাজন পদাবলী—প্রেম-গীতে নিরাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করে, ভাবুকের চিন্তাস্রোতে নব নব ভাব-লহরী তুলিয়া দেয়, এবং প্রবাস-পীড়িত প্রণয়ী-প্রাণে মিলনের স্পর্শমণি ছুঁয়াইয়া যায়, তখন জাগ্রতে কি স্বপ্নে, প্রিয়-সমাগম-সুখানুভবে কল্পনার মানস-মন্দিরে বিরহীর দগ্ধচিত্ত জুড়াইয়া থাকে। প্রেমের এই পূর্ণ বিকশিত আত্মহারা সঙ্গীত যদিও আমার নিকট—"A voice, a mystery" তবু, আমি সেই অপরিচিত অদৃশ্য গায়ক কিম্বা গায়িকাকে বলি—

"O blessed bird, the earth we pace,
Again appears to be
An unsubstantial, fairy place;
That is fit home for Thee"

Wordsworth.

"হুমায়ু মাকবারা"

(বাদসাহ হুমায়ুনের সমাধি-মন্দির।)

আবার তৃতীয় দিবস আহারান্তে আমরা প্রথমেই সম্রাট হুমায়ুনের বিখ্যাত সমাধি স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। এই পবিত্র শুভ্র সমাধি-মন্দির প্রণয়িনী ভার্য্যার প্রাণপতি-বিয়োগ শোকের অমূল্য স্মৃতি চিহ্ন। পঞ্চদশ লক্ষ মুদ্রায় এবং ষোড়শ বর্ষ ব্যাপী পরিশ্রম-নির্ম্মিত এই হর্ম্ম্য সমাধি মৃত স্বামীর স্মরণার্থ হামিদা-বানু বেগম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সেই সুন্দরী ললনার বৈধব্য-কাতর শোকাশ্রু সুদীর্ঘ নিশ্বাস সহ যেন অদ্যাপি ইহার বর্ষীয়ান অঙ্গের চারু শোভা সম্পাদন করিতেছে। কত যুগান্তের কঠোর বিস্মৃতি তাহার শরীরের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তথাপি সতীর পবিত্র নেত্রবারি মুছিয়া ফেলিতে পারে নাই। বাদসাহ হুমায়ুন যেরূপ দুর্দ্দান্ত ছিলেন, তাঁহার সমাধি-অট্টালিকাও তদ্রূপ। নিরেট শিলাময় সুদৃঢ় সুদীর্ঘ কলেবরে ঐতিহাসিক যুগের প্রকাণ্ড পাষাণমন্দির 'মাকবারা' আজিও অভগ্ন এবং সকলের প্রিয় দর্শন। আভ্যন্তরিক প্রাচীরের ললিত কারুকার্য্যের রমণীয়তা এখনও কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। তবে শূন্যতার আঁধারে কপোত কপোতী সুখে নীড় বাঁধিয়া শাবক-কূজনে তাহাকে যেন বিহঙ্গমাশ্রম করিয়া তুলিয়াছে এবং রাজ-পথের অনিবার্য্য ধূলিকণায় তাহার বাহিরের সৌন্দর্য্য আর এক অভিনব কৃত্রিম বর্ণ ধারণ করিয়াছে।

হুমায়ুন বঙ্গমাতার নিকটও অপরিচিত নহেন। তাঁহারা অদ্যাপি প্রতিনিশায় দুরন্ত বালক বালিকাকে নিদ্রিত করিতে যে 'হুমো এলো' বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই 'হুমোই' হুমায়ুন নামের অপভ্রংশ এবং তাঁহার সমাধি মোগল প্রাসাদের অক্ষয় কীর্ত্তি।

বেগম ললাম হামিদাও প্রাণেশ্বরের সমাধি শয্যার বাম প্রকোষ্ঠে চির-নিদ্রিতা আছেন। তিনি ব্রাহ্মণ কন্যার ন্যায় বৈধব্য-জীবন ব্রতাচারে কাটাইয়া অন্তিমে স্বামীর পার্শ্বে শান্তি লাভ করিয়াছেন। লাবণ্য-গঠিত 'তাজমহল' যেমন পতিপ্রেমে, এই 'হুমায়ুমাকবারা'ও সেইরূপ পত্নীপ্রেমে উৎসর্গীকৃত অমানুষিক জয়স্তম্ভ।

---

* The Mausoleum was erected at the cost of fifteen lacs of rupees, in Sixteen years, from 1554 to 1570."

Travels of a Hindoo.

'হুমায়ুমাকবারার' অনতিদূরে অসংখ্য বেগম, সাজাদা, সাজাদি (রাজকুমার, কুমারী) ও অন্যান্য রাজপরিবার-লোকের অন্ধকার ছায়া স্বরূপ যত্ন-গ্রথিত সমাধিতলে শায়িত রহিয়াছেন। সেই সকল শিল্পময় সমাধিমঞ্চ কালের ভীষণ বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু সে শ্মশান-মৃত্তিকায় শোক-চিহ্ন এখনও জীবন্তভাবে মূর্ত্তিমান। অসংখ্য পুত্র-শোকাতুরা মাতার, পতি-বিয়োগ-বিধুরা কামিনীর এবং স্নেহময়ী সহোদরার শোকাশ্রু-প্লাবিত ভগ্ন পাষাণস্তূপ নিরীক্ষণ করিলে শোকার্দ্র হৃদয় স্বতঃই দ্রবীভূত হইয়া যায় ও অনেকের পক্ষে অশ্রুনীর নিবারণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

পূর্ব্ব-সৌভাগ্যের দিনে এ সকল ভগ্ন সমাধি নিশীথে দীপালোকে ও দিবসে রাজভোগ সম্ভারে সুসজ্জিত হইয়া মৃতের গৌরব রক্ষা করিত। এখন তাহা শৃগাল কুক্কুরের আবাস স্থান হইয়া উঠিয়াছে এবং ফুলমালার পরিবর্ত্তে নানাবিধ আরণ্য পাদপ নিচয়ে তাহাকে ছায়াময় করিয়াছে। কোন কোন সমাধির সুবর্ণাক্ষর বিলুপ্ত-প্রায়, কাহার বা এখনও দু, চারি অক্ষর পড়িতে পারা যায়। আরবা, পারস্য ভাষায় লিখিত গুণাবলীর অর্থ আমরা মৌলবীর সাহায্যে কতক বুঝিলাম। একটী সপ্তদশ-বর্ষীয়া বালিকার অলৌকিক প্রতিভাময় দেবত্ব-কাহিনী, তাঁহার জনকের শোকাভিভূত হৃদয়ের স্নেহপূত পবিত্র ভাষায় সংস্কৃতে রচিত পড়িয়া চক্ষে জল আসিয়াছিল। সে গদ্য কাব্য যেন অপূর্ব্ব ছন্দময়ী কবিতার স্বর্গীয় সৌরভে, ছায়া পথে তারকাবৎ ফুটিয়া রহিয়াছে। ছায়া পথ আলোকিত করিয়া সে নাক্ষত্রিক প্রতিভা আজিও দর্শক প্রাণে রশ্মিকণা প্রতিভাত করিতেছে। তাহা অনন্ত, অমর, অবিনশ্বর দীপ্তিপূর্ণ।

শ্রীমতী নীহারিকা দেবী।

অন্ধকার-সাধন।

প্রকৃতির দুই রূপ—আলোক ও আঁধার। একরূপ সংসার-সুখরূপ মহা আসক্তির প্রতিকৃতি, আর একরূপ দুঃখ-শ্মশানরূপ মহা বৈরাগ্যের ছবি। একরূপ আসক্তি-রূপিণী অন্নপূর্ণা, আর একরূপ বৈরাগ্যরূপিণী শ্মশানকালী। অধিকাংশ মানুষ এই দুই রূপের মধ্যে সাধারণত আলোকের বা আসক্তির উপাসক। অন্ধকারে বসিতে, শ্মশান চিন্তা করিতে, মহাকালীর অনন্ত রূপ ধ্যান করিতে মানুষ বড়ই নারাজ।

মানুষ বড়ই আলোক-প্রিয়। মানুষ অন্ধকারেও বাতি জ্বালাইয়া রূপ দেখে, বা রূপে মজে। অথবা মানুষ রজনীর চেয়ে দিনকে অধিক ভালবাসে,—রজনী প্রভাতে তাই তাহার কত আনন্দ, কত হাসি, কত মধুর উৎসব! রজনী আগমনে মানুষের শরীর অবসন্নতা ও জড়তা অনুভব করে, আঁখি মুদিত হইয়া আইসে, মহা অচৈতন্যে সে ডুবিয়া থাকে। আর সূর্য্যোদয়ে, আর আলোকের সমাগমে সে প্রভাত-গগন কাঁপাইয়া, প্রভাত-বায়ু আন্দোলিত করিয়া, উৎসবের মধুর সঙ্গীত ধরে। রজনীতে

নিরানন্দভাব, অবসন্নভাব; দিবসে উল্লাস-হাসি, আসা-যাওয়া, কাজ কর্ম্ম, কত কি! মানুষ বড়ই আলোক-প্রিয়। মানুষ যেন আঁধার রাজ্যের জীব নয়—সংসার আলোকের সেবক।

কেন এরূপ? না—মানুষ বাহ্য-শোভা-সৌন্দর্য্যের দাস। রূপজ-মোহ মানুষের গতি-নিয়ামক। "দেখি দেখি, আরো দেখি, ছি ও প্রফুল্ল মুখ বসনাধাঁরে ঢাকিও না, আমার প্রাণে দুঃখের বাণ বিদ্ধ করিও না।"—মানুষ নীরবে এবং সরবে সদা যেন এই কথাই পরস্পরের নিকট ঘোষণা করিতেছে। ফুলের বাগান বা রূপের বাগানে বসিয়া মানুষ প্রণয়-মালা গাঁথে, আর হাসে, গায়, নাচে। কেবল রূপ-পিপাসা, কেবল সৌন্দর্য্য-লালসা, কেবল চাওয়া-চাওয়ি-ভাব মানুষের হাড়ে মাংসে জড়িত। এই জন্যই মানুষ অমাবস্যার রাত্রি অপেক্ষা পূর্ণিমাকে অধিক ভালবাসে। মানুষ বলে, "চাঁদ, আমার প্রাণ কাঁদা'য়ে তুমি অস্ত যেও না,—তোমার পায়ে ধরি, আমায় মের না!" মানুষ বড়ই রূপ-প্রিয়, বড়ই সৌন্দর্য্য-প্রিয়। প্রকৃতির দুই রূপের এক রূপ লইয়াই সে ব্যতিব্যস্ত।

আমরা দেখিয়াছি, যত দিন মানুষের এই বাহ্যরূপ-প্রিয়তা থাকে, ততদিন অরূপ-প্রিয়তা অর্থাৎ চিন্ময়-রূপ-প্রিয়তা অনেক দূরে। যতদিন আলোক-প্রিয়তা, ততদিন আঁধার-প্রিয়তা মানুষের স্বভাব-বিরুদ্ধ। "আমার এই চোক থাকিতে আমি দেখিব না?—অনন্ত প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিব না?—চোক বুজিয়া বসিয়া আঁধারের সেবা করিব?—ধ্যানস্থ হইয়া নিরাকার শূন্য চিন্তা করিয়া জীবন কাটাইব? তোমার এ উপদেশ ঐ কর্ম্মনাশার জলে ফেলিয়া দেও, আমি ভরা যৌবন লইয়া পৃথিবীর রূপ কিনিয়া, রূপ বেচিয়া ঘুরিব, ফিরিব;—আয় সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি, তুই শোভা সৌন্দর্য্য লইয়া আয়, আমি তোতে মজিয়া ডুবিয়া মানুষ হই।"—মানুষ প্রতিনিয়ত এই কথাই ঘোষণা করিতেছে। সৌন্দর্য্য-জগতের দাসত্ব করিতে মানুষের প্রাণ সদাই ব্যতিব্যস্ত। আলোক, সৌন্দর্য্য-প্রকাশক, তাই আলোক দেখিলে তার জড়তা ও অবসন্নতা দূর হয়। মানুষ চোক বুজিলে আঁধার দেখে, তাই চোক বুজিয়া চেতন-বিশিষ্ট থাকিতে পারে না। হয় চোক বুজিয়া সে ঘুমাইবে, না হয় চোক মেলিয়া শোভা দেখিবে। পূর্ণিমার পরিবর্ত্তে অমাবস্যা সে দেখিতে চায় না, সে দেখিতে পারে না। মানুষের স্বভাবই এরূপ নয়। একজন লোক অন্ধকারে বসিয়া থাকিবে, মানুষের ইহাও সহ্য হয় না। সে নিজেও অন্ধকারে থাকিবে না, অন্যকেও অন্ধকারে বসিয়া থাকিতে দিবে না। সে আলো ধরিয়া অন্যের মুখ-শোভা দেখিবেই দেখিবে। মানুষের এ কি প্রকৃতি!

মানুষ যতদিন সৌন্দর্য্যের উপাসক, ততদিন এরূপ না হইয়াই পারে না। আলোক, সৌন্দর্য্য-প্রকাশক। আকাশের পূর্ণ চাঁদ কত মিষ্ট, বাগানের অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত ফুল কত মধুর, পাহাড়ের কুল-কুল-নাদী ঝরণা কত মনোহর। বিশ্বেশ্বরের অরূপ জমিয়া জমিয়া যেন এই সকলে মনোহর রূপ ফুটিয়াছে। ইহাতে কত ভাব, কত শিক্ষা, কত দর্শন, কত কাব্য, কিন্তু ইহা বুঝে কয় জন? মানুষ বুঝে না, তবুও পাগল হইয়া দেশে বিদেশে যাইয়া

কত শোভা সৌন্দর্য্য দেখে; কত অর্থ, কত পরিশ্রম ব্যয় করে। রূপ-পিপাসা মিটাইবার জন্য কত আয়োজন, কত চেষ্টা! ধন, মান সর্ব্বস্ব এজন্য মানুষ ঢালিয়া দেয়। সৌন্দর্য্যের মূলে যে চিৎঘন আনন্দরাশি বিদ্যমান, বাহ্য-সৌন্দর্য্যকে সেই আনন্দরাশি হইতে পৃথকরূপে মানুষ যতদিন ভাবে, ততদিনই এরূপ অবস্থা। অর্থাৎ সৌন্দর্য্য-জ্ঞাপক বা বিভিন্নত্ব-প্রকাশক আলোক ততদিন মধুর, যতদিন একত্ববোধ বা অরূপ-বোধ জন্মে না। সে কেমন কথা, ক্রমে বলিতেছি।

সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা মানুষের আদি স্বভাব, কুরূপ-প্রিয়তা মানুষের পরিণাম। অথবা মানুষ আদিতে সুন্দর, অন্তে কুৎসিৎ বা কদাকার। ছোট শিশুর কচি কণ্ঠের মিষ্ট কথা কত সুখ দিত, কিন্তু সে শিশু আজ আর শিশু নয়। আজ সে যুবক। যুবকের শোভা আরো মধুর,— রূপের বাজারে কত আনন্দ, কত বিবাহের উৎসব, কত বসন্তের কেলি। কিন্তু স্থির হও, আজ কাল করিতে করিতে,দেখিতে দেখিতে, কয়েকটী বৎসরমাত্র যাইল, অনন্তের এক বিন্দুমাত্র যাইল, আর এ কি হইল! রূপ— এখন অরূপ ধরিতেছে;—সৌন্দর্য্য এখন বিলীন হইতেছে। ক্ষীণ দেহ, গলিত-চর্ম্ম, পক্ক কেশ, শূন্য-দন্ত, কর্কশ স্বর, দুর্ব্বল মস্তিষ্ক— চরণ আর চলিতে চাহে না, হাত আর নড়িতে পারে না;—এ কি ভাব, হায়! ভবের বাজারে দু দশদিন পূর্ব্বে যে রূপের গৌরবে গর গর করিয়া বেড়াইত, তার আজ এ কি বেশ! একদিন দেহ-শোভার উপরে আবার কত বসন ভূষণের শোভা চড়িয়াছিল, আজ সে সাধই বা কোথায়, সে সৌন্দর্য্য-বোধই বা কোথায়, সে রূপই বা কোথায়? মানুষ যায়,যায়,যায়, ঐ দেখ, মহা আঁধারে সে ডুবিতে মহা যাত্রা করিয়াছে! রূপ এখন অরূপ, সৌন্দর্য্য এখন কুরূপ,— এখন মানুষ আঁধার চায়, এখন মানুষ কৃষ্ণরূপী অজপা হরিনাম জপ করে, এখন মানুষ করালবদনী কালীর নাম উচ্চারণ করে, আঁধার ভস্ম গায়ে লেপে। যুবকের মুখে রাধার নাম শুনিলে শুনিতে পার, কিন্তু কৃষ্ণের নাম বড় একটা শুনিবে না;— যুবকের মুখে গৌরাঙ্গিনী অন্নপূর্ণার নাম শুনিলে শুনিয়া থাকিবে, কিন্তু মহামায়া কালী,—শ্মশানবাসিনী,—এলোকেশী,—উগ্রচণ্ডী, মুণ্ডমালিনীর সেই প্রলয়ঙ্করী, সেই বিশ্ব-বিনাশী ভয়ঙ্কর নাম শুনিবে না। কিন্তু বৃদ্ধ, তার এখন রূপ গিয়াছে, তার এখন সাধ গিয়াছে, সে এখন দিবানিশি কৃষ্ণ নাম জপে, সে এখন দিবানিশি আঁধারে বসিয়া শ্মশানকালীর ধ্যান করে, সে এখন মরণকে স্মরণ করে, সে এখন শ্মশান-ভস্ম গায় মাখে। সে এখন অমাবস্যাকে,— মহামরণকে লক্ষ্য করিয়াছে। অন্নপূর্ণা সংসাররূপিণী, কালী শ্মশানরূপিণী।

আমি যে কথা বলিতেছিলাম,—আসক্তি-সুখ যুবকের নিকট আদরের হইলেও বৃদ্ধের নিকট নয়। তবে বৃদ্ধের মধ্যেও লম্পট গোছের লোক আছে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। আলোক আসক্তিকে বৃদ্ধি করে, সুতরাং বৈরাগ্য-সেবক বৃদ্ধের নিকট তাহা বড় একটা আদরের নয়। যে দেশের লোক গহন বনে, বিজন অরণ্যে, গভীর গিরি-গুহায় যাইয়া এক সময়ে পরমাত্মার চিন্তা করিত, যে দেশের লোকে অন্ধকারে বসিয়া নাম-মালা জপিত বা সান্ধ্য-ধ্যান করিত, সেই দেশের লোকেরা এখন শাঁক

ঘণ্টা বাজাইয়া, আলোকের ধারে আলো জ্বালিয়া মহা ধূমধামে ইষ্টদেবতার আরতি করে। যে দেশে নির্জ্জন খোলা ময়দানে গভীর অমাবস্যায় শ্মশানকালীর পূজা হইত, সে দেশে আজ কাল নগরকালীর পূজা চলিতেছে;—ধর্ম্মের নামে মদ বেশ্যায় দেশ ডুবিতেছে। সে দেশও নাই, এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় সেরূপ সাধকও নাই। আর কাহার কথা বাকী রহিল? ব্রাহ্মসমাজেও দেখি, বাতি জ্বালিয়া চোক বুজিয়া উপাসনা করার ভাব চলিতেছে। বিরোধী ঘটনার সমাবেশ দেখিলে কাহার প্রাণে আঘাত না লাগে? এ দিকে চোক বুজিতে হইবে, অথচ বাতি জ্বালা চাই। একই সময়ে এরূপ আলোক আঁধারের ভাব কেন, আসক্তি বৈরাগ্যের অবস্থা কেন, আমরা বুঝি না। তাই প্রাণে বড় কষ্ট পাই। উপাসনা করিতে যাইবার সময় বেশ-শোভারই বা এত চাকচিক্য কেন? এত বেশ বিন্যাস কেন? এত শোভা সৌন্দর্য্য কেন? এ সকল দেখিলে আসক্তিরই পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজে যে প্রকৃত ব্রহ্মের পূজা হয়, ব্রহ্মের নাম সাধন হয়, ইহা বোধ হয় না। হয় না বলিয়াই বুঝি বা চরিত্রহীন লোকের এত প্রাধান্য। প্রকৃত পূজা আসক্তির রাজ্য হইতে অনেক দূরে, আলোকের অনেক দূরে,—অন্ধকারময় অন্তঃপুরে। এই জন্যই দেখিতেছি, ব্রাহ্মদের মধ্যেও যাঁহারা সাত্ত্বিক গোছের লোক, তাঁহারা অরণ্যে বা নির্জ্জনে বাস করিতেই অধিক ভালবাসেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অনেক দিন সংসারত্যাগী। মহাত্মা কেশবচন্দ্র, শেষ জীবনে পাহাড় পর্ব্বতে, লোকালয় হইতে অনেক দূরে থাকিতেই ভালবাসিতেন। এখন প্রতাপচন্দ্র বা রাজনারায়ণ লোকারণ্য পরিত্যাগ করিয়া নির্জ্জন অন্ধকারে বসিতেই অধিক ভালবাসেন। কিন্তু সমগ্র ব্রাহ্মদেশে এখনও সারি সারি জ্বলিতেছে,—রূপের বাহার, রসের কেলী চলিতেছে। বিধাতা এদেশের এরূপ অবস্থা কত দিন রাখিবেন, কে জানে!

অন্ধকার ভিন্ন বিশ্বেশ্বরের পূজা অসম্ভব। অন্ধকার, অনন্ত-প্রকাশক। সব মিলাইয়া, সব রূপ একীভূত করিয়া, আঁধার বিশ্বেশ্বরের অনন্তত্ব ঘোষণা করে। শিব যিনি, তিনি শ্মশানবাসী, আঁধারময়ী শ্মশান-কালীর সেবক। আর সাধিকা-শ্রেষ্ঠ রাধারাণীর কথা আমি কি বলিব;—তিনি কালরূপ, ঐ আঁধার রূপে যে শোভা দেখেন, পৃথিবীতে এমন শোভা বুঝি আর নাই। আঁধারে কেলী-কদম্ব তলে ঐ আঁধারময় কৃষ্ণের মুখে যখন বাঁশী বাজে, রাধার প্রাণ তখন সংসার ছাড়িয়া ঐ অনন্ত আঁধারে মিলিত হয়, তার প্রাণ দেহ-গৃহে থাকে না। সংসারে থাকিয়াও আঁধারকে যে ভালবাসা যায়, এদেশে শ্রীরাধিকাই তাহার একমাত্র দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। লোকে বলে, যার ঘরে স্বামী আছে, তার আর কিসের অভাব? সংসারে ভরা সুখ:—কিন্তু রাধারাণী ঐ আঁধার, ঐ কৃষ্ণরূপের জন্য সংসার-বিরাগিনী। সব তুচ্ছ করিতেছেন। আছ, থাক; যাইতে ইচ্ছা, চলিয়া যাও। আসক্তি নাই, সংসারের সকল বস্তুতেই তুচ্ছ জ্ঞান,—সকলকে আঁধারে ডুবাইয়া ঐ অরূপকে তিনি ধ্যান করিতেছেন। দর্প করিয়া ননদিনীকে বলিয়া দিতেছেন—"বল ননদিনি নগরে, ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ-কলঙ্ক সাগরে।" পূজা কী সেবার মর্ম্ম ইনিই বুঝিয়াছিলেন। আর যিনি দেবদেব মহাদেব, তিনি চক্ষু নিমীলিত করিয়া বিশ্ব-সংসারকে মহা আঁধারে ডুবাইয়া সেই

আঁধারের মধ্যে অপূর্ব্ব জ্যোতি দেখিতেন। দেখিতেন, ত্রিনয়না কাম ক্রোধ প্রভৃতি অসুর বংশ ধ্বংশ করি ভয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জগৎকে মহা আঁধারের মর্ম্ম শিখাইতেছেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, মানুষ যতদিন বাহ্য শোভার দাস, ততদিন আঁধারকে ভালবাসে না। আয়না ধরিয়া আপন মুখ এবং বাতি জ্বালিয়া অন্যের সৌন্দর্য্য দেখে। পিশাচের লীলাস্থলের ব্যাপার। কিন্তু এই বাহ্য শোভা দেখিতে দেখিতে যখন চক্ষু নিমেষশূন্য হয়, তখন বাধ্য হইয়া এই মহা আঁধারের মর্ম্ম বুঝিতে হয়, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বলিয়াছি, আঁধারই মানুষের লক্ষ্য, বৈরাগ্যই মানুষের পরিণাম। সব ছাড়িতে হইবে, সব রূপ ডুবাইতে হইবে, সব ঘরকন্নার চোটপাট শেষ করিতে হইবে,- সব বাতি নিবাইতে হইবে, তবে সেই আঁধার ঘরের মাণিককে দেখিতে পাইবে। মহা অন্ধকারে ডুবিয়া, আত্মার মূলে নামিলে তবে সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ দেখিতে পাওয়া যায়। "যদি সেই জ্যোতিঃ দেখিতে চাও, অন্ধকার সাধন কর,"— মৃত্যু প্রতিনিয়ত পৃথিবীতে কেবল এই কথাই ঘোষণা করিতেছে। কিন্তু তবুও মানুষ সে কথা বুঝে না, সে কথায় কাণ দেয় না। না দিক্ কাণ, বার্দ্ধক্য ত মানুষকে ভুলিয়া থাকিবার নয়, মৃত্যু ত মানুষকে ছাড়িবে না। ঐ দেখ, আঁধার—আঁধার—; রূপ ডুবাইতে, সব একাকার করিতে কেমন মহা আঁধার আসিতেছে। বৃদ্ধ,- স্থির হও, অরূপ দেখ, করালবদনীর অনন্তরূপ নিরীক্ষণ কর। অনন্ত ভিন্ন আর সনন্ত নাই; ঐ দেখ, সব নির্ব্বাণের কোলে, আঁধারের কোলে ডুবিয়া গিয়াছে। এক অপরূপ জ্যোতি চিরপ্রকাশবান।—সে জ্যোতি চিদঘন আনন্দরাশি।

তবেই বুঝা যাইতেছে, আলোক সংজ্ঞাজ্ঞাপক বা সনন্ত-প্রকাশক, আর আঁধার *অসীম অনন্তত্ব জ্ঞাপক। দিবসে কি দেখি?* বৃক্ষ তলা, ফুল ফল, তুমি সে, যাহাকে দেখি, সবই যেন সনন্ত; সব যেন বিন্দু বিন্দু। এই সনন্তের মধ্যেও অনন্তকে কল্পনা করা যায়, সে স্বতন্ত্র কথা, সেরূপ কল্পনা তোমার আমার পক্ষে সম্ভব নয়। শারদপৌর্ণমাসীর আলোক দেখিলেই আমাদের মন চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয়,—একে ধরি, তাকে ভালবাসি, একে পূজি, তার সেবা করি, কত দেবতা, কত আসক্তি। আর যখন অমাবস্যার ঘোর আঁধার—আকাশ পৃথিবী, নদ নদী, বৃক্ষ তলা, স্ত্রী পুরুষ সব একাকার করিয়া ফেলিয়াছে,—এ চোক আর অন্যরূপ দেখে না, এ প্রাণ আর ভেদাভেদ গণে না,—বিষ্ঠা চন্দন, রাজা প্রজা সমান,—তখন আপনা আপনি এ প্রাণটা যেন কেমন হইয়া যায়। যখন সংসারের আলোকে বসি, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পরিজন, আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব সকলে যেন মনটা ভাগ ভাগ করিয়া লইতেছে। আর যখন শ্মশানের আঁধারে যাই—কোথায় বা স্ত্রী, কোথায় বা পুত্র, কোথায় বা আত্মীয়, কোথায় বা পরিজন—সব যেন ভস্মময়,—সব আঁধারময়, সব একাকার। তবেই বুঝা যাইতেছে,—আলোক দ্বৈতজ্ঞানমূলক;—আঁধার অদ্বৈত-জ্ঞান-মূলক। আলোক ভেদাভেদ জন্মায়, আঁধার ভেদাভেদ লোপ করে। সংসার আসক্তি বাড়ায়, শ্মশান বৈরাগ্যের উদয় করে। দ্বৈত-জ্ঞান প্রথম, অদ্বৈত-জ্ঞান শেষ পরিণতি। মানবজীবনে ইহারই পরিচয় পাওয়া যায়। আসক্তির পথ ধরিয়াই বৈরাগ্যের পথে যাইতে হয়। সংসারে বাস না করিয়া,

জন্মিয়াই কেহ শ্মশান বাসী শিব হইতে পারে না। সংসারে থাকিয়া সংসারকে জয় করিয়া তবে মানুষ শ্মশান বা শিবধামের অধিকারী হয়। কিন্তু এ অতি কঠিন সাধন। আসক্তি-রূপ অন্নপূর্ণার পূজা করিতে হইবে সংসারে বসিয়া, বৈরাগ্যরূপ মহাকালীর পূজা করিতে হইবে শ্মশানে যাইয়া। কিন্তু এটাও সেবার চরমোৎকর্ষ নয়। পূজার চরমোৎকর্ষ সেখানে, যেখানে আর দ্বিত্ব-জ্ঞান নাই। সেখানে সংসার ও শ্মশান, রাধা ও কৃষ্ণ,—হর ও গৌরী মিলিত হইয়া একরূপ ধরিয়া ভক্তের চিত্তরঞ্জন করিতেছেন। তখন আ-লোক ও আঁধার, আসক্তি ও বৈরাগ্য—উভয়ে সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে। মানুষ যত দিন কেবল আলোকের উপাসক, যতদিন সে সংসার জয়ী নয়, ততদিন এই জ্ঞান লাভ অসম্ভব। মানুষ আলোকের সেবা করে, আঁধারের সেবা করে না;—সজন চায়, নির্জ্জন ভালবাসে না;—সংসার চায়, শ্মশানকে ঘৃণা করে। এই জন্যই মানুষের অশেষ দুর্গতি, রিপু-সংগ্রামে সে পরাস্ত। মানুষ ভিন্নত্বের পূজা বা পাপের সেবা করিয়া দিন দিন জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যাইতেছে। পৃথিবীর কি শোচনীয় অবস্থা!

শাক্যসিংহ ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই রাজ্য-সুখ পরিহার করিয়া সেই নিরঞ্জনা মহাপুণ্য-তীর্থে অশ্বত্থতরুতলে গভীর সমাধিতে চিত্ত-নিমগন করিয়া বুদ্ধত্ব লাভ করিয়া-ছিলেন। সংসারকে জয় করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন, নির্ব্বাণ ভিন্ন, আঁধার-সেবা ভিন্ন, আত্ম-লোপ ভিন্ন মানুষের মুক্তি নাই। মহানির্ব্বাণ, মহা আঁধার—বৌদ্ধধর্ম্মের সার কথা।

কিন্তু আসক্তি এবং নির্ব্বাণ, এখানেও দুই পৃথক স্থানে রহিয়াছে। ইহাও পূজার চরমোৎকর্ষ নহে। পূজার চরমোৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, এদেশে মহাদেব। এক কণ্ঠে বৈরাগ্য-মরণের বিজয় মঙ্গল সঙ্গীত গাই-তেছেন, অন্য কণ্ঠে সংসার-গৌরীর মহা-প্রেম-উতলা-তান ধরিয়াছেন।—এক চক্ষু নিমীলন করিয়া স্বর্গের শোভা দেখিতেছেন, আর চক্ষু সংসারের শোভায় নিবদ্ধ। আসক্তি এবং বৈরাগ্যের এমন যুগল মিলন আর কোথাও নাই, কোথাও হয় নাই। আর্য্যভূমিতে বা শিবধামে যেমন নিরাকার ব্রহ্মের পূজা হইয়াছে, সেরূপ বুঝি বা আর কোথাও হয় নাই।

এখন আমাদের কি করা কর্ত্তব্য? আমরা যদি দু ঘণ্টা আলোকে বসি, আর দু ঘণ্টা তবে আঁধারে বসিতে অভ্যাস করা উচিত। দু ঘণ্টা যদি আত্মীয় পরিজনের ভালবাসা লইয়া থাকিতে চাই, আর দু ঘণ্টা তবে তাহাদের বিচ্ছেদ সহ্য করিতে হইবে। এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে,—এইরূপ সাধন করিতে করিতে আলোক আঁধারে সমান জ্ঞান জন্মিবে,—মিলন বিচ্ছেদ উভয়ই তুল্য হইবে। এখন বন্ধু-মিলনে মাতি, বন্ধুবিচ্ছেদে কাঁদি, এখন সৌন্দর্য্য দেখিলে আনন্দিত হই, না দেখিলে নিদ্রায় অভিভূত হই। তখন আর এরূপ ভাব থাকিবে না। তখন আলোকের ধারে বসিয়াও অনন্ত বা সসীম পদার্থের ভিতরে অনন্তকে দেখিতে পাইব, আঁধারের মধ্যে ডুবিয়াও অনন্ত জ্যোতি অনন্তরূপে দেখিতে পাইব। আলোক তখন অনন্ত-ব্যাপক হইবে, আঁধার তখন অনন্ত-প্রকাশক হইবে। অথবা আঁধারে তখন রূপ জন্মিবে। অথবা উভয় মিলিয়া এমন আকার ধারণ

করিবে—যাহাকে তৎকালীন যুগল মিলন, বা বিশ্বস্তবের বিভিন্ন প্রকৃতি বলা যাইতে পারে। তখন এক রূপ, এক ধ্যান, এক চিন্তা ভিন্ন আর কিছু থাকিবে না। দ্বিত্ব-জ্ঞান বা দ্বিত্ব-ভাব আর থাকিবে না। ভুবনময়ী বিশ্বেশ্বরীকে আলোকে ও আঁধারে সমভাবে দেখিয়া মোহিত এবং স্তম্ভিত হইয়া যাইব। তাহাই মুক্তির অবস্থা, তাহাই বৈকুণ্ঠ, তাহাই মোক্ষ।

সেই অবস্থা যদি লাভ করিতে চাও, মানুষ, তবে মিলন ছাড়িয়া বিচ্ছেদ-সাধন, সংসার-আসক্তি ছাড়িয়া বৈরাগ্য-সাধন,—আলোক ছাড়িয়া অন্ধকার সাধন কর। দশ বৎসর বন্ধুর ভালবাসার সাধন করিয়াছ, আর দশ বৎসর বন্ধু-বিচ্ছেদ সহ্য কর। দশ বৎসর আলোক বসিয়া রূপ দেখিয়াছ, এখন দশ বৎসর আঁধারে বসিয়া অরূপের চিন্তা কর। দশ বৎসর আসক্তির পূজা করিয়াছ, এখন দশ বৎসর বৈরাগ্য-সাধন কর। ধর্ম্মসাধন আর প্রকৃতি সাধন, উভয়ই এক কথা। ধর্ম্ম সাধন হইয়াছে, কিন্তু প্রকৃতি-সাধন হয় নাই, অর্থাৎ বিভিন্ন অবস্থা বা বিভিন্ন ঘটনায় সমজ্ঞান জন্মে নাই, ইহা অসম্ভব। সকল অবস্থায়, সকল বস্তুতে সেই অরূপের রূপ যে দেখে, সেই ধার্ম্মিক। তাঁর সহিত যুক্ত হওয়াই ধর্ম্ম। বিশ্বেশ্বরের অনন্তত্বে আত্ম-বিসর্জ্জনই ধর্ম্ম। কিন্তু তাহা কি সোজা কথা? মানুষ, বাতি নিবাইয়া আঁধার হৃদয়-কুটীরে পূর্ণচন্দ্রমার উদয় দেখ। আঁধার ঘরের মাণি-ককে চিনিয়া লও,—তারপর সকল অবস্থায় তার লীলা দেখ, তবে ত মানুষ হইবে! তবে ত ধর্ম্ম বুঝিবে! তিনি ভিন্ন ধর্ম্ম নাই, মুক্তি নাই, কিছুই নাই। তিনিই ধর্ম্ম। সেই তিনি-সাগরে ঝাঁপ দিয়া আত্ম-হারা হইয়া ডুবিয়া যাও। বৃথা রূপ রূপ করিয়া আর মরিও না।

অদ্ভুত মত।

(রাজনারায়ণ বাবুর প্রতিবাদ।)

গত বর্ষের চৈত্র মাসে বহুমানাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু মহাশয় "জীবনবৃত্ত-লেখকদিগের দৌরাত্ম্য" নামে যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তাহাতে বিস্তর অন্যায্য অসঙ্গত মত প্রচার করিয়াছেন। তদ্দ্বারা সাধারণের অনিষ্ট সংঘটিত না হয়, এই উদ্দেশে কিছু কিছু লিখিতেছি। প্রথমেই বলিতে বাধ্য হইলাম, তাঁহার লেখা অসাবধানতা, কুযুক্তি, অনৌদার্য্য ও অসন্তোষে পরিপূর্ণ। অন্যের প্রস্তাব হইলে, ইহার প্রতিবাদ করিতাম না। বসু মহাশয়কে সতর্ক করিয়া দিলে, সমাজের উপকার আছে এবং তিনি ইচ্ছা করিলেই, সতর্ক হইতে পারেন, এই সকল কারণে লেখনী ধারণ করিয়াছি। বসু মহাশয়, আমি ভিন্ন আর কোন্ চরিতাখ্যায়কের দৌরাত্ম্যে পড়িয়াছেন, বুঝিলাম না। অক্ষয় বাবুর আর একটী ক্ষুদ্র চরিত-লেখক দ্বারা কি আদি সমাজের পক্ষ হইতেও মতামত দিতে উৎপীড়িত হইয়াছেন না কি? নচেৎ "জীবন বৃত্ত-লেখকদিগের" শব্দে বহুবচন প্রয়োগ ব্যর্থ হয়।

৮। রাজনারায়ণ বাবু বলেন, —"বিদ্যানিধি মহাশয় 'অজ্ঞতাবাদ' অথবা বিশুদ্ধরূপে বলিতে গেলে 'অজ্ঞেয়তাবাদ' (Agnosticism) শব্দে কি বুঝায়, তাহা জানেন না। অজ্ঞেয়তাবাদী তাঁহাকে বলা যায়, যিনি ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন, কিন্তু তাঁহার শক্তি করুণা প্রভৃতি কোন গুণ আছে এরূপ বিশ্বাস করেন না।' যথা হিউম্, হার্কার্ট স্পেন্সর প্রভৃতি। অক্ষয় বাবুকে এগ্নষ্টিক আমি এই অর্থে বলিয়াছি।"

Agnosticism শব্দের বিশুদ্ধ অনুবাদ কি, তাহা আমার বিচার্য্য নহে। বসুজ মহাশয়ের লেখায় অনেকে বুঝিয়াছেন, আমিই "অজ্ঞতাবাদ" শব্দ নূতন সঙ্কলন করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছি। যাঁহাদের ঐরূপ সংস্কার জন্মিয়াছে, তাঁহাদের গোচরার্থ জানাইতে বাধ্য হইলাম, রাজনারায়ণ বাবু যে আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি, সেই সমাজের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই "অজ্ঞতাবাদ" লেখা আছে। আমি বিচারকালে সেই শব্দ উদ্ধৃত করিয়াছি মাত্র। অতএব ঐ শব্দে যদি কোন ভুল থাকে, তাহা আদি-সমাজের ভুল, আমার নহে। রাজনারায়ণ বাবুর সংস্কৃত ভাষায় যে ব্যুৎপত্তি আছে, তাহার সহিত, সংস্কৃত ভাষায় আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের তুলনা হয় না। আমি এগনষ্টিসিজম্ শব্দের অনুবাদ-স্থলে সংশয়বাদ বা সন্দেহবাদ ব্যবহার করি। নব্যভারতে প্রচারিত আমার যে লেখার বসুজ প্রতিবাদ করিয়াছেন, সেই প্রস্তাবেই তিনি ইচ্ছা করিলে উহা অবলোকন করিতে পারেন। বসু মহাশয় এক স্থানে তাঁহার "অজ্ঞেয়তাবাদ" ও আমার "সংশয়বাদ" একার্থবাচক করিয়াছেন, অন্যত্র দুই ভিন্ন পদার্থ কহিয়াছেন! কোন বিষয়ের বিচার-উপলক্ষে ভাষার গুণাগুণ সমালোচন করা বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁহার উক্ত প্রস্তাবের স্থানে স্থানে ভাষার বিলক্ষণ দোষ আছে, তাহা আমার প্রদর্শন করা উচিত নহে। তবে বসু মহাশয় না কি কথাটা উল্লেখ করিয়াছেন, তাই এই কয়টি কথা বলিতে হইল।

২। বসু মহাশয়ের মতে "অজ্ঞেয়তাবাদ শব্দে কি বুঝায় তাহা" আমি জানি না। বসুজের নিকট আমাদের অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে; কিন্তু "অজ্ঞেয়তাবাদ"-সম্বন্ধে তাঁহার নিকটে না জানাই ভাল। কেন না, তিনি ঐ শব্দের আশ্চর্য্যজনক ব্যাখ্যা করিয়া অক্ষয় বাবুকে "অজ্ঞেয়তাবাদী" বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় আছেন। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলেন, "অক্ষয় বাবুকে এগনষ্টিক্ আমি এই অর্থে বলিয়াছি।" বসু মহাশয় যে "অর্থে" বলিয়াছেন, সে অর্থ ভিন্ন অন্য অর্থ আছে, তাহা তিনিই স্বীকার পাইতেছেন। আর এক কথা এস্থলে বুঝিয়া দেখিতে হইবে। বসু মহাশয় ইচ্ছা করিয়া অক্ষয় বাবুকে যে অর্থে এগনষ্টিক বলিয়াছেন, তাহাই যে বেদবাক্যবৎ অভ্রান্ত, তাহার প্রমাণ কি? তাহা হইলে উপনিষৎকর্ত্তারাও "অজ্ঞেয়তাবাদী!"

৩। অক্ষয় বাবু ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়ের প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় উপনিষদের সমালোচনা-কালে এরূপ বলিয়াছেন, "যাঁহারা এই অদ্ভুত জগতের অদ্ভুত কারণের অদ্ভুত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাতে কল্পিত গুণ ও কল্পিত স্বরূপ নির্দ্দেশ করেন, তাঁহারাই প্রকৃতরূপ অপ্রকৃতবাদী।"

এই অংশকে লক্ষ্য করিয়া বসুজ টীকায় কহিতেছেন, "যিনি এরূপ লিখিতে পারেন, তিনি অন্যান্য বিষয় না হউক, ধর্ম্ম বিষয়ে যে নিজে একটী অদ্ভুত জীব হইয়া গিয়াছিলেন, তাহা ইহা লিখিবার সময় বিস্মৃত হইয়াছিলেন।"

এই অভিপ্রায় প্রকাশ্য পত্রিকায় মুদ্রিত হইবার অযোগ্য। ইহাতে দত্ত মহাশয়ের উপর শ্লেষ, কটাক্ষ ও সেই সঙ্গে অসম্মান প্রদর্শন করা হইয়াছে। বসু মহাশয়ের গল্প করার অভ্যাস আছে। প্রকাশ্য পত্রে না লিখিয়া গল্প বা কৌতুকচ্ছলে স্বীয় আত্মীয়দের নিকট উহা বলিলে বড় দূষণীয় হইত না।

৪। বসুজ লেখেন, "অক্ষয় বাবু উপনিষদের যে অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অন্যতর ব্যাখ্যা আছে।"

দত্ত ও বসু উভয়ের মধ্যে কে অধিক পণ্ডিত, আমাদের বিচার্য্য নয়। রাজনারায়ণ বাবুর এই একটি বিশেষ ধরণ, তিনি লোকের জীবদ্দশায় কোন অভিপ্রায় প্রকাশ করেন না। অথবা করিলে, উত্তরকালে তাহার বিপরীত মত দেখা যায়। মাইকেলের সমালোচনা ইহার প্রমাণ। যাহা হউক, ভরসা করি, বসুজ উপনিষদের "অন্যতর ব্যাখ্যা" আমাদিগকে দেখাইবেন।

৫। "অক্ষয় বাবু ব্রাহ্ম-সমাজ পরিত্যাগ করিবার পর একেবারে নাস্তিক হইয়াছিলেন, এমন কথা আমি বলি না, কিন্তু তথাপি আমি বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, অজ্ঞেয়তাবাদ নাস্তিকতার কাছাকাছি। এক ডিগ্রী কম মাত্র। নাস্তিকতা যদি উনপঞ্চাশ হয়, তাহা হইলে অজ্ঞেয়তাবাদ আটচল্লিশ।"

বসুজের মতানুসারে অক্ষয় বাবু "একেবারে নাস্তিক" হন নাই, দুই বারে অর্থাৎ কিছু কিছু নাস্তিক ছিলেন। সাধারণসমক্ষে দত্তজকে হতশ্রদ্ধ করাই এরূপ লেখার উদ্দেশ্য, পাঠমাত্র প্রতীতি হইতে থাকে। এস্থলে রাজনারায়ণ বাবু একটী অত্যন্ত কুরুচির পরিচয় দিয়াছেন। তিনি নাস্তিকতাকে ৪৯ উনপঞ্চাশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, একটী অসাধু কর্ম্ম করিয়াছেন। ৪৯ বায়ু অথবা কেবল ৪৯ শব্দে লোকে 'উন্মাদ' শ্লেষ করিয়া থাকে। পরমার্থ-পরায়ণ বসু মহোদয়ও প্রাকৃত-জনোচিত সেই শব্দ অক্ষয় বাবুর প্রতি প্রয়োগ করিলেন! অজ্ঞেয়তাবাদ ৪৮ বলায়, অক্ষয় বাবুর উন্মাদ প্রায় জন্মিয়াছিল, রাজনারায়ণ বাবুর বলা হইয়াছে। অজ্ঞেয়তাবাদ নাস্তিকতা হইতে যদি এক ডিগ্রী কম হয়, তবে উপনিষৎ কর্ত্তারাও ঐরূপ ছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। উপনিষৎকারদের বচনাবলি সংগ্রহ করিয়াই আদি ব্রাহ্ম-সমাজের মত পুষ্ট হইয়াছে। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় উপনিষৎকারগণের সহিত সমস্বরে ঈশ্বরের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াও বসু মহাশয়ের নিকট নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারিলেন না, ইহা অপেক্ষা ঘোরতর আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

৬। "আমার শ্রদ্ধাস্পদ ও অতি প্রিয় বন্ধুবর মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের সহস্র গুণ ছিল। তিনি সে বিষয়ে অনুকরণ-স্থল ছিলেন, কিন্তু তাঁহার একটি দোষ ছিল। তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী হইয়াও ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে পীড়া নিবন্ধন অবসৃত হইবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি জন্য উক্ত সমাজে যে সকল অনুষ্ঠান হইয়াছিল, সেই সকল অনুষ্ঠানের

সম্বন্ধে গৌরব তিনি একচেটিয়া করিতে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতেন। এক জন অজ্ঞেয়তাবাদী ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উন্নতি সাধনের গৌরব লইবার জন্য কেন এত লোলুপ ছিলেন, বুঝিতে পারি না। অক্ষয় বাবু ধর্ম্ম বিষয়ে লিখিবার সময় যেমন 'অদ্ভুত শব্দ' প্রয়োগ করিতে ভালবাসিতেন, আমিও সেই রূপ এ ঘটনা সম্বন্ধে অদ্ভুত শব্দ প্রয়োগ করিতে পারি। অক্ষয় বাবুর উল্লিখিত আগ্রহাতিশয় দোষ থাকুক, কিন্তু ঈশ্বরের এক জন পরমভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার জন্য তাঁহার আকিঞ্চন ছিল না। বিদ্যানিধি তাঁহাকে এক জন পরম ভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন। অক্ষয় বাবু জীবিত থাকিলে তিনি তাঁহার জীবনী-লেখকের এরূপ চেষ্টা দেখিয়া ঈষৎ হাস্য করিতেন, সন্দেহ নাই।"

এখানে বসু মহাশয়, দত্ত মহাশয়ের গুণ-ভাগ অনুকরণীয় বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাঁহার মতে অক্ষয় বাবুর এক মাত্র দোষ ছিল। নির্দ্দোষ কে? তবে বসুজ যাহাকে দোষ বলিতেছেন, তাহা দোষ কি না, সাব্যস্ত করিবার পূর্ব্বেই আমি দেখাইতে বাধ্য হইলাম, রাজনারায়ণ বাবুর মতানুসারে যাহা দোষ, তিনি সেই রূপ দোষেরও অনুকরণ করিয়াছেন। বসুজের মতে অক্ষয় বাবু ব্রাহ্ম-সমাজে যে যে কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহার গৌরব লইবার জন্য লোলুপ ছিলেন, এ বিষয়ের বিচার কিছু পরেই করা যাইতেছে। রাজনারায়ণ বাবু এখানে তাঁহার মতামত স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। কথাটা নব্যভারতের পাঠককে জানান আবশ্যক। মদ্বিরচিত অক্ষয় বাবুর বিস্তৃত জীবনবৃত্তে তাহা প্রমাণ সহকারে প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ পুস্তক অপেক্ষাও "কল্পনা" পত্রিকার ৫ম বর্ষের দশম ও একাদশ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোবিন্দদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫ পঞ্চদশ প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন; ইচ্ছা করিলে পাঠকগণ তাহা দৃষ্টি করিতে পারেন। এখানে আপাততঃ সংক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইল।

ক। অশেষ-সম্মান-ভাজন শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসুজ প্রভৃতি আদি ব্রাহ্ম-সমাজের প্রাচীন সভ্যগণ বিশ্বাস করিতেন, বেদশাস্ত্র স্বয়ং ঈশ্বর-প্রণীত সুতরাং অভ্রান্ত। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় সর্ব্ব-প্রথমেই দেবেন্দ্র বাবু ও রাজনারায়ণ বাবুকে বুঝাইয়া দেন, বেদশাস্ত্র ঈশ্বর-প্রণীত ও অভ্রান্ত শাস্ত্র নহে। প্রায় ৭ সাত ৮ আট বৎসর এই জন্য অক্ষয় বাবুকে পরিশ্রম ও যত্ন করিতে হয়। বসুমহাশয়ের ভ্রান্তি দত্তজ কর্ত্তৃক তিরোহিত হয়, আমাকে সত্যের অনুরোধে পুস্তকে ও এখানেও লিখিতে হইয়াছে।

খ।—অদ্বৈতবাদ তখন সমাজে প্রচলিত ছিল। দেবেন্দ্র বাবুকে অক্ষয় বাবু বুঝাইয়া দেন যে, এই মত, ব্রাহ্ম-সমাজের অযোগ্য।

গ।—ঠাকুর মহাশয় পুষ্প, চন্দন, নৈবেদ্য দ্বারা স্ত্রীলোকের ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত করিবার বিধি দেন। দত্তজ ইহারও প্রতিবাদ করেন।

এই তিনটী বিষয় অক্ষয় বাবুর জীবনচরিতে উল্লিখিত আছে, এজন্য আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি বসু মহোদয় বলেন,—অক্ষয় বাবু ঐ গৌরব লইবার জন্য লোলুপ ছিলেন। তিনি যে "লোলুপ

ছিলেন" ইহার প্রমাণ কি? তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকার করা যায় যে, তিনি গৌরব লইবার নিমিত্ত ব্যগ্র ছিলেন, তাহাতেই বা দোষ কি? বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, আপনাদেরও কি মুক্তকণ্ঠে দত্ত মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত কার্য্য গুলি অঙ্গীকার করা অতিমাত্র কর্ত্তব্য বোধ হয় না?

উক্ত তিন কার্য্য ব্যতীত বাঙ্গালা ভাষায় উপাসনা, ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মত ইত্যাদি বিষয়ও অক্ষয়কুমার দ্বারা ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তনের উদ্যোগ হয়।

রাজনারায়ণ বাবুকে জিজ্ঞাসা করি,আপনি ব্রাহ্মসমাজে 'প্রীতি' শিক্ষা দিয়াছেন বলিয়া থাকেন কিনা? এবিষয়ে বসুজের ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৮ এ অক্টোবরের লিপি আছে। অতএব প্রমাণিত হইল, রাজনারায়ণ বসু বাবুর মতে যাহা অক্ষয় বাবুর দোষ, বসুজ নিজে সেই দোষেরও অনুকরণ করিয়াছেন। বসুজ মহাত্মা অক্ষয় বাবুকে "অজ্ঞেয়তাবাদী" প্রমাণ করিবার প্রয়াস করিলেও যে কৃতকার্য্য হন নাই, আমি নব্যভারতে দত্তজের "ধর্ম্মবিষয়ক মতামত" নামক প্রবন্ধে তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছি। তথাপি তিনি অক্ষয় বাবুকে "অজ্ঞেয়তাবাদী" কেন বলেন, বুঝিতে সমর্থ নহি। যদি রাজনারায়ণ বাবুর কথানুসারে দত্তজকে "অজ্ঞেয়তাবাদী" বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলেও কি তিনি ব্রাহ্ম-সমাজে যাহা যাহা কার্য্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহার কৃত বলিয়া নির্দ্দেশ করিবার তাঁর অধিকার নাই? না, তাহা বলা অন্যায়? যদি কোন লোক ব্রাহ্ম বা অব্রাহ্ম অবস্থায় কোন কার্য্য করেন এবং পশ্চাৎ অন্য কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, তবে তিনি কি উক্ত কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া উল্লেখ করিলে, অন্যায় হয়! আর, যাঁহারা উপকৃত, তাঁহাদেরও সেই বিষয় ক্রমান্বয়ে অস্বীকার করিবার উদ্যোগ পাওয়া উচিত! এই কি ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের উদারতা? এই কি অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের শিক্ষাদান! যে রাজনারায়ণ-বাবু "ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা"ও"প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে" প্রভৃতি পুস্তক লেখেন, ইহা তাঁহার মুখে শোভা পায় না। অন্য কোন ব্রাহ্মের বলাও ভাল দেখায় না। অক্ষয় বাবু ধর্ম্ম-বিষয়ে "অদ্ভুত জীব" ছিলেন, এক স্থানে বসুজ উল্লেখ করিয়াছেন। এখানে আবার বলিতেছেন, এ বিষয়ে অর্থাৎ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম-সমাজের উন্নতি-সাধনেও "অদ্ভুত" শব্দ তিনি প্রয়োগ করিতে পারেন। এই কি অক্ষয় বাবুর প্রতি বসুজের শ্রদ্ধা-ভাব! তবে আর "তাঁহার একটী দোষ ছিল" কেমন করিয়া বলিলেন? ২টী দোষ হইল! "আমার শ্রদ্ধাস্পদ ও অতি প্রিয় বন্ধুবর মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের সহস্র গুণ ছিল" এই বাক্য, লেখকের হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে বহির্গত কি না, পাঠকেরা এখন বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভাল হয়। রাজনারায়ণ বাবু এক স্থানে কহেন, 'বিদ্যানিধি তাঁহাকে পরম ভক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। অক্ষয় বাবু জীবিত থাকিলে তিনি তাঁহার জীবনী-লেখকের এরূপ চেষ্টা দেখিয়া ঈষৎ করিতেন, সন্দেহ নাই।" দত্তজের হাস্য বসুজ নিশ্চয়ই দেখিতে পাইতেছেন! বসু মহোদয়কে জিজ্ঞাসা করি, দত্তজ মহানুভবের জীবিতাবস্থায় আমি যে জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছি, তাহাতেও তো ঈশ্বরের প্রতি

প্রীতি' প্রস্তাবে... াংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল। তাহা পাঠ করিয়া কি তিনি তো হাস্য করেন নাই? অথবা অক্ষয় বাবু বুঝি পত্র-যোগে দেওঘরে স্বাস্থ্যের সংবাদ প্রেরণ করিয়া থাকিবেন, আমরা তদবগত নহি।

৭। 'বিদ্যানিধি, অক্ষয় বাবুকে ঈশ্বর-ভক্ত প্রমাণ করিবার জন্য ব্রাহ্ম-সমাজ হইতে অবসৃত হইবার পূর্ব্বে যখন তিনি অজ্ঞেয়তাবাদী ছিলেন না, তখনকার ভূরি ভূরি বাক্য তাঁহার প্রস্তাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। * * অক্ষয় বাবু কোন কালে বিশেষ ভক্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন না।"

দত্তজ মহোদয় "কোন কালে বিশেষ ভক্তিমান্ ব্যক্তি ছিলেন" কি না পাঠকগণ অবলোকন করুন,—

"হে মানব! একবার নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখ, এই বিশ্বরূপ মহোচ্চ মঞ্চ তাঁহার মহিমা কেমন ব্যক্ত করিতেছে। সকলেই তাঁহার গুণ কীর্ত্তন করিতেছে; সকলেই তাঁহার যশঃপ্রচার করিতেছে। সুস্নিগ্ধ সুমন্দ মারুত তাঁহার চামর ব্যজন করিতেছে। শিশিরসিক্ত সরস তরু-শাখা সকল উষাকালীন সুশীতল সমীরণ দ্বারা মন্দ মন্দ বিচলিত হইয়া সর সর শব্দ করতঃ তাঁহাকেই স্তুতি করিতেছে। * * অত্যুচ্চ পর্ব্বতস্থিত উন্নত বৃক্ষ-শাখা সকল বায়ুবেগে অবনত হইয়া তাঁহারই পদে প্রণিপাত করিতেছে। * * দিবাপতি প্রভাকর, নিম্নোচ্চ শুদ্ধাশুদ্ধ সর্ব্ব স্থানেই কিরণ বিতরণ করিয়া স্বীয় স্রষ্টার আশ্চর্য্য অপক্ষপাতিতা গুণ প্রকাশ করিতেছে। * * তাঁহার সুকোমল করুণা-কমল কেমন প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তাঁহার প্রীতির সৌরভ বিশ্বের চতুঃসীমা পর্য্যন্ত কীদৃশ বিস্তৃত রহিয়াছে।"—[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৭৭৭ শক, জ্যৈষ্ঠ মাস অথবা মহেন্দ্রনাথ অক্ষয় বাবুর জীবনবৃত্তান্ত ২০০—২০১ পৃষ্ঠা।]

পাঠক বুঝিলেন, অক্ষয় বাবু "কোন কালে বিশেষ ভক্তিমান্" ছিলেন কি না। তবে অনেকের ন্যায় তাঁহার ভ্রমাত্মক কুসংস্কার ছিল না, স্বীকার করি। তিনি পরম পিতার প্রতি কেন ভক্তি করেন, তাহার কারণ নিজে বুঝিতেন এবং অন্যকেও তাহার প্রমাণ দিতেন। বাস্তবিক জ্ঞান পূর্ব্বক ভক্তিপ্রকাশ যে বস্তু, অজ্ঞানতা পূর্ব্বক কুসংস্কারমূলক ভক্তি, সে বস্তু নহে। পূর্ব্বোল্লিখিত ভক্তি গুরুতর ও প্রার্থনীয় কি না, জ্ঞানাপন্ন ভক্তেই তাহা বলুন।

৮। "ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পরও অক্ষয় বাবুর যে ঈশ্বর-ভক্তি ছিল, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বিদ্যানিধি মহাশয় কোন ব্যক্তির সহিত কথোপকথন-সময়ের তাঁহার যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। তিনি উপাসক-সম্প্রদায়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই গ্রাহ্য হইতে পারে।"

রাজনারায়ণ বাবুর তুল্য মাননীয় কানাইলাল পাইন্ মহাশয়ের সহিত অক্ষয় বাবুর যে কথোপকথন হয়, আমি ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জার পত্রিকা হইতে তাহাই উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছি,—১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দেও অক্ষয় বাবুর ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল। এখানে রাজনারায়ণ বাবু যে কারণেই হউক, কানাই বাবর নাম উল্লেখ করেন নাই, অথচ তাঁহার কথা "গ্রাহ্য হইতে পারে না" বলিয়াছেন। যদি কানাই বাবুর কথা অগ্রাহ্য হয়, তবে বন্ধু মহাশয়ের কথাই যে গ্রাহ্য, তাহার

প্রমাণ কি? উভয়েরই প্রায় সমান বয়স, সমান ধর্ম্ম। উভয়েই আমাদের তুল্য মানাস্পদ। বসু মহাশয় বলেন, দত্তজ "উপাসক সম্প্রদায়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই গ্রাহ্য হইতে পারে।" ভাল কথা। "ইদানীন্তন এক অন্ধকেরে বিশ্ববীজ মাত্রে তাঁহার বিশ্বাস ছিল" এই বাক্য-মধ্যে যে "বিশ্ববীজ" শব্দ আছে, তাহা তো উপাসক-সম্প্রদায়ে লেখা নাই, তবে তাহা কেমন করিয়া তিনি স্বীকার করেন? তর্কের অনুরোধে মতের একবাক্যতা রক্ষা না করা যে কত দোষ, তাহা কি বসু মহাশয়কে বলিয়া দিতে হইবে? একগুঁয়ে, স্বার্থসাধক অপ্রকৃত মত কেহ তাঁহার নিকট হইতে প্রত্যাশা করিতে পারে না। ফলতঃ বসু মহাশয়ের এই পরমাদ্ভুত মত কি উপাদেয়!

৯। "বিদ্যানিধি, রামমোহন রায়ের প্রতি অক্ষয় বাবুর ভক্তি তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম বিশ্বাসের এক প্রমাণ স্বরূপ ধরিয়াছেন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রতি বিখ্যাত মিল সাহেবের অসাধারণ শ্রদ্ধা ছিল।"

বসু মহাশয় "শ্রদ্ধা" শব্দের কি অর্থ করেন, ভগবান্ জানেন। মিল সাহেব কেশব বাবুকে "শ্রদ্ধা" করিতেন, না 'সম্মান' করিতেন? বসু মহাশয়ও বোধ হয়, অক্ষয় কুমার দত্তকে ঐরূপ শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, অক্ষয়কুমার দত্ত কেন রাজা রামমোহন রায়কে ভক্তি করিতেন? ইহার উত্তর, রামমোহন ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করেন। এই বিষয়টি আমি নব্যভারতে "অক্ষয় বাবুর ধর্ম্মবিষয়ক মতামত" নামক প্রথম প্রস্তাবে লিখি। বসুজ মহাশয় বুঝি, তাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। ইহার প্রমাণ এই,—

"সহমরণ নিবারণ, ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন, স্বদেশীয় লোকের পদোন্নতিসাধন ইত্যাদি তোমার কত জয়স্তম্ভ ও কীর্ত্তিস্তম্ভ জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।"—[ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়, ২য় ভাগ, উপক্রমণিকা ৩৭ পৃ, ১২৮৯ চৈত্র মাস, রামমোহন রায়ের গুণকীর্ত্তন প্রস্তাব দেখ।]

ব্রাহ্মধর্ম্মে দত্ত মহাশয়ের অনুরাগ না থাকিলে, তাহার কেন নির্দ্দেশ হইল? "অতএব আমি যে বলিয়াছি, তিনি মৃত্যুর অনেক দিন পূর্ব্বে ব্রাহ্মধর্ম্মে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক কথা" রাজনারায়ণ বাবুর এই বাক্য কেমন "ঠিক কথা" পাঠকেরাই বিচার করুন।

১০। "আমার প্রতি বিদ্যানিধি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা আমি ধরি না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজ এমন কি, সমস্ত হিন্দুসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎ প্রধানাচার্য্য মহাশয়ের প্রতি তিনি যেরূপ অসম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। তিনি ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জারের এক জন লেখকের কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রধানাচার্য্য মহাশয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব্বে সিমলা গমনের অগ্রে যে আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাতে ঈশ্বর স্বরূপ বিষয়ে সভ্যদিগের মতামত লইবার জন্য যে হাত তুলিবার প্রথা ছিল, সে বিষয়ে প্রধানাচার্য্য মহাশয় তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিদ্যানিধি প্রকারান্তরে মিথ্যা বলিয়াছেন, ইহা অল্প ধৃষ্টতার কার্য্য নহে। যিনি এরূপ আচরণ করিতে সক্ষম, তাঁহার সহিত কোন

বিষযে কিরূপে তর্ক চলিতে পারে? প্রধা-নাচার্য্য মহাশয়ের কোন শিষ্য অক্ষয় বাবুর সহিত বালীতে সাক্ষাৎ করিতে যান। তিনি তখন অত্যন্ত পীড়িত ছিলেন; কিন্তু সেই অবস্থাতে তাঁহার সহিত এক ঘন্টা কাল কথা কহিলেন, বাগান দেখাইলেন, শম্বুকাদি দেখাইলেন, কত প্রীতি ভাল বাসা দেখাইয়া বলিলেন যে, 'আমি আর কাহারও সহিত কথা কহিতে পারি না, কিন্তু তুমি নাকি অতি উচ্চস্থান হইতে আসিয়াছ, মহর্ষির নিকট হইতে আসিয়াছ, তাই তোমার সহিত এত কথা কহিতে পারিতেছি, এত বেড়াইতে পারিতেছি। তোমাকে দেখিয়া আমার কত আনন্দ হইতেছে! যে পর্ব্বতে আমরা সকলে এক দিন ছিলাম, তুমি সেই উচ্চভূমি হইতে নামিয়া আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছ।' গুরু, মহর্ষির প্রতি এত শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিতেন, কিন্তু তাঁহার প্রতি এক জন চেলার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইতে হয়।"

প্রথমে বস্তুজ লিখিলেন, আমি "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের একজন লেখকের কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রধান আচার্য্য মহাশয়কে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছি। কিছু পরেই লেখেন, —"প্রধান আচার্য্য মহাশয় তাঁহার পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে যাহা বলিয়াছেন, তাহা বিদ্যানিধি প্রকারান্তরে মিথ্যা বলিয়াছেন।" প্রথমে বলিলেন, আমি মিথ্যা বলিয়া প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছি, শেষে বলিলেন, প্রকারান্তরে মিথ্যা বলিয়াছি। কেমন সুসঙ্গত উক্তি!

মেসেঞ্জারের এই লেখক কি যে সে লোক? তি[illegible] প্রবীণ ব্রাহ্ম বাবু [illegible]ের ইতিবৃত্ত-লেখক তিনি আত্মীয় সভার অনাভিজ্ঞ পাইন। রাজনারায়ণ বাবু তো সে সভার সভ্য ছিলেন না। এ সম্বন্ধে তাঁহার শোনা কথা। বস্তুজ, স্বীয় এক বক্তৃতার কথা নির্দ্দেশ করিয়া কহেন, আমি সে সময়ের কথা জানি নাই, অতএব আমার কথা বিশ্বাস্য নয়। সকলে এখনই জানিতে পারিবেন, বস্তুজ মহোদয়ের এই বিষয়-সংক্রান্ত কথায় আমিও ঐ অভিপ্রায়ই প্রয়োগ করিতে পারি কি না। তিনি আত্মীয় সভার বিষয় শুনিয়াছেন মাত্র। তাঁহার বর্ণনাও সুসঙ্গত নয়। কানাই বাবু কর্ত্তৃক রচিত ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে আত্মীয়-সভা-বিষয়ে যাহা লিখিত আছে, তাহার সমগ্র অংশ সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করিলাম।

"Among the congregation of the Adi Brahma Samaj there were some who regularly attended the weekly and other periodical meetings, they bitterly felt, what they considered to be the monotonous & lifeless style of the formulae of worship adopted in the Samaj, interlarded as it was largely with extracts from Sanskrit writings not easily understood by them and others. They said they could only gratify their devotional feelings when the hymns were chanted.

"These discontented, but earnest members spoke on the subject to Babu Akshaykumar Datta, who sympathized with them greatly and encouraged them to form a society for revising the formulae and for doing other important works.

"Accordingly a Society under the name of the আত্মীয় সভা (society for intimate friends) was established towards the close of 1854. Babu Devendranath Thakur was its presi-

Datta ...ciation soon dent and Babu Ak... pathy of almost all the Secretary...f-educated and earnest attracted of the community, some int...om held very respectable position in society. But Babu Devendranath could not agree with them as to introducing the changes they proposed in the formulae of worship which consisted in doing away chiefly as much as possible, with the reading of extracts from Sanskrit scriptures and substituting certain expressions for others, indicating the attributes of God such as সর্ব্বত্র বিদ্যমান for সর্ব্বব্যাপী। This disagreement caused hot discussions, in which Babu Akshaykumar Datta took an active part, and Babu Devendranath was much troubled about the matter. Very likely his troubles made him misunderstand Babu Akshaykumar Datta and other members of the Association; and it was owing to this wrong impression that he wrote in his address (পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত) delivered at a meeting of the Thiestic Society established by Babu Kesav Chandra Sen and others that—

"শেষে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়াই ব্রাহ্মদের মধ্যে বিবাদ পড়িয়া গেল। তাঁহারা তর্ক উপস্থিত করিলেন, ঈশ্বর অনন্ত কি প্রকারে হইতে পারেন; হস্তোত্তোলন কর দেখি, ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ কি না? কি হাস্যাস্পদ! দ্বার রুদ্ধ করিয়া হস্তোত্তোলন দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ণয় করা যে কি হাস্যাস্পদ, ইহা তখন তাঁহারা বুঝিতেন না।"—[পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত, ৩২ পৃষ্ঠা।]

"Certainly the members of the Association among whom the writer of this History (History of Brahma Samaj) was one never attempted to ascertain the attributes of God as believed by the Brahmas. As a matter of rule the President of the Association had to collect the votes of the members present at the periodical meetings of the Society for the adoption of new words in place of the old ones as were then and there proposed. He might have, therefore, been misled to believe that God's attributes were being ascertained by the show of hands of the members of the Association. The names of the active members of the Society were as follow.—

Babu Devendranath Thakur.
" Akshaykumar Datta.
" Rakhaldas Halder.
" Devendranath Thakur, (Pathuriaghata.)
" Kanailal Pine.
" Sivchandra Dev.
" Nabin Chandra Banerjee.
Pandit Ananda Chandra Vedantabagis.

"He last of all raised an objection, that no changes in the formulae could be made without the consent of the trustees of the Adi Brahma Samaj. This objection was found too difficult to evercome; as out of the three Trustees, viz Babu Ramanath Thakur, Radhaprasad Roy and Baikunthanath Chowdhuri, only Babu Ramanath Thakur survived and no successors to the other two were appointed and as at was thought that Babu Ramanath Thakur was not likely to act against the wishes of Babu Devendranath Thakur, the originators of the Association thought better not to trouble him further on the subject; they had, therefore, to give up their hope of revising the formulae of worship.

—[History of the Brahma Samaj, by Kanailal Pine.]

আমি দেবেন্দ্র বাবুর কথা ঠিক নহে বলিয়াছিলাম, এখন তাহা সপ্রমাণ হইল। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" দেবেন্দ্র বাবুরও

যে ভ্রান্তি হয় নাই, কে বলিবে? অক্ষয় বাবু দেবেন্দ্র বাবুকে যথেষ্ট সম্মান করিতেন, তাহা জানি। তিনি দেবেন্দ্র বাবুকে কখনও "মহর্ষি" বলেন নাই। "মহর্ষি" বলা দূরে থাকুক, কথন প্রধানাচার্য্য শব্দও তাঁহার মুখে শোনা যায় নাই। অক্ষয় বাবুর সমাজ-ত্যাগের সময় পর্য্যন্ত দেবেন্দ্র বাবু 'আচার্য্য' ছিলেন। কেশব বাবুর আচার্য্য হওয়ার পর হইতেই দেবেন্দ্র বাবু 'প্রধান আচার্য্য' পদবী গ্রহণ করেন। আমি দত্তজের জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছি বলিয়াই কি তিনি আমার "গুরু"? যাঁহার নিকট এক অক্ষর শিক্ষা করা যায়, তিনি গুরু; এই হিসাবে সকলেই সকলের গুরু ও শিষ্য। রাজনারায়ণ বাবুর এখানে আমাকে অক্ষয় বাবুর "চেলা" বলা কি সুরুচির পরিচায়ক! এক জন ধর্ম্মবীরের লেখনী-মুখ হইতে এই কথা কি রূপে বাহির হইল, ভাবিয়া স্থির করিতে পারি নাই। বসু মহোদয় আমায় "চেলা" নির্দ্দেশ করিয়া যদি সুখী হন, চিরকাল বলিবেন। রাজনারায়ণ বাবুর ভ্রমভঞ্জনার্থ ও সাধারণের গোচরার্থ দেবেন্দ্র বাবুর প্রতি আমার কিরূপ ভাব, তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইল। দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্ম-সমাজে সকলের নিকট সমান ভাবে না হউন, সাধারণতঃ অধিকাংশের নিকট আদৃত। কেহ কেহ দেবেন্দ্র বাবুকে মহর্ষি বিশেষণে অভিহিত করেন, অতি ভক্তি প্রদর্শন করেন। আর এক দল তত দূর করিবার কারণ দেখেন না। আমি এই দ্বিতীয়-দলভুক্ত। প্রভূত ধনরাশির প্রলোভন অতিক্রম করিয়া যিনি ধর্ম্মানুশীলনে মনোনিবেশ করিয়াছেন, যিনি সময়ে সময়ে ধন বিতরণ দ্বারা সাধারণের সমক্ষে সমাদৃত, যিনি ধ্যান-ধারণায় ব্যাপৃত, তিনি যে বিশেষ মানাস্পদ, তাহাতে কি সন্দেহ আছে? রাজনারায়ণ বাবুর জানা উচিত, অক্ষয় বাবু যদি দিগ্বিদিক-জ্ঞান-শূন্য হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে দেবেন্দ্র বাবু মহাশয়কে ভক্তি করিয়া থাকেন, তবে আমাকেও যে তাহাই করিতে হইবে, এমন কথা নাই। আমাকে দত্তজের "চেলা" ঠিক করা হইয়াছে; আমি তাঁহার দোষ ও গুণ উভয়েরই "চেলা" নহি। আমি দত্তজের গুণ-ভাগের জন্য তাঁহার "চেলা" বলিয়া পরিচয় দিতে বাস্তবিকই কুণ্ঠিত নহি।

১১। "আমার প্রতি বিদ্যানিধি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা আমি ধরি না।" বসু মহোদয়ের এই উক্তি সম্বন্ধে আমার এ বক্তব্য, রাজনারায়ণ বাবু "আমার প্রতি যে কটাক্ষ করিয়াছেন, তাহা আমি ধরি না।" তিনি যে দুই স্থলে কানাই বাবুর প্রতি তীব্র দৃষ্টিক্ষেপ ও শ্লেষ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য কার্য্য হইয়াছে কি না, তিনিই এখন ভাবিয়া দেখিবেন। দত্তজকে "অদ্ভুত জীব" '৪৯ হইতে এক ডিক্রী কম' বলাও ঠিক কি না, বসুজ একবার চিন্তা করুন।

১২। "অক্ষয় বাবুর উপাসক সম্প্রদায় গ্রন্থে তিনি যে সকল উপাসক সম্প্রদায় উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে আর একটী নূতন সংম্প্রদায় সংযুক্ত হইল। সে সম্প্রদায়ের নাম অক্ষয়োপাসক। ইহা বড় দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে।"

উপরি উক্ত অংশে যে কালকূট রহিয়াছে, তাহা ধার্ম্মিকের হৃদয়ে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত। এই প্রস্তাব দ্বারা

বসুজ মহাশয়ের পূর্ব্বসঞ্চিত ধর্ম্মক্ষয় হইয়াছে, আমাদের এরূপ ধারণা। এই লেখার গুণাগুণ জানিতে ইচ্ছা করিলে, রাজনারায়ণ বাবু সঙ্গোপনে প্রত্যেক জ্ঞানবান্ ব্রাহ্ম অব্রাহ্ম ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করিয়া দেখিবেন, তাঁহার প্রতি সর্ব্বসাধারণের এক্ষণকার কি ভাবগতিক। যদি কোন লোকের গুণবাদ ঘোষণা করিলে বা প্রকৃত কথা বলিলে, কাহারও উপাসক হইতে হয়, তবে সকলেই সকলের উপাসক। অক্ষয়োপাসকের বহু পূর্ব্বে ঐরূপ অনেক উপাসক সম্প্রদায় হইয়াছে, রাজনারায়ণ বাবু নিশ্চয়ই তাহা অবগত আছেন।

১৩। "সকলে অবগত আছেন যে, অক্ষয় বাবু আমার কিরূপ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার কোন দোষের বিষয় বলা আমার অতীব কষ্টকর। কিন্তু অন্ধ উপাসক জীবনবৃত্ত-লেখকদিগের দৌরাত্ম্যে তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম, ইহাতে আমি অতিশয় পরিতাপিত আছি। জীবনবৃত্ত লেখক বলিয়া যে অন্যের প্রতি অন্যায়াচরণ করিয়া সেই জীবনবৃত্তের নায়ককে মনুষ্যের পূর্ণ আদর্শরূপে খাড়া করিতেই হইবে, এ কোন্ কথা ?"

রাজনারায়ণ বাবুর সহিত আমার বাদানুবাদের মূল তিনি স্বয়ং। তিনি সুরভিতে প্রতিবাদ করার পর হইতেই এইরূপ চলিতেছে। বলি, বসুজ মহাশয়! আপনারা যে এক জনকে প্রাপ্য গৌরব দিতে কুণ্ঠিত হন, এই বা "কোন্ কথা ?" বসুজ আমার প্রতি "চেলা" "অন্ধ উপাসক" "অক্ষয়োপাসক" এই সকল অতি অনুপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। সহিষ্ণুতা সহকারে তৎসমস্তই সহ্য করিলাম। এবারও আমি তাঁহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করি নাই। উত্তরোত্তর এপ্রকারে চলিলে, আমার নিকট যে একটী ব্রহ্মাস্ত্র এখনও আছে, কেবল তাহাই প্রদর্শন করিয়া ক্ষান্ত হইব।

১৪। "আমার যে বক্তৃতার প্রথমে 'কোন কোন ব্যক্তি আপত্তি করেন' এই বাক্য আছে, সেই বক্তৃতা অক্ষয় বাবুর রচিত বলিয়া বিদ্যানিধি তাঁহাকে এক জন পরম ভক্ত বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। ইহা অতি কৌতুকজনক ব্যাপার। এই বক্তৃতা যে আমার রচিত, তাহা সকল লোকেই জানে। তাহা আমার বক্তৃতার প্রত্যেক সংস্করণে আছে। যে সময়ের বৃত্তান্ত বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন, সে সময়ের লোকের বিষয় যিনি এত অল্প জানেন, তাঁহার সকল কথার যথার্থতা বিষয়ে পাঠক কিরূপে স্থির নিশ্চয় হইতে পারেন ?"

"সকল কথায় স্থিরনিশ্চয়" না হউন, বসুজ আমার কতক "কথায় স্থিরনিশ্চয়" হইতে পারেন, ইহাই আমার ভাগ্য। ঐ বক্তৃতা যে অক্ষয় বাবুর, এটি আমি রাজনারায়ণ বাবুর কোন আত্মীয়ের নিকট হইতে জানিতে পারি। এক্ষণে তাঁহার নামোল্লেখ করিতে ইচ্ছুক নহি। যদি প্রয়োজন হয়, পশ্চাৎ তাহা নির্দ্দেশ করিতে বাধ্য হইব। এ বিষয়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা উল্লিখিত হওয়া আবশ্যক হইল। তাহা এই—আমার এক ছাত্রকে আমি ঐ বক্তৃতা এবং "ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি" প্রতিলিপি করিয়া কোন পুস্তকে ও নব্যভারতের প্রবন্ধে সন্নিবেশ করিতে বলি। ছাত্রটি নব্যভারতের প্রস্তাবে "ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি" না বসাইয়া ঐ বক্তৃতাটি নিবদ্ধ করে। আমি জিজ্ঞাসা করিলে বলে, 'উহাও তো অক্ষয় বাবুর

লেখা। ঐটি এখানে সন্নিবেশিত হওয়ায় কি ক্ষতি হইবে ?' এই ঘটনা। এবিষয়ে বসু মহাশয়কে বক্তব্য, নব্যভারতে আমার প্রস্তাব হইতে উহা উঠাইয়া দিলেও, প্রমাণের কোনও বিঘ্ন হইবে না। "এ সম্বন্ধে আরও জানা আবশ্যক' বলিয়া উহা'র অবতারণা করা হইয়াছিল, এবং উহার শেষে লেখা আছে, "আমার লিপির উপর নির্ভর করিয়া যাঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহাদের তৃপ্তিবিধানার্থ ইণ্ডিয়ান্ মেসেঞ্জারের প্রামাণিক উক্তি উদ্ধৃত হইল।" এই বলিয়া পরে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়াছে। অতএব উহা দ্বারা আমার বর্ণনার কোন হানি হইবে না।

১৫। "অক্ষয় বাবুর সংশয়-ভাব-সময়ে চারুপাঠের অনেক সংস্করণ বাহির হয় বটে, কিন্তু তাহাতে যে সকল প্রস্তাব আছে, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজে থাকিবার কালে রচিত হইয়া তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হয়। * * অক্ষয় বাবু যে বহুকাল হইতে ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াছেন, আমি বলিয়াছি, তাহা তাঁহার ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পূর্ব্ব কাল সম্বন্ধে খাটে না। ঈশ্বরের স্বরূপ বিষয়ে তাঁহার সংশয় ভাব ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পর এবং প্রথম ভাগ উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকা লিখিবার (১৭৯১ শকের) পূর্ব্বে তাহার মনে উদিত হয়, কিন্তু উহার বীজ ব্রাহ্মসমাজ হইতে অবসৃত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার মনে অঙ্কুরিত হইয়াছিল।"

বসু মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, চারুপাঠের দ্বিতীয় ভাগে "নীতিচতুষ্টয়" প্রস্তাবে যে ঈশ্বরের করুণাদির বিষয় বর্ণিত আছে, তাহাও কি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় মুদ্রিত ছিল ? ব্রাহ্মসমাজ হইতে বহির্গত হইয়া কি উহা লিখিত হয় নাই ? বসুজ কেমন করিয়া উক্ত বিপরীত মত প্রকটন করিলেন, পাঠকগণ বুঝিয়া দেখিবেন। সংশয় ভাব কখন অক্ষয় বাবুর মনে উদিত হয়, কখনই বা তাহার বীজ অঙ্কুরিত হয়, পুনরায় রাজনারায়ণ বাবু প্রমাণ করুন।

প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বসু মহাশয়ের সকল কথার খণ্ডন করা গেল।

বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাজ আমাকে ৫ পাঁচ বার আক্রমণ করিলেন। যথা,—

(১) ১২৯১ সালের ৮ই আশ্বিনের স্বরভিতে রাজনারায়ণ বাবু অনর্থক আমার লেখা'র প্রথম প্রতিবাদ করেন। আমি বাধ্য হইয়া ঐ সালের ২২ আশ্বিনে তাহার খণ্ডন করি।

(২) ১২৯২ সালের কার্ত্তিক মাসে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক, মৎপ্রণীত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত পুস্তকের যে অংশে অক্ষয় বাবু ব্যাপক কাল তর্ক বিতর্ক, যুক্তি ও বিচার-যোগে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়কে বেদ-বেদান্তের ভ্রম বুঝাইয়া দেন, এই বিষয়টি লেখা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার চেষ্টা পান ও বিনা প্রমাণে আমার পুস্তকে দোষ আছে, বলেন।

(৩) ঐ শকের মাঘ মাসে মুদ্রিত "অক্ষয়কুমার দত্ত ও ব্রাহ্ম-সমাজ" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকেও ঐ কথা অস্বীকার করার চেষ্টা হইয়াছিল। আমার পুস্তকে ভুল আছে, লেখক ইহাও বলেন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার এবং "অক্ষয়কুমার দত্ত ও ব্রাহ্ম-সমাজ'নামক পুস্তকের প্রতিবাদ

১২৯৩ সালের চৈত্র মাসের নব্যভারতে লিখিয়াছি।

(৪) আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে মুদ্রিত "অক্ষয়-চরিত" নামক ক্ষুদ্র পুস্তকে অক্ষয়কুমার দত্তের ব্রাহ্মসমাজে কোন কীর্ত্তি নাই বলা হয়। উহাতে আমার নামোল্লেখ না করিয়াও, আমার মত খণ্ডনের চেষ্টা আছে। "কল্পনার" পঞ্চম বর্ষের ৯,১০ ও ১১ সংখ্যায় দুই প্রস্তাবে ইহার সমালোচনা হইয়াছে।

(৫) ১২৯৪ সালের চৈত্র মাসের নব্যভারতে বসু মহাশয়ের লিখিত "জীবনবৃত্তলেখকদিগের দৌরাত্ম্য" প্রবন্ধের সমালোচনা বর্ত্তমান প্রস্তাবেই করা গেল।

আদি ব্রাহ্মসমাজের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ যখন যাঁহার উপর পড়েন, এইরূপই হইয়া থাকে। তাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া আক্রমণ করিয়া থাকেন। এই বিতণ্ডার ফল, আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে অশুভ হইতেছে। তাঁহারা যে যে ব্যাপার খণ্ডনের প্রযত্ন করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হইয়াছে; ভবিষ্যতে প্রয়াস পাইলেও, বিফলকাম হইবেন। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী বাদানুবাদে অনেক গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে এবং পরেও ঐরূপ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।*

শ্রীমহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি।

হিন্দু সমাজের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা (৯ম)।

অলৌকিকী শক্তির নিকট মনুষ্যমস্তক সহজেই অবনত হয়, ইহা আমরা চিরকাল দেখিয়া আসিতেছি। যখন আমরা কোন ব্যক্তির চরিত্রে বীর্য্য ও পরাক্রম, জ্ঞান ও প্রতিভা কিম্বা দয়া ও হিতচিকীর্ষা প্রভৃতি কোন একটী মহতী বৃত্তির অলোকসাধারণ অত্যদ্ভুত বিকাশ সন্দর্শন করি, তখন আমাদিগের চিত্ত যারপর নাই বিস্ময়রসে পরিপ্লুত হইয়া তাহাকে কোন দৈবীশক্তিসম্পন্ন অসাধারণ মনুষ্য বা তদপেক্ষাও কোন উচ্চতর পবিত্রতর লোকবাসী দেবতা বিশেষ বোধে সম্বর্দ্ধনা করিতে থাকে; অথবা একেবারেই তাহাকে বিশ্বপতি পরমেশ্বরের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত পূর্ব্বক ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করিতেও কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না। অলৌকিকতার শক্তিই এইরূপ অদ্ভুত। যুক্তি ও তর্করূপ সুতীক্ষ্ণ শলাকার পুনঃ পুনঃ সঞ্চালনেও মানুষ যাহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে, অথবা প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিবর্গের কোপকটাক্ষ বা শাণিত তরবারিও মানবচিত্তকে যাহা স্বীকার করাইতে অসমর্থ, অলৌকিকতার শক্তির নিকট মানুষ সহজেই তাহার অনুগত হয়। লৌকিকতা মানবীয় শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, অলৌকিকতাতে পরমেশ্বরের বিচিত্র শক্তি প্রতিবিম্বিত; সুতরাং তদ্দর্শনে মানবমন সহজেই আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

জেরুসালেম নগরের একজন সামান্য সূত্রধর পুত্রের নামোচ্চারণে কেন আজ

*১২৮ পৃষ্ঠায় পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নামের পূর্ব্বে বাবু নীলমণি চট্টোপাধ্যায় বসিবে ও at এর পরিবর্ত্তে it হইবে।

মহাবল পরাক্রান্ত সম্রাটদিগের স্বর্ণকিরিটী কম্পিত হয়;—অগণ্য নরনারীর হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও ভক্তিপ্রবাহ প্রবাহিত হয়? পঞ্চনদের একজন সামান্য পণ্য-বিক্রেতার নামে কেন আজ সহস্র সহস্র পুরুষের অন্তঃকরণ উৎসাহ-সম্বলিত এক আশ্চর্য্য শ্রদ্ধারসে বিস্ফারিত হইয়া নৃত্য করিতে থাকে? ইহার মূল কোথায়? মহাত্মা ঈশা এবং গুরু নানকের অলোক-সাধারণ দেবচরিত্রই ইহার একমাত্র মূল। দিবাবসান সময়ে সূর্য্য যেমন আপনার পশ্চাতে পরমরমণীয় সায়ন্তনী জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া অস্তাচলগহ্বরে প্রবেশ করেন, পৃথিবীর অসাধারণ মনুষ্যেরাও সেইরূপ আপন আপন চরিত্রের এক একটি অভিনব দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া গমন করেন;—যাহার নূতনত্ব ও অলৌকিকত্ব সন্দর্শনে দিন দিন মানব বিমোহিত হইতে থাকে। যাহা হউক, মানবচরিত্রের এই অলৌকিকতার নিমিত্ত ক্ষুদ্রবুদ্ধি মনুষ্য মনুষ্যকে মনুষ্য নামে অভিহিত না করিয়া, ঈশ্বর বা ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করে।

হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে যে দশাবতারের প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, তাহারা কি সকলেই কোন না কোন লোকাতীত গুণে বিভূষিত? এ প্রশ্ন মীমাংসার পূর্ব্বে আমাদিগের দেখা উচিত যে, শাস্ত্রোল্লিখিত এই অবতার সংখ্যার মধ্যে সকলেই এক জাতীয় কিনা? ইহার মধ্যে কোন নিগূঢ় অর্থ বিদ্যমান থাকিলেও কল্পনাপ্রিয় পণ্ডিতগণ মনুষ্য হইতে মৎস্যাদি নিকৃষ্ট প্রাণীর মধ্যেও ঈশ্বরের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

দশাবতারের মধ্যে পরশুরাম, রামচন্দ্র, কৃষ্ণ এবং বুদ্ধ, এই অবতার চতুষ্টয়ই মনুষ্য শ্রেণীনিবিষ্ট। যদিও সকলের মধ্যেই অলৌকিকী ঐশী শক্তি আরোপিত হইয়াছে, তথাচ এই ব্যক্তিচতুষ্টয় কি অনন্যসাধারণ শক্তি নিবন্ধন অবতার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এখন আমরা তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। স্বয়ং বিশ্বকারণ পরমেশ্বর মানবাদি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হয়েন না, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং ইহাঁরাও যে আপনাদিগকে ঈশ্বরের অবতার বা তৎসমকক্ষ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত করেন নাই, প্রত্যুত একান্ত দীনভাবে মনুষ্য বলিয়াই অতি বিশদরূপে বারম্বার স্বীকার করিয়াছেন; তাহাও আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রতিপন্ন করিয়াছি।

কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই আমাদিগের মনে কতিপয় প্রশ্নের উদয় হইতেছে। কৃষ্ণ নামে কোন ব্যক্তির অস্তিত্ব আদৌ ছিল কি না, এ সম্বন্ধে অনেকের মনে গভীর সন্দেহ আছে। তাঁহারা কৃষ্ণমূলক সমস্ত আখ্যায়িকাকে কবিকল্পনার অত্যুজ্জ্বল চিত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আবার অনেকে কৃষ্ণ নামে একজন ব্যক্তির অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া দুই তিন জন কৃষ্ণের বিষয় উল্লেখ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তাঁহাদের মতে মহাভারতোল্লিখিত কৃষ্ণের সহিত ভাগবতের কৃষ্ণের স্বতন্ত্রতা আছে। মহাভারতের কৃষ্ণ একব্যক্তি এবং ভাগবতের কৃষ্ণ অপর এক ব্যক্তি। কেহ কেহ বা চরিত্র এবং আখ্যায়িকার পার্থক্যানুসারে মহাভারত, গীতা এবং ভাগবতোল্লিখিত তিন জন কৃষ্ণের তিনটী পৃথক অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। যাহা হউক, কৃষ্ণ দুই জন ছিলেন, কি তিন জন ছিলেন, অথবা

মহাভারতোক্ত কৃষ্ণের সহিত ভাগবতের কৃষ্ণের কোন পার্থক্য আছে কি না; যদি থাকে, তবে কোন্ কোন্ বিষয়ে, ইত্যাদি বিশেষ বিচারসাপেক্ষ প্রশ্নে হস্তার্পণ না করিয়া আমরা সামান্যতঃ এই বলিতেছি যে, কৃষ্ণ নামে যে এক জন ব্যক্তির অস্তিত্ব ভারতক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিল, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই এবং সে ব্যক্তি যে প্রখর-মনীষা-সম্পন্ন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, তাহাও নিশ্চয়। অবশ্য এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক যে, আমাদিগের প্রস্তাবিত কৃষ্ণ ভাগবত প্রণেতার কল্পনাপ্রসূত কৃষ্ণ নহে। কারণ ভাগবতের বিচিত্ররাগানুরঞ্জিত লীলাময় কৃষ্ণ প্রসঙ্গ নিবিষ্ট মনে অধ্যয়ন করিলে ইহার সর্ব্বত্রে একটি অত্যদ্ভুত-শক্তিশালিনী মূর্ত্তিমতী কল্পনার ক্রীড়া পরিলক্ষিত হইয়া থাকে স্নচতুর কবি যে এই সুললিত রসাত্মক ভক্তি কাব্যের কৃষ্ণপ্রসঙ্গ এবং কৃষ্ণাখ্যায়িকাবলীর সকল স্থানে কল্পনার মনোরম ছবি অঙ্কিত করিয়াছেন,তাহাতে সন্দেহ কি? যাহা হউক, ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রসঙ্গ যখন কবির কল্পনাপ্রসূত অমূলক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে,তখন তাহার প্রকৃত অস্তিত্ব কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে।

তৎপরে ভগবদ্গীতা যখন মহাভারতরূপ অসীমকল্প গ্রন্থের একটী বিস্তৃত অংশ স্বরূপ, তখন মহাভারতোল্লিখিত কৃষ্ণের সহিত তদীয় অংশোক্ত কৃষ্ণের একত্ব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এ অংশে কেবল গ্রন্থগত একতাভিন্ন প্রকৃতি ও চরিত্রগত সাদৃশ্যও অনেক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। বিশিষ্টরূপে কৃষ্ণচরিত্র পর্য্যালোচনা করিলে মহাভারতের মধ্যে তাঁহার গভীর রাজনীতিজ্ঞতা, প্রখর বুদ্ধিশালিতা, উজ্জ্বল প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং তৎসহকারে প্রগাঢ় তত্ত্বদর্শিতার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া অবাক্ হইতে হয়। এই সকল অসাধারণ প্রতিভা সমুৎপন্ন মহতীশক্তি কৃষ্ণচরিত্রে বিকশিত হইয়াছিল, সেই জন্য তিনি তাঁহার জীবিত কালেই মনুষ্য সাধারণ অপেক্ষা অনেক উচ্চতর পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তদীয় চরিত্রে এই সকল শক্তির অত্যুজ্জ্বল আভা সন্দর্শনে দুর্ব্বলবুদ্ধি মনুষ্য তাঁহাকে ঈশ্বরোচিত সম্মানে সম্মানিত এবং ঈশ্বরাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই।

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরশুরামের অসাধারণবীর্য্য-প্রতাপ, দাশরথির গভীর পিতৃভক্তি ও অতুলনীয় সত্যানুরাগ এবং শাক্যসিংহে মানবীয় প্রকৃতির অত্যদ্ভুত বিকাশ দর্শন করিয়া তাঁহাদিগের এক একটীকেও ঈশ্বরের অবতার রূপে প্রচার করিয়াছেন। মনুষ্যজাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে প্রাচীনকালে অনেক দেশে পরাক্রান্ত বীর পুরুষদিগের পূজা প্রচলিত ছিল, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এস্থলে রামচন্দ্র ও পরশুরামের অপরাপর গুণগ্রাম স্বীকার না করিলেও ইহাঁরা উভয়ে যে প্রবলপরাক্রান্ত যোদ্ধৃপুরুষ ছিলেন, তাহা সকলেকেই স্বীকার করিতে হইবে। পুরাকালে আমাদের দেশে বীরত্বের সমাদর বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল, সুতরাং ইহাঁরা যে আপনাদের অদ্ভুত বীর-কীর্ত্তির নিমিত্ত হিন্দুসমাজে পূজিত ও সমাদৃত হইয়া আসিতেছেন, তাহা স্বীকার করিলেই বা ক্ষতি কি? তৎপরে পরশুরামের অসাধারণ শূরকীর্ত্তির কথা উল্লেখ না করিলেও তাঁহার দক্ষিণাপথে গমন ও তথায় কেরল নামক একটী সুবি-

স্থত রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং তৎসঙ্গে আর্য্যদিগের বসতি বিস্তাররূপ সুমহৎ কীর্ত্তির নিমিত্তও তিনি যে লোকসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন, তাহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপেই ইহাঁরা জনসাধারণের হৃদ্গত শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছেন, এবং এই জন্যই লোকসমাজ ইহাঁদিগকে ঈশ্বরপদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতেছে। অত্যাশ্চার্য্য শক্তির নিকট মানুষ সহজেই মস্তক অবনত করে, একথা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। সেই জন্য হিন্দুসমাজে অবতার সংখ্যা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে,—শঙ্করাচার্য্য, রামানন্দ, চৈতন্য প্রভৃতি মহাত্মারাও অবতারাসনে আসীন হইয়াছেন এবং উত্তরকালে যে সকল লোকাতীত শক্তিসম্পন্ন মনীষিগণ জন্ম গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদিগকেও এইরূপ অত্যুন্নত পদে অধিরূঢ় হইয়া পূজা করিবে না, ইহাই বা কে বলিতে পারে?

এতদ্ভিন্ন অপরাপর অবতারগণের বিষয় আলোচনা করিলে আমাদিগকে একটী তমসাচ্ছাদিত ক্ষেত্রের উপর আসিয়া উপনীত হইতে হয়, এখানে অনুমানরূপ দীপশিখার ক্ষীণালোক ভিন্ন কোনরূপ সুস্পষ্ট জ্ঞানপ্রাপ্তির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণাদি মনুষ্যদিগকে ঈশ্বরের অবতার পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে কিয়ৎ পরিমাণে কারণ বিদ্যমান থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি নিতান্ত নিকৃষ্ট প্রাণীবর্গকে কিরূপ যুক্তি ও হেতুবাদ প্রদর্শন দ্বারা ঈশ্বরাসনে অধিষ্ঠিত করা যাইতে পারে, আমরা তাহার কিছুই অবধারণ করিতে পারি না। জ্ঞান-সূর্য্যের শুভ্রালোকে যে বস্তু প্রত্যক্ষীভূত হয় না, সে বস্তু সম্বন্ধে যে বিভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত উৎপন্ন হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? সুতরাং এই অন্ধকারাবৃত তত্ত্বভূমির উপরে দণ্ডায়মান হইয়া অনেকে অনেকরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। এরূপ স্থলে কেহই যখন সুনিশ্চিত মীমাংসা-মার্গে উপনীত হইতে পারেন নাই, তখন এ সম্বন্ধে আমরা যে কোন স্থির সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিতে পারিব, তাহারই বা আশা কোথায়? যাহা হউক, অন্যান্য অবতারের মৌলিকতা সম্বন্ধে যেমন বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়, মৎস্যাবতার বিষয়েও সেইরূপ অনেক প্রকার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মহাভারতের বনপর্ব্বে + মৎস্য আপনাকে প্রজাপতি ব্রহ্মার অবতার বলিয়া ঋষিগণের নিকট পরিচয় প্রদান করিতেছেন। বোধ হয়, মহাভারতে এই কথা যখন লিপিবদ্ধ হয়, তখন হিন্দুসমাজে ব্রহ্মার মাহাত্ম্য বিশিষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু মৎস্যপুরাণ ভাগবত প্রভৃতি উত্তরকাল-প্রচারিত গ্রন্থনিচয়ে মৎস্য বিষ্ণুর অবতার রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। মৎস্যপুরাণে লিখিত আছে যে, ভগবান বিষ্ণু মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া মনুর নিকট এই পুরাণশাস্ত্র প্রচার করেন। ভাগবতে * মৎস্যাবতারের প্রসঙ্গ একটু বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে,—মৎস্যরূপী ভগবান রাজা সত্যব্রতের সমীপে উপনীত হইলেন। তৎপরে প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে তিনি ভগবানের নির্দ্দেশানুসারে মুনিগণ এবং ওষধি ও বীজাদি সঙ্গে লইয়া একখানি সুবৃহৎ তরিত্রোপরি আরোহণ করেন, এবং তাহার পর প্রলয়ান্তে তিনি হয়গ্রীব নামক দুরন্ত অসুরের বিনাশসাধন পূর্ব্বক নিখিল বেদের উদ্ধার করিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

+ বনপর্ব্ব। ৮৭।৫২।

* ভাগবত। ৮।২৪।

দারিদ্র্য।

ইংরাজ রাজত্বে ভারতবর্ষের দারিদ্র্য বাড়িয়াছে কি কমিয়াছে,ইহা লইয়া বড় বড় লেখক ও কাগজের সম্পাদকদিগের মধ্যে অনেক বিতণ্ডা হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত সত্যে এ পর্য্যন্ত কেহই উপনীত হইতে পারেন না। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব প্রার্থী, তাঁহারা বলেন, প্রজা পূর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্র হইয়াছে। ইহা প্রতিবিধান করা রাজার কর্ত্তব্য। যাঁহারা গবর্ণমেণ্টকে অক্ষয় বোধ করেন, তাঁহারা দারিদ্র্য বৃদ্ধি স্বীকার করেন না, বলেন, ভারত-কাম-ধেনুকে আরও দোহন করা যাইতে পারে। আর কতক লোকের মত এই যে, অপব্যয়িতাই প্রজাদিগের দারিদ্র্যের হেতু। চাষার মাথায় ছাতা ও ঘরে ঘটী, বাটী দেখিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন, প্রজা পূর্ব্বাবেক্ষা ধনী হইয়াছে।

নানা মুনির নানা মত, কি ঠিক, তাহা জানিবার উপায় কি? যখন সহরে যাই, বৃহৎ পরিষ্কৃত ও সংস্কৃত দালান, রাস্তা ঘাট ও অধিবাসী ২।৪ জন ধনাঢ্য লোকের কোটা বাড়ী দেখিলে বুঝি, উন্নতির প্রচুরতা হাসিতেছে; বাজারে দেখি, যথেষ্ট মদ, মিঠাই, সন্দেশ বিক্রয় হইতেছে। তাহাতে বিশ্বাস আরো বদ্ধমূল হয় যে, এ দেশে অভাবের গন্ধও নাই; কারণ, তাহা হইলে এত বিলাসের দ্রব্য বিক্রয় হইবে কেন?

৩

যখন পল্লীগ্রামে যাই, তথায় দেখি, জমিদার হইতে কৃষক পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় লোক ঋণজালে জড়ীভূত। মহাজনের দপ্তর খত ডিক্রী কিস্তীবন্দিতে পূর্ণ, কিন্তু তহবীলে টাকা নাই। নূতন নালীশ ডিক্রী জারি করা দুষ্কর। গোলায় ধান নাই,ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, মেরামতের চেষ্টা নাই। দেনায় ডুবিয়াও শ্রমজীবীর একরূপ চলিতেছে, যেমন আনে সেইরূপ খায়। মধ্যবর্ত্তী-লোকের দুঃখের অবধি নাই, কর্জ্জ যত পাইয়াছে, করিয়াছে। এক্ষণে আর পায় না; জীর্ণ কাপড় পরিয়া, ভাঙ্গা ঘরে শুইয়া, আধ পেটা খাইয়া, শীর্ণ দেহে কোন মতে কালক্ষেপ করে। এক যোড়া পরিষ্কার ধুতি চাদর বোচকায় থাকে, কেবল বেরুবার সময় পরে; এক যোড়া জুতা চালের বাতায় থাকে, ক্বচিত কখনও পায় দেয়। সাবধানে আস্তে আস্তে চলে, পাছে খোচা লাগিয়া কাপড় খানা ছেড়ে, বা হুছোট লাগিয়া জুতাটা যায়। মানী লোক,কাহারও নিকঠ ছোট হইতে পারে না, কারও কাছে অভাব জানায় না। অনশনে থাকিয়াও হাসিয়া বেড়ায়, অবস্থার ক্লেশ জানিতে দেয় না। শারীরিক পরিশ্রমের অভ্যাস নাই, পুরুষানুক্রমে জমি জমায় চলে, এক্ষণে জমি জমায় সেই আয় আছে, কিন্তু দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইয়াছে, মোকর্দ্দমায় টেক্‌সে ও যান খরচে ব্যয় বাড়িয়াছে, সে আয়ে আর চলে না। শতবিধ অভাবের দংশনে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া কত যে মধ্যবর্ত্তী শ্রেণীর মহৎলোক, কেহ সন্তান রাখিয়া, কেহ নির্ব্বংশ হইয়া, লোপ পাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। দেশের কি শোচনীয় অবস্থা!

দ্রব্যাদি মহার্ঘ হইল কেন? ক্ষেত্রে শস্য উৎপন্ন হয় না কি? ইহার কারণ জানিতে হইলে দেশের আমদানি রপ্তানি বুঝিতে হইবে। ইংলণ্ড হইতে যে সকল বণিকেরা এদেশে কারবার করিতে আসে, তাহারা কখনও নগদ টাকা আনে না। কেহ কেহ কাপড় লবণ লোহা ইত্যাদি লইয়া আইসে, কিন্তু অধিকাংশ লোকে,সেক্রেটরী অভ্ ষ্টেট হোমচার্জের নিমিত্ত যে কাউন্সিল-বিল অর্থাৎ হুণ্ডী বিক্রয় করেন, সেই হুণ্ডী খরিদ করিয়া কাগজ টেকে করিয়া আসে। এ দেশে আসিয়া চাল, গম, তিসি, তুলা, পাট, যাহার যাহা লাভজনক বোধ হয়, খরিদ করে, এবং ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য ঐ হুণ্ডী সকলের দ্বারা বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হইতে আমাদিগের টাকা দ্বারা পরিশোধ করে। খরিদা মাল চিনেই বিক্রয় করুক, আর আমেরিকাযই বিক্রয় করুক, ফিরিয়া এদেশে খরিদ করিতে আসিবার সময় কদাচ নগদ টাকা আনিবে না। এরূপ কারবারে পরিণামে এই দাঁড়ায় যে, হোমচার্জের বিশ কোটী টাকা আমাদিগের নগদ টাকার দ্বারা নহে, উৎপন্ন দ্রব্যের দ্বারা পরিশোধ করিতে হয়। দেশের উৎপন্নে স্বদেশের লোকের চলিয়া যদি বিশ কোটী টাকার সামগ্রী উৎবত্ত হইত, তাহা হইলে দ্রব্যের দ্বারা হোমচার্জের দেনা শোধ করিতে আমাদিগের কোন কষ্ট হইত না। মনে কর, ক্ষেত্রে দশকোটী মণ চাউল জন্মিল; তাহার সাত কোটী মণ এদেশের খোরাকীর জন্য আবশ্যক। এরূপ স্থলে বৎসর না অতীত হইতে যদি বণিকেরা পাঁচ কোটী মণ চাউল লইয়া যায়; তাহা হইলে দুর্ভিক্ষ বা দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি হইবে না কেন? প্রতি বৎসরেই এইরূপে মাল রপ্তানি হইতেছে। দুর্ভিক্ষের কারণ খুঁজিতে কমিসনের কি আবশ্যক? এইত জাজ্বল্যমান কারণ দেখা যাইতেছে।

ব্যাঙ্ক হইতে যে সকল টাকা বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যস্বরূপে পাইয়া থাকি, তাহা হইতে গবর্ণমেণ্টের পাওনা দিয়া আমাদের চলিবার টাকা থাকে না। যদি দ্রব্যাদি না মহার্ঘ হইত, তাহা হইলে কোন মতে চলিত।

এক্ষণ দেখিতে হইবে যে,কি উপায়ের দ্বারা এ দারিদ্র্যের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে। হোমচার্জের হাত হইতে বাঁচিবার জো নাই, তাহা গবর্ণমেণ্টের দেহের সহিত গাঁথা। যখন দিতেই হইবে, তখন নগদ দেওয়া বা শস্যের দ্বারা দেওয়ায় বিশেষ কোন ইতর বিশেষ নাই, বরং ইহা খুব সম্ভব যে এরূপ করিয়া শস্য বিক্রয় করিয়া না টাকা জমাইয়া লইতে পারিলে এ দরিদ্র জাতির নিকট হইতে এরূপ অপর্য্যাপ্ত হোমচার্জ লওয়া গবর্ণমেণ্টের অসাধ্য হইত। এজন্য দারিদ্র্য পরিহার করিবার সুবিধা নাই, হ্রাস করিবার এই এক উপায় আছে যে, যে সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে এ দেশে আমদানি হয়, তাহা খরিদ না করিয়া কোনরূপ যদি চালান যায়, তাহা হইলে কিছু অর্থ দেশে থাকিয়া যাইতে পারে।

বিদেশীয় আমদানি দ্রব্যের মধ্যে কাপড়, লবণ, লোহা, কাচ, টিন, কেরাসিন তৈল, সাবান, দেসলাই, কালী, খেলনা, বাজা, বিস্কুট, ছবি, ছাতা, বার্ণিশ চামড়া, ঔষধ, কাগজ, এই সকল প্রধান। ইহার মধ্যে কাপড় প্রস্তুত করিতে পারিলে বিদেশীর হাত হইতে নিস্তার পাইতে পারা যায়।

হস্তপ্রস্তুত কাপড়ের পোষকতা করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে যে একটা জেহাদ উঠিয়া থাকে, তাহা অলৌকিক, কারণ হাতের কাজ কখনও কলের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারে না; ষ্টিমারের সহিত নৌকার বাইচ্ যেমন উপহাসাস্পদ, তাহাও তদ্রূপ। পৃথিবীর সকল দেশে কলের ছড়াছড়ি, তুমি কেন অবৈজ্ঞানিক ব্যয় বাহুল্য প্রথার সমর্থন করিবে? তাঁতি জোলার ভাত মরিবে বলিয়া যে আপত্তি করিবে, তাহা শুনিবার অযোগ্য। কারণ, যে দিন কলের আবিষ্কার হইয়াছে, সেই দিন তাহারা মরিয়াছে, তাঁত জলে গিয়াছে, এখনও যে আছে সে জোর করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া, এবং তোমার তাঁতি জোলার চারি পয়সায় দিন যায়, তাইতে। এক্ষণ নিবৃত্ত হও, ও রীতির প্রশ্রয় দেওয়া পৃথিবীর মিতব্যয়ের বিরুদ্ধ; ঐ সকল তাঁতি জোলার ইহা অপেক্ষা ভাল কার্য্য নিযুক্ত হওয়া আবশ্যক। আমি বিবেচনা করি, কল বসাইয়া সেই কলে তাহাদিগকে কাজ দেওয়া উচিত; তাহাদিগের শিক্ষিত হাতে সে কাজ যেমন সুচারুরূপ চলিবে, তেমনি উত্তম ভরণ পোষণ হইবে। কল পাইতে পারিলে কেবল যে আমরা বস্ত্রবিষয়ক স্বাধীনতা লাভ করিব, এমত নহে, ভরসা করি এসিয়ার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহকেও পাঠাইতে পারিব। কারণ শুধু আমাদিগের ভুলাতেই ইয়ুরোপ আচ্ছন্ন।

লবণ পূর্ব্বে এদেশে প্রস্তুত হইত, তারপর কি হেতুবাদে জানি না, এদেশের প্রস্তুত বন্ধ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ল্যাংকাশাযারকে অনুগ্রহ করিয়াছেন! ইহাতে যে কত ভারতবাসীর অন্ন মারা গিয়াছে, তাহার অবধি নাই। ঘুটে পোড়া গোবর হাগা দেশ নহিলে এই গ্রাম্য-উচ্ছেদে একটা তুমুল ঝড় উঠিত। সে কথা এক্ষণ পুরাতন। এক্ষণকার কর্ত্তব্য, অনুনয়ে বিনয়ে গবর্ণমেণ্টকে ধরা। সম্মত হইতে গবর্ণমেণ্টের যে সকল বাধা আছে, তাহা আমি জানি। ইংলণ্ডের মিনিষ্ট্রি ল্যাংকাশাযারের ভোটের ভয়ে অস্থির। এখানকার গবর্ণমেণ্ট সেই মিনিষ্ট্রির ভৃত্য; কিন্তু বোধ করি, যদি সমগ্র ভারতবাসী সমস্বরে প্রার্থনা করে, তাহা হইলে হইতেও পারে। অথবা যদি আমরা আমাদিগের লবণ প্রস্তুত করিতে পারি, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উচিত নহে, আমাদিগের হাত পা বাঁধিয়া পরের হাতে সমর্পণ করা। গবর্ণমেণ্ট এদেশ হইতে বেতন পান, এ দেশের হিত দেখা তাঁহার উচিত। আমরা অঙ্গীকার করিতেছি যে, ইহাতে এ দেশের রাজস্বের এক কপর্দ্দকেরও হানি হইবে না।

লোহার কাজ বরাকরে কিছুদিন চলিয়া বন্ধ ছিল। লর্ডরিপন পুনরায় চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, আবার শুনিতেছি, তাহা বন্ধ হইয়াছে। অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত, কি কারণে ইহার ব্যাঘাত হইতেছে। আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি, পঞ্চকূট পর্ব্বতে ও তাহার চতুর্দ্দিকে বিস্তর অপরিষ্কৃত লোহা পড়িয়া আছে, আর কোথায় কোথায় আছে, জানি না। তত্ত্ব লইয়া কাজ লাগাইলে, বোধ হয়, আমাদিগের লোহায় আমাদিগের কাজ চলিয়া আরও উদ্বর্ত্ত হইতে পারে।

কাচ প্রস্তুত এদেশে হইতে পারে। যদি উষ্ণস্থানে না হয়, সিমলা, দার্জ্জিলিং, কাশ্মীর, এসকল স্থানে করিলে হয়। টিন এদেশে হইতে পারে না, উহার খনি এদেশে নাই। কেরাচিন তৈল আস্তে আস্তে দেশ আচ্ছন্ন

করিয়াছে, ইহার লাভাধিকারী মার্কেনেরা। ইহার উপর ডিউটী বসাইয়া গবর্ণমেণ্ট মার্কিনদিগের তারিফের প্রতিশোধ লইয়াছেন। সাবান এদেশে হইতে পারে, কলিকাতায় আহিরীটোলার প্রিয়নাথ চন্দ্র শিল্প-প্রদর্শিনীতে নিজের প্রস্তুত সাবান দিয়া সার্টিফিকেট পাইয়াছিলেন। দেসলাই একটা সামান্য সামগ্রী, তাহা এতদিন এ দেশে না হওয়া আমাদিগের বড়ই লজ্জার বিষয়। আমি বোধ করি, পাটখড়ি চিরিয়া কাটী করা যাইতে পারে, ও মান্দারের তক্তা দ্বারা বাক্স প্রস্তুত হইতে পারে। কালী সীতানাথ ঘোষ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু দোয়াত অভাবে এক্ষণও ওযাক্রডেনের বিলাতী কালী আসিতেছে। খেলনা, বাজা, ও বিস্কুটের কোন চেষ্টা হইতেছে কিনা জানিনা। ছবি আঁকার সূত্রপাত আর্টস্কুলে হইয়াছে। এক্ষণকার চিত্রে শিরা পেশী দেখা যায়, পালদিগের দেবচক্ষু, সুগোল হাত পা অন্তর্ধান হইতেছে। সামান্য ছাতাগুলির জন্যও আমরা ইংলণ্ডের দ্বারস্থ।

বার্ণিশ করা চামড়ার একটা বৃহৎ কারবার বিদেশীর হস্তে। আমাদের দেশের চামড়া জাহাজে উঠিয়া বিলাতে যায়। তথা হইতে শ্বেত হস্তের স্পর্শ পাইয়া পুনরায় জাহাজে চড়িয়া এখানে চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রীত হয়। ইহার প্রতিবিধান করা অতীব কর্ত্তব্য। ঔষধ প্রস্তুত আরম্ভ হইয়াছিল, স্পিরিটের ডিউটী বাড়াইয়া সুবোধ গবর্ণমেণ্ট সে কারবারটাকে মুমূর্ষু করিয়া তুলিয়াছেন।

এ সকল বিষয়ে দেশীয় লোকের মনোযোগ নাই। বিদ্যা শিখিয়া চাকরি করিতে হইবে, ইহাই সাধারণের সংস্কার। কিন্তু কলেজ ও ইউনিভার্সিটী কি দাস প্রস্তুত করিবার কারখানা? ডাক্তারদিগের ব্যবসা কি সম্ভ্রান্ত? তাহারা ত বিদেশীয় ঔষধ-ওয়ালাদিগের এক একটী ফড়ে। যিনি যত ঔষধ কাটান, তিনি তত বড় ফড়ে। আমি বিবেচনা করি, আমাদিগের শিল্প সম্বন্ধীয় অধীনতা, রাজনৈতিক অধীনতার প্রসূতি। যদি কাহারও এ জাতির প্রতি মমতা থাকে, তবে ক্রমশঃ ইহাকে পর-প্রত্যাশা হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা কর। যে ব্যক্তি আমাদের দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করিয়া ফরাসী কিম্বা আমেরিকা-বাসীকে অশ্রু বিসর্জ্জন করায়, তাঁহার অপেক্ষা, যে আমাদিগকে আলপিন সম্বন্ধীয় অধীনতা হইতে মুক্ত করিবে, সে বেশি দেশহিতৈষী। বিদেশী লোক কয়জন পরের দুঃখ শুনিয়া ব্যথিত হয়? বলিতে তোমার আত্মগ্লানি বোধ হয় না? বাহিরে যদি যাও, কেবল শিখিতে যাইবে, যদি কাঁদিতে হয়, স্বজাতির নিকট কাঁদ,—ঐ চেল-পরিহিত মলিন, হলধারী কৃষকের গলা ধরিয়া কাঁদ। পরের কাছে কাঁদিলে সে কাঁদে না, প্রকাশ্যে না হউক, মনে মনে হাসে।

শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুমারিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্য্য।

ভারত বীর-প্রসবিনী। ধর্ম্ম-বীর, রণ-বীর, শাস্ত্র-বীর প্রভৃতি অসংখ্য বীরগণ ভারতক্ষেত্রে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

যে সময়ে ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের জয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইয়াছিল, অহিংসা পরম ধর্ম্ম বলিয়া জনসাধারণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপে বীত-শ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, সে সময়ে কে ভাবিয়াছিল যে, অসাধারণ ধী-শক্তি-সম্পন্ন মহাত্মা ভট্টপাদ ও শঙ্করাচার্য্য পুনরায় ভারতে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন!

শাক্য-প্রতিদ্বন্দ্বী মহানুভব ভট্টপাদ (কুমারিল ভট্ট) সৌগত পণ্ডিত এবং বৌদ্ধ অমাত্যগণ পরিবেষ্টিত সুধন্বা নৃপতির সদনে সমাগত হইয়া বিচার বিতর্কে বৌদ্ধগণকে পরাভূত করেন। তিনি রাজসভায় সমাসীন হইয়া অদূরে পিকধ্বনি শ্রবণকরতঃ নিম্নলিখিত দ্ব্যর্থবোধক শ্লোকটী পাঠ করিয়া প্রথমেই বৌদ্ধগণের ক্রোধানল উদ্দীপিত করেন।—

মলিনৈশ্চেন্ন সঙ্গস্তে শঠৈঃ কাককুলৈঃ পিক।
শ্রুতি দূষক নিহ্রাদৈঃ শ্লাঘনীয় তদাভবে॥

হে পিক! মলিন, শঠ, শ্রুতিদূষক রবকারী কাককুলের সহিত যদি তোমার সংসর্গ না থাকিত, তাহা হইলে তুমি শ্লাঘনীয় হইতে।

শ্রুতি-দূষক—শ্রবণ দুঃসহ, পক্ষান্তরে বেদনিন্দুক। কাককুল, [illegible]দ্ধকুল।

রাজা সুধন্বা শূন্যবাদী এবং বেদবাদীর বহুবিচার বিতর্ক শ্রবণ করিয়া ও স্বয়ং কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলেন না। শেষে বেদবাদী ভট্টপাদের পরীক্ষার্থে তাহাকে উচ্চ পর্ব্বতের উপর হইতে নিম্নে নিক্ষিপ্ত করিলে, ভট্টপাদ অক্ষত শরীরে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করেন।

বিচারে বৌদ্ধগণ* পরাজিত হইলে, সুধন্বা রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। বৌদ্ধগণ তৎকর্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হন। রাজা বৌদ্ধবিনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হইলে বৌদ্ধগণ প্রাণভয়ে পূর্ব্ব ও পশ্চিম প্রদেশে পলায়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে রাজা সুধন্বার রাজ্য বৌদ্ধশূন্য হইলে শ্রীমান কুমারিল ভট্টপাদ রাজ্যমধ্যে বর্ণাশ্রম ও বৈদিক ধর্ম্মাচার সংস্থাপন করেন।

বৌদ্ধ-বিদ্বেষী শঙ্করাচার্য্য এবং কুমারিল-ভট্ট সমসাময়িক। কিন্তু ভট্টপাদ যে শঙ্করাচার্য্যের অগ্রেই বৌদ্ধধর্ম্মে আঘাত করেন, তাহার প্রমাণ শঙ্কর-দিগ্বিজয়, দিগ্বিজয় সার এবং শঙ্করবিজয়জয়ন্তী প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ রূপে লিখিত আছে। শঙ্কর সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণের পরে গুরুশ্রেষ্ঠ গোবিন্দাচার্য্যের আশ্রমে শিক্ষা লাভ করিয়া নানাদেশ ভ্রমণ করতঃ কাশীধামে স্থিতি করেন। তথায় লোক পরম্পরায় ভট্টপাদের কাহিনী অবগত হইয়া, তাঁহার দর্শনলাভাশায় কাশীধাম হইতে যাত্রা করিয়া প্রয়াগে উপনীত হন। তিনি ভট্টপাদের আলয়ে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, বুধশ্রেষ্ঠ শ্রৌত-কর্ম্ম বেদমার্গ প্রবর্ত্তক কুমারিল তুষানলে

প্রবেশ করিতেছেন। শঙ্করাচার্য্য, ভট্টপাদকে তুষানল প্রায়শ্চিত্ত না করিতে বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়া, তৎকৃত ভাষ্যের বার্ত্তিক (উক্ত, অনুক্ত, পুনরুক্তার্থ প্রকাশক) করিতে বলিলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কুমারিল প্রায়শ্চিত্তে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না। ভট্টপাদ বলিলেন,—"স্বামিন্! আমি ঘোরতর পাতকী; আমার সংক্ষিপ্ত কাহিনী বলিতেছি, শ্রবণ করুন ;—সন্মার্গ-দূষক বৌদ্ধগণের প্রবল আধিপত্য,সুতরাং বৈদিক ধর্ম্মের লয় দশা দেখিয়া আমি মর্ম্মাহত হই। কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া রাজ গৃহে প্রবেশ করি। তাথায় সৌগতগণ সুধন্বা রাজাকে বশীভূত করিয়া, বেদ প্রমাণ মিথ্যা, এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছিল। সেই সময়ে আমি তাহার কোন প্রতিবাদ করি না; কারণ বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। সেই ধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ বাসনায় সৌগতগণের শরণ লইলাম, এবং যত্ন সহকারে বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত পাঠ করিলাম। একদা কোন বৌদ্ধ-শ্রুতিতে দোষারোপ করিলে আমার নয়নাশ্রু নিপতিত হইল। বৌদ্ধগণ আমার এবম্বিধ ভাব-বিপর্য্যয় দর্শনে আমার প্রতি শত্রুতাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহারা সকলে সমবেত হইয়া মন্ত্রণা করিলেন যে, ভট্টপাদ বলবান বিপক্ষ, নিশ্চয় আমাদের ধর্ম্মে আঘাত করিবে। অতএব ইহাকে বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। কোন এক সময়ে তাঁহারা আমাকে প্রমত্ত জানিয়া উচ্চ সৌধাগ্র হইতে নিম্নে নিক্ষেপ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, তাহাতে আমার প্রাণবিয়োগ হইল না, কিন্তু একটী চক্ষু বিনষ্ট হইল।

ইত্যগ্রে আমি জৈমিনীর মতে প্রবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরেও অবিশ্বাসী হইয়াছিলাম। গুরু-দ্রোহিতা এবং ঈশ্বর অমান্য দোষদ্বয়ের নিষ্কৃতি বিধি পূর্ব্বক করিতে উদ্যত হইয়াছি। আপনার কৃত ভাষ্যের বার্ত্তিক করিয়া যশস্বী হইবার আমার আর সময় নাই, আমি ব্রত-ভঙ্গ করিব না।"

তিনি তুষানলে মৃত্যুর পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যকে অনেক কথাই বলিয়াছিলেন; তাহার শেষ কথা গুলি এই—

"যদি অদ্বৈত মার্গ প্রকাশ করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তবে অগ্রে মণ্ডনাখ্য কবিকে জয় করুন, তাঁহাকে জয় করিলে জগৎ জিত হইবে। মণ্ডন কর্ম্মি-গণের মুখ্য আচার্য্য, গার্হস্থ্যের প্রবর্ত্তক, নিবৃত্তিতে অকৃত-আদর। তাঁহাকে স্ববশে আনয়ন করুন। তাহা হইলেই অভি-প্সীত সিদ্ধ হইবে।"

প্রাচীন গ্রন্থ সকল কল্পনার লীলা ক্ষেত্র। তাহা হইতে সত্য উদ্ধার করা অতি দুরূহ ব্যাপার। যাহা হউক, আগামীতে আমরা ভট্টপাদ ও শঙ্করাচার্য্যের কাল নিরূপণের যথা শক্তি চেষ্টা করিব। লেখা বাহুল্য যে, এ সম্বন্ধে আমাদিগকে ইয়ুরোপীয় বুধ-মণ্ডলীর পদানুসরণ করিতে হইবে।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

ফুরাল সকল আশা শেষ ভিক্ষা চাই।

নগরে প্রান্তরে গিরি গভীর গহ্বরে
তটিনী সৈকত তটে পদ্ম-সরোবরে
যখন যেখানে যাই, তোমারে নিকটে পাই,
হৃদয়ের স্তরে স্তরে অন্তরে অন্তরে।
সকলি দিয়াছ মোরে কিছু বাকী নাই
ফুরাল সকল আশা শেষ ভিক্ষা চাই।
সকলি দিয়াছ তুমি আশা মিটে নাই
নয়নের জলধারা তবু ঘুচে নাই।
ধন মানে মিলে নাই, আমারে দিয়াছ তাই,
হৃদয়ের সিংহাসনে সদা দেখা পাই,
তবু তৃপ্তি নাই তাই যেতে বলে যাই;
ফুরাল সকল আশা শেষ ভিক্ষা চাই

চারিদিক খুঁজিয়াছে তোমা দেখিবারে
তৃষিত নয়ন ক্লান্ত অন্ধ আঁধিযারে;
না চলে চরণ আর, সাঁতারিতে সাধ্য কার
দুর্ব্বল এ বাহু লয়ে ভীম পারাবারে,
না বলে রসনা পাছে তাই বলে যাই,
ফুরাল সকল আশা শেষ ভিক্ষা চাই।

সেই দিন কাছে এসে ব'স একবার
মাথার উপরে হাত রাখিও তোমার,
এক বার নাম ধরে, ডেক সেই সুধাস্বরে
একটী অপূর্ব্ব গান গেও আপনার।
সেই দিন দিও সেই শেষ উপহার,
এক ফোঁটা জল তোমা দিব পুরস্কার।

শ্রীপ্রেমদাস বৈরাগী।

স্মৃতিচ্ছায়া।

অলস, আকুল প্রাণ, হৃদয় চেতনা-হারা!
অধীর কল্পনা-স্রোত উদাস স্বপনে ঘেরা
আঁখি জল ছুটে আসে কি জানি আকুলি প্রাণ!
কি জানি হৃদয়-তারে বাজে বিষাদের তান!
সন্ধ্যার গগন গায়, সাঁঝের তারাটি চায়,
প্রশান্ত নয়নে তার দেখি সে মুখের ছায়া,
ধীরে, ধীরে, হেসে হেসে, তারার আলোকে ভেসে,
সে যেন চুমিয়া যায় মন প্রাণ আকুলিয়া!
নিঝরিণী চলে যায় মৃদু গেয়ে কুল কুল;
তীরে জ্যোছনার কোলে আধ ফোটা যুঁই ফুল;
চারু হাসি হাসি মুখ পাতার আড়ালে ঢাকা,
ঘুমন্ত নয়নে তার প্রেমের মাধুরী লেখা,
মৃদুল নিশীথ বায়, যুথিকা দোলায়ে যায়,
অমনি নয়নে ভাসে আরেক নূতন ছবি:
কত যে কবিতা লয়ে, কত গান গেয়ে গেয়ে,
হৃদয়ে জাগিয়া উঠে আমার প্রাণের কবি!
স্মৃতির মুরলী ধরি নীরবে সে গায় গান;
ধীরে ধীরে কেঁপে উঠে নিচল, নিথর প্রাণ!
তটিনী উথলি চলে, জ্যোছনা উছলি যায়,
তারকা ঘুমের ঘোরে সহসা চমকি চায়!
প্রকৃতি উদাস প্রাণে, নেহারে আকাশ পানে,
পবন নিশ্বাস ছাড়ি কোথা যেন চলে যায়!
ফুলটি কাঁপিয়া উঠে, পাতাটি মাটিতে লুটে,
আলোকে আঁধার আসে, আঁধারে আলোক ভায়!
ধীরে ধীরে জেগে উঠে প্রাণের লুকানো কথা!
ধীরে ধীরে জেগে উঠে কত কি পুরানো ব্যথা!
কত উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস সে গানে আকুলি ছুটে!
কত উষ্ণ অশ্রুজল আঁখি কোণে আসি লুটে;

হৃদয়ের স্তরে স্তরে, ফুটে উঠে ধীরে ধীরে
স্বপন-আবেশময়ী মাধুরী কাহার!
আজি এ সাগরকূলে, কি জানি কি ভাবে ভুলে,
দেখিয়া আপনা-হারা হৃদয় আমার।
আহাসে বিষণ্ণানন কেমন উদার!

শ্রীকিশোরী লাল গুপ্ত।

বসন্তের পাখী।

নিবিড় কানন মাঝে
কোথায় লুকায়ে থাকি,
সহসা কিসের তরে,
উঠিলি মধুরে ডাকি?
হিমঋতু ধীরে ধীরে
চলে গেছে কোন্ দেশে,
কুয়াসার মেঘ গুলি
সরাইয়ে মৃদু হেসে;
নবীন বসন্ত আলো
মোহিনী ঊষার সাথে
দেখা দিল, তাই কিরে
উঠিলি পুলকে মেতে?
কাননে ঝোপের মাঝে,
কত তোরে খুঁজি আমি,
মোহিত পরাণ মম
তোর ওই স্বর শুনি,
কেনরে পাগল হয়,
জানি না কি আছে ওতে,
দেখি নাই কভু তোরে
বিমোহিত শুধু গীতে;
কোথা হ'তে এসেছিস্
এত সুখভরা প্রাণে?
কেন এত সুধাধারা
ঢাল বসন্তের প্রাণে?
স্বাধীন, আনন্দময়
কোমল পরাণ তোর,
বুঝিতে পারিনা হায়,
কি সুখ স্বপনে ভোর,
তোমার বিহার ভূমি
ললিত পল্লবে ঢাকা,
বসন্তের কুঞ্জবন
কুসুম সুবাস মাখা,
স্বাধীন পরাণ খুলে,
মৃদুল মারুত ভরে
গাও যবে সুখে তুমি
দুল্যমান শাখা'পরে,
জগতের সুখ ভুলি,
সাধে কিরে প্রাণ মন
অই মধুময় গীতে
হয়ে যায় নিমগন?
গাও তবে গাও পাখি,
তুলিয়ে পঞ্চম তান,
শুনিব তোমার গীত,
ঢেলে দিয়ে মন প্রাণ॥

শ্রীপ্রমীলা বসু।

দরিদ্রতা।

সে যে ভাল—তাই চাই, তাহ মোর শ্রেয়
বিদূর দারিদ্র্যে যেন দিন কেটে যায়,
দর্পী যেন মনে করে ঘৃণাস্পদ হেয়
গর্ব্বের আশ্রয় তবু এ জন না চায়।
বসন ভূষণহীন কাঙ্গালের ঘরে
ম্লানমুখ দুখ আসে কাতর বদন,
মণিময় কনকের দীপ্ত কলেবরে
সুখবেশী-দুখ যেন না আসে কখন।
শ্রমের বিরাম সুখ।—সতত বিরাম
ভাবহীন শব্দহীন গভীর বিজন
থাকে না প্রাণের সেথা বিন্দুমাত্র নাম
শমীর মতন মর্ম্মে জ্বলে হুতাশন,
সুখের যে দুখ তার নাহি করি আশা,
দুখের যে দুখ তার চাই ভালবাসা।

শ্রীবেনওয়ারিলাল গোস্বামী।

শ্মশান দর্শনে।

বিশাল আঁধার মাঝে স্তবধ শ্মশান ভূমি
মুদিয়া নয়ন,
অতি সঙ্গোপনে যেন বিনাশের মহামন্ত্র
করিছে সাধন!
শব-শয্যা কাঁপাইয়া চিতা-ভস্ম উড়াইয়া
বাতাস বহিছে র'য়ে র'য়ে!
করাল বদন মেলা, উলঙ্গ করিছে খেলা
ছায়রূপী মৃত্যু,যেন অস্থিরাশি ল'য়ে!

নীরবে চিতার পরে উপছায়া নৃত্য করে
বাঁধি পায় পায়.
বিভীষিকা এলো চুলে আধ ঘুমে ঢুলে ঢুলে
ঘুরিয়া বেড়ায়!
ঘুরিছে শ্মশানময় কি যে এক হাহাকার,
কি যে এক নিরাশার ছায়া,
দগ্ধ কঙ্কালের পরে নিরালম্বে বায়ু ভরে
অশরীরী আত্মাগুলি আছে দাঁড়াইয়া।

অস্ফুট রোদন-ধ্বনি পথহারা হয়ে যেন
চিতামাঝে ঘুরিয়া বেড়ায়,
প্রতি কঙ্কালের পাশে আশা কাঁদে বিনাইয়া
"ফেলে রেখে চলিলে কোথায়!"
প্রতি নরমুণ্ড যেন মেলিয়া বিকট দংষ্ট্রা
নীরবে হাসিছে অবিরাম
ইঙ্গিতে বলিছে যেন "দেখ মুগ্ধ নরগণ
তোমাদের ভাগ্য পরিণাম!"

শ্রীযদুনাথ ঘটক।

প্রতিধ্বনি।

মহান্ শৈলের শিরে কে তুমি ললনে,
খেলিতেছ শোভাময়ী পাগলিনী প্রায়.
কখন হাসিয়া বালা জগত হাসাও
কখন কাঁদিয়া বালা জগত কাঁদাও!
কখন নীরদ কোলে
কখন চাঁদিমা তলে
কভু বা তারকাবক্ষে লুকাইছ গিয়া।
কখন মরত তলে
আকাশ গঙ্গার জলে
কখন বা নৈশাকাশে উঠিছ ভেদিয়া।
এই সাগরের তীরে
ওই পর্ব্বতের শিরে,
কভু বা ধরার বক্ষে পড়িতেছ লুটে.
কে ললনে খেলিতেছ অদৃষ্টের পটে!

কুমারী প্রিয়বালা রায়।

বিরহ।

চাঁদের বুকের'পরে
রোহিনী মাথাটী রাখি
দেখিতেছে বিরহ-স্বপন,
সভয়েতে উঠিছে চমকি।

সে মধুর মুখ দেখে
কাঁদিতে হাসিয়া ফেলে,
অশ্রুজল চোখে রেখে
মু'খানি লুকায় কোলে

চাঁদের অধর থেকে
একটী চুম্বন পেলে,
অভিমানী গরবিনী
সরমে কাঁদিয়া ফেলে

এমন বিরহ যদি
হৃদয়ে ঘটে গো মোর
হেসে হেসে কেঁদে কেঁদে
সুখেতে হইব ভোর।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়।

সুখী বিপত্নীক।*

বিয়ে কল্লুম কুঁড়ুলে বউ
চোদ্দুই নবেম্বরে,
আমার জীবন কল্লে টানাভাব
সে একার অত্যাচারে।
বহু দিন তার বইলুম বোঝা,
ভুগ্‌লেম কত ঝাল,
বলি একটা সুখের কথা—
হোয়েছে তার কাল।
ঘর কল্লুম একুশ বছর
গুঞ্জনাতে মিশে,
ভাগ্‌ল শেষে আমায় ছেড়ে
না জানি কোন্‌ দেশে।
অনুমানে বল্‌ছি সাঁচা,
স্তোক বাক্য নয়,—
জগতে না দেখ্‌ব মেয়ে,
তাহার মত হয়।
যত্ন কোরে রেখেছি তায়
সুন্দর কবরে,
নরকে সে নাইকো খাঁটি,
পেত্নী তাকে ডরে।
মালুম হয় সে মাথার উপর
বাজ আওয়াজে হাঁকে,
শুনি যেন শব্দটী তার
মেঘ চিরে যে ডাকে।

শ্রীবিজয় চন্দ্র মজুমদার।

বঙ্গে জৈন সম্প্রদায়।

পূর্ব্বকার প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণের মতে, বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি, সুতরাং জৈনেরা বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের একটী শাখা মাত্র। তাঁহারা বলেন, মহাপুরুষ শঙ্করাচার্য্যের প্রবল প্রতাপে বৌদ্ধগণ যখন ভারতবর্ষ হইতে তাড়িত হন, সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ "বৌদ্ধ" নাম পরিত্যাগ করিয়া "জৈন" উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক দেশে থাকিয়া যান। কিন্তু এখনকার ইউরোপীয় প্রাচ্যপুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ (Orientalists) এ কথা মানেন না, বহু গবেষণা দ্বারা তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্ব্বেও জৈনগণ ভারতে প্রভাবশালী ছিলেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মনিয়র উইলিয়ম্‌স্‌ বলেন, বর্ত্তমান গবেষকগণ স্থির করিয়াছেন, জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরস্বামী শাক্যসিংহের সমকালিক লোক ছিলেন। মহাবীর বর্দ্ধমান অথবা মহাবীর স্বামী এক জন শেষকালের তীর্থঙ্কর, তাঁহার বহুপূর্ব্ব হইতে জৈন ধর্ম্মের প্রভাব চলিয়া আসিতেছে। যাহা হউক, এই সকল ভূতকালের গভীর অন্ধকারময় বিষয় মীমাংসা করা আমাদের সাধ্য নয়, আমরা এ সব গুরুতর কাজে হাত দিতে অধিকারী নই। দেশ ও কাল সম্বন্ধে নিকটে ও বর্ত্তমানে যাহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহাই এই প্রস্তাবে আলোচনা করিব। কলিকাতা নগরে যে সকল অদ্ভুতভাষী উষ্ণীষধারী ব্যক্তিগণ "কেঁয়ে" নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদেরই সম্বন্ধে দুই

* Burn's Joyful widower.

চারি কথা পাঠকগণের গোচর করিতে চেষ্টা পাইব।

রাজধানীর বড়বাজারাংশে যে বণিক সম্প্রদায় বিশেষ প্রতিপত্তির সহিত বাণিজ্য চালাইয়া থাকেন, তাহারা সকলে এক জাতীয় নহেন, দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক দল আগরওয়ালা বণিক, বল্লভাচার্য্য প্রভৃতির শিষ্য, বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বৈশ্য-বর্ণের হিন্দু, অপর মাড়ওয়ারি পার্শ্বনাথ প্রভৃতি সাধুদের পূজক, এক প্রকার নাস্তিক ধর্ম্মাক্রান্ত, ওস্বাল জাতীয় জৈন। এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণকে বিশেষ রূপে "কেঁয়ে" আখ্যা দেওয়া হয়। কি প্রকারে উঁহারা এই নাম পাইলেন, ঠিক বলা যায় না। অনেকে অনুমান করেন, তাহাদের বিকট, কেউ মেউ ভাষাই ইহার কারণ, আবার কেহ কেহ বলেন, টাকা কড়ি আদায় করা সম্বন্ধে ইঁহারা নাছোড় পিণ্ড বলিয়াই ঘৃণা ব্যঞ্জক "কেঁয়ে" নাম দেওয়া হইয়াছে। যাহা হউক, এ নাম যে উঁহারা বাঙ্গালী বাবুদের নিকট পাইয়াছেন, উঁহাদের নিজের নহে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালায় বাস জন্য বাঙ্গালী, উড়িষ্যার অধিবাসীগণ উড়িয়া, পঞ্জাবের লোক যে প্রকারে পঞ্জাবী হইয়াছে, পশ্চিমাঞ্চলে ওসা নগরে কোন কালে ইঁহাদের বাসস্থান ছিল বলিয়া ইঁহারা ওস্বাল বলিয়া পরিচয় দেন। এদেশে আমরা যাঁহাদিগকে সর্ব্বদা দেখিতে পাই, তাঁহাদের অধিকাংশ রাজপুতানার অন্তর্গত বিকানীর প্রদেশ হইতে আসিয়াছেন। কলিকাতা ভিন্ন বালুচর, আজিমগঞ্জ, নসিপুর প্রভৃতি মুরসিদাবাদ নগরের নিকটস্থ কয়েকটী স্থানে ইঁহাদের উপনিবেশ দেখা যায়। যখন মুরসিদাবাদের নবাবের খুব প্রতিপত্তি ছিল, সেই সময়ে বাণিজ্য হেতু ইঁহারা এ প্রদেশে আসিয়া বাস করেন। এবং বেশ দশ টাকা উপার্জ্জনও করেন। প্রসিদ্ধ জগৎ শেঠ উমিচাঁদ প্রথম এদেশে আসিয়া নিজামত হইতে বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারই পশ্চাতে বহু ওস্বাল আসিয়া তাঁহার প্রসাদে ধনশালী হয়েন। সে কালে ব্যবসা বাণিজ্যে ইঁহারা বেশ পটু ছিলেন, আজ কাল আর সেরূপ উন্নতি লাভ করিতে দেখা যায় না, কারণ বর্ত্তমান সময়ে সকল কাজেই বুদ্ধি বিদ্যার প্রয়োজন হইয়াছে, সে বিষয়ে ইঁহারা নিতান্তই অভাবযুক্ত। টাকা ধার দিয়া সুদের সুদ গণিতে খুব জানেন এবং মানুষকে দেনার দায়ে ফেররার করিতেও তৎপর। অনেকে জানেন, মুরসিদাবাদের ভূতপূর্ব্ব নবাব নাজেম ইঁহাদের দেনার দায়ে ফেরার হইবার উপক্রম হন, শেষে ইংরেজরাজের সুবিচার ও সুব্যবস্থা দ্বারা রক্ষা পাইলেন। তিনি যত টাকা বাস্তবিক ঋণ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কাগজপত্রে তাহার ৫০।৬০ গুণ দাঁড়ায়। এক লক্ষ টাকা ধার লইয়া দুই লক্ষ টাকার তমস্সুক দিতেন, তাহার মধ্যে উঁহার হাতে পঞ্চাশ হাজার বই পৌঁছিত না, আবার সুদের হার ভয়ঙ্কর, ইহাতে দেনার দায়ে ফকির হইতে মানুষের কয় দিন লাগে? বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে এই ঘোর অত্যাচার হইতে না রক্ষা করিলে, জৈন ভায়ারা নিশ্চয় নবাব নাজিমের হাতে টুকনি দিতে ছাড়িতেন না—উদ্যোগ সেই প্রকারই হইয়াছিল। টাকা কড়ি সম্বন্ধে ইঁহাদের অনন্ত লীলা। সে সব কথা বলিবার দরকার নাই।

ইঁহাদের আচার ব্যবহার ক্রিয়া-কলা-পাদি বহু পুরাতন প্রণালী অনুসারে চলিতেছে। সে সকল দেখিলে ইঁহাদিগকে ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক না বলিয়া বাবা আদমের আমলের প্রাথমিক জীব বলিয়া মনে হয়। মুরসিদাবাদ জেলায় যাঁহারা অধিবাসী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকের এদেশে তিন, চারি, পাঁচ পুরুষের বাস হইল। এই দীর্ঘ কাল মধ্যে তাঁহারা কেবল ধুতি, কামিজ, চাদর প্রভৃতি পোষাকের অনুকরণ ভিন্ন বাঙ্গালীর আর কোন গুণ পান নাই। সকলেরই ঘরে বিস্তর টাকা আছে, সুতরাং লেখা পড়া করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। আপনাদের কুঠিয়ালি, নাগ্‌রি ও অতি অল্প-বাঙ্গালা শিক্ষা ব্যতীত আর বড় কেউ কিছু জানেন না, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের নামও ইঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করে নাই, সুতরাং কেবল বাহিরের বাবুগিরি ভিন্ন ভিতরে কাহাকেও উন্নতি লাভ করিতে দেখা যায় না। ইংরেজদের স্যাভেজ (savage অসভ্য, বন্য) উল্‌ফ (wolf বৃক) প্রভৃতি পারিবারিক নাম দ্বারা যেমন জানা যায়, উঁহারা এক কালে নিতান্ত অসভ্য ছিলেন, ইঁহাদেরও দুগড়, লোঢ়া, ধামাওয়ড়, বাথাড়িয়া প্রভৃতি পদবী দ্বারা বুঝা যায়, ইঁহারা অসভ্যাবস্থা অতিক্রম করিয়া কেবলমাত্র সভ্যতার প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতেছেন। কুসংস্কারাদির ত কথাই নাই, পূর্ব্ব নিবাস বিকানীর হইতে টাট্‌কা এক জন এ দেশে আসিলে তাঁহাকে দেখিয়া বাঙ্গালার এক জন বালক পর্য্যন্ত বেশ বুঝিতে পারে যে, ইঁহারা চৌদ্দ কি পোণের শতাব্দির অন্ধকারের জীব। এ দেশের ৺রাজকুমার ওস্বাল দুই জন যদি এক স্থানে বসিয়া থাকেন, হন্টর সাহেবও ঠিক করিতে পারেন না যে, ইঁহারা এক জাতীয় মানুষ। অথচ হয়ত একজন অপরের অতি নিকট জ্ঞাতি।

ইঁহাদের ধর্ম্মে ২৪ জন তীর্থঙ্কর বিশেষ পূজ্য। ইঁহারা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কাহাকেও মানেন না। আমাদের আবাস ভূমি এই ক্ষুদ্র পৃথিবী অনন্ত অসীম, ইহাই ধর্ম্মমত ও বিশ্বাস। আরও কত আজগুবি কথা ইঁহাদের শাস্ত্রে আছে, তাহার সংখ্যা নাই। নিকৃষ্ট জীবের প্রতি ইঁহাদের বিশেষ দয়া, সুতরাং নিরামিষাহারী, কিন্তু মানুষের প্রতি প্রেম বা দয়া প্রায় আকাশ-কুসুমবৎ। ভিক্ষুককে চাউল বা পয়সা ভিক্ষা দিলে পাপ, গঙ্গায় স্নান করিলে পাপ, দাহ্যমান গৃহ হইতে কোন মানুষকে বাহির করিলে পাপ, এই রূপ অদ্ভুত অদ্ভুত নানা প্রকার পাপের কথা অনেকের মুখে শুনা যায়। এই সকল আশ্চর্য্য মতের পোষক যুক্তিগুলি এরূপ কুটিল যে শুনিলে হাসি পায়, এবং মানুষ যে এতদূর অবণত হইতে পারে, ভাবিয়া কষ্ট হয়। মূল কথা, জৈন ধর্ম্ম শাস্ত্রে এই রূপ কুযুক্তি-পূর্ণ কথা অনেক আছে। কিন্তু আসল কথায় বড় অনৈক্য নাই। শাস্ত্রকারেরা নানাবিধ বাজে কথা বলিয়া শেষে বলিয়া গিয়াছেন, সম্যক জ্ঞান, সম্যক চরিত্র ও সম্যক দর্শন ভিন্ন জীবের মুক্তি নাই।—এই কয়টী কথা ছাড়া আর যাহা আছে, কোনই কাজের কথা নয়, বরং সমূহ অনিষ্টকারী। ৺ডাক্তার রামদাস সেন বহু গবেষণা দ্বারাও কোন সার কথা না পাইয়া তাঁহার ঐতিহাসিক রহস্যে "জৈন ধর্ম্ম নিতান্ত অসার" বলিয়া উহার আলোচনা পরিহার করিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য এই যে, সেকালে ইঁহারা যেমন সহজে এক টাকায় লক্ষ টাকা করিতে পারিতেন, এখন আর সে সুযোগ নাই; ক্রমে বহু ওস্বাল আদালতে "যোত্র হীন অক্ষম ঋণী" (Insolvent debtor) বলিয়া ঘোষিত হইতেছেন. এইরূপ অবস্থায় বিদ্যা-চর্চ্চা দ্বারা সাংসারিক ও মানসিক উন্নতি সাধন করা ইঁহাদের পক্ষে নিতান্তই কর্ত্তব্য হইয়াছে। অতএব বিনীত অনুরোধ, ইঁহারা এখন বাঙ্গালার অধিবাসী হইয়া যেন কোন বিষয়ে বাঙ্গালিদের পশ্চাতে পড়িয়া না থাকেন, এমন চেষ্টা শীঘ্র আরম্ভ করুন। যাঁহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা একত্রে থাকিতে হয়, তাঁহারা নিতান্ত নীচে পড়িয়া থাকিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই দারুণ মনঃপীড়ার কারণ হয়। সমান সমান না হইলেও অল্প উচ্চ নীচ আসে যায় না। কিন্তু সকল সময় একেবারে নীচে ঝুঁকিয়া আবার ব্যবহার করিতে বড় অসুবিধা ও কষ্ট বোধ হয়। টাকার জোরে ঘরে বসিয়া বহুলোককে (বিশেষ বাঙ্গালি-দিগকে) তুচ্ছজ্ঞান করা হয়, অথচ একজন হেড্ কনষ্টেবল দেখিলে জড়সড় হইয়া পড়েন। কেবল বিদ্যাবলের অভাব কি ইহার একমাত্র কারণ নয়? জ্ঞান ভিন্ন হৃদয়ের বল কখনই সম্ভবে না। তাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, এদেশের জৈন ভ্রাতাদের মধ্যে বিদ্যাদেবীর পূজা সত্বর আরম্ভ হউক। উঁহারা পার্শ্বনাথজীর মন্দিরে গিয়া নিত্য প্রার্থনা করেন, "ধন্ দে পুৎ দে"; এখন হইতে যেন ঐ দুইটী কাম্য বস্তুর সঙ্গে বিদ্যাও যাচ্ঞা করেন, ইহাই বিনীত নিবেদন।

শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **স্বাস্থ্যরক্ষা ও সাধারণ স্বাস্থ্য-তত্ত্ব—দ্বিতীয় ভাগ,** শ্রীযুক্ত বাবু ধর্ম্ম দাস বসু, ফরিদপুরের সিভিল সার্জ্জন প্রণীত; মূল্য ২৲ দুই টাকা।

ভারতবর্ষে যদিও সকল বিজ্ঞান-বীজের অঙ্কুর হইয়াছিল, তথাপি ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে যে, এদেশে সাহিত্য, দর্শন ও ধর্ম্মগ্রন্থ যে পরিমাণে উন্নতি-মার্গে আরোহণ করিযাছিল, বিজ্ঞান তাহার শত অংশের এক অংশ করিযাছিল কিনা সন্দেহ। বলিতে কি, এদেশ হইতে সকল বিজ্ঞানেরই অঙ্কুর প্রথমে আরব দেশে নীত হয়, তথায় কিয়ৎ পরিমাণে বর্দ্ধিত হওত পরিশেষে ইয়ুরোপ খণ্ডে প্রক্ষিপ্ত হইয়া যথাযথ বৃদ্ধি ও স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া ফলফুলে সুশোভিত হইয়াছে। এখন বিধাতার বিচিত্র নিয়মে, আজ ঊন-বিংশতি শতাব্দীতে, ভারতবর্ষে সেই সকল বিজ্ঞানের সুমধুর ফল সকল আসিয়াছে। কিন্তু এই সকল ফল জনসাধারণের উপা-ভোগ্য করিতে হইলে ম্লেচ্ছ জাতির পরি-বেশনে চলিবে না, মাতৃভাষারূপ ব্রাহ্মণের পরিবেশন নিতান্ত আবশ্যক। আমাদের মাতৃভাষা দ্বতই এইরূপ পাশ্চাত্য বিজ্ঞা-

নের দ্বারায় পুষ্টিলাভ করিবে, ততই আমাদের মঙ্গল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হন, তাঁহাকে অনেক পরিমাণে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়; তাঁহার অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় কদাচ সার্থক হয় না। কেন না, ইংরাজী ভাষাভক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ কেহ যদিও এখন বাঙ্গালা পুস্তক ও সংবাদ পত্র কিছু কিছু পড়িয়া থাকেন, তথাপি বঙ্গভাষায় লিখিত বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পুস্তকসকলকে অনুবাদ বলিয়া ত্যাগ করেন, আর আপামরসাধারণ বিজ্ঞানকে কর্কশ বলিয়া পরিত্যাগ করত উপন্যাসের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এরূপ নিরুৎসাহের মধ্যেও যাঁহারা মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে পশ্চাৎপদ হয়েন না, তাঁহারা নিশ্চয়ই মৃত ভারত-মাতার আশীর্ব্বাদের পাত্র। এবং ইহাও আশা করা যাইতে পারে যে, ভবিষ্যৎবংশীয়েরা তাঁহাদের পরিশ্রমের সার্থকতা সম্পাদন করিবেন ও তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবেন।

ধর্ম্মদাস বাবু যে গুরুতর ভার নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা যে এত দিনে সুসম্পন্ন করিতে পারিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমরা যারপর নাই সুখী হইয়াছি। তাঁহার পুস্তকের প্রায় সকল স্থানেই কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যয়ন এবং গভীর গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সমগ্র পুস্তকখানি ছয়টী পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। প্রথম ভাগের প্রথম ও দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উপক্রমণিকা ও বাহ্যবস্তু, অর্থাৎ জলবায়ু, ভূমি বাস্তু, বাস গৃহ, খাদ্য ও পরিচ্ছদ প্রভৃতি বিশেষ করিয়া বর্ণিত আছে। প্রথমভাগ পূর্ব্বে নব্যভারতে সমালোচনা করা হইয়াছে; তাহার বিষয় আর পুনরায় বলিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদে স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত গর্ভবতী স্ত্রীর কর্ত্তব্য; সূতিকা-গৃহ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যরক্ষার আদেশ, শিশু-পালন, শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে স্বাস্থ্যরক্ষার আদেশ; অতি শীঘ্র শিক্ষার দোষ; অধ্যাপনার নিমিত্ত স্বাস্থ্যোপযোগী গৃহের আবশ্যকতা; ব্যায়াম ও নীতি শিক্ষার আবশ্যকতা; বিবাহের উদ্দেশ্য, ঐ বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুদিগের আচরণ; পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের উপদেশ ও আধুনিক প্রথার প্রভেদ, বাল্য-বিবাহ দ্বারা ব্যক্তিগত ও সাধারণ স্বাস্থ্যের কিরূপ অনিষ্ট ঘটে; কৌলিন্য প্রথার উদ্দেশ্য ও এক্ষণে তাহার কুফল, ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি দ্বারা স্বাস্থ্যের কিরূপ উন্নতি বা অবনতি হইতে পারে; তীর্থ যাত্রার উদ্দেশ্য, আপত্তি ও তদুৎপন্ন অনিষ্ট নিবারণের উপায়; দেশ ভ্রমণের ফলাফল, ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন প্রথা প্রচলিত থাকার ফলাফল ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত দৈনিক কর্ত্তব্য, যথা আহার, নিদ্রা, স্নান, পরিশ্রম, বিশ্রাম, সুরাপান, ধূমপান ও মাদকসেবন ও গণিকাসক্তি ইত্যাদির অনিষ্টকারিতা বর্ণিত আছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পীড়াসমূহের সাধারণ ধর্ম্ম, সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগের প্রভেদ, ও তৎসমুদায় নিবারণের উপায় বিবৃত হইয়াছে। চতুর্থ বা শেষ অধ্যায়ে সাধারণ স্বাস্থ্যতত্ত্বের উদ্দেশ্য; জীবনি-সংখ্যা কি, ও তাহার আবশ্যকতা, লোক গণনা ও লোক সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির কারণ; অকাল মৃত্যুর

পরিমাণ ও কারণ; তাহা কতদূর নিবার্য্য, দেশব্যাপী বলহীনতা ও নিশ্চেষ্টতা ইত্যাদির কারণ ও তন্নিবারণের উপায় এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক কর্ত্তব্য; স্বাস্থ্যবিষয়ক বিধি সমুদয় স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত বিদেশ যাত্রার আবশ্যকতা ও ভিন্ন ভিন্ন জল বায়ুতে কি উপকার হওয়া সম্ভব ও কোন্ স্থানে গমন যুক্তিসিদ্ধ, তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

যদিও দ্বিতীয় ভাগের প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয় গুলি সচরাচর ইংরাজি স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধীয় পুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায় না, তথাপি এই সকল বিষয় স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যে অবশ্য-জ্ঞাতব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ধর্ম্মদাস বাবু এই সকল ও অন্যান্য পরিচ্ছেদের বিষয় সকল এরূপ বিশদরূপে সহজ ভাষায়, দেশীও বিদেশীয় মত সংগ্রহ করিয়া দক্ষতার সহিত নিরপেক্ষ ভাবে বিবৃত করিয়াছেন যে, তাহার উপর আর কিছু বলা আমরা আবশ্যক মনে করি না। আপাততঃ পুস্তকখানি পড়িতে বেশ সহজ বোধ হয়, কিন্তু চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট ইহা চিন্তার খনি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় অধিক ভাব প্রকাশ করা একটী সামান্য ক্ষমতা নহে। ধর্ম্মদাস বাবুর যে সে ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে আছে, তাহা তিনি পুস্তকের প্রায় সকল স্থানেই পরিচয় দিয়াছেন।

এই পুস্তক খানি যে স্ত্রীপুরুষ সকলের পাঠ করা একান্ত আবশ্যক,তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহাও বলা উচিত যে, কেবল পড়িলে কিছু ফল হইবে না, কার্য্যে পরিণত করা চাই। আজ কাল আমাদের দেশে স্ত্রী লোকদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত হইয়াছে দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির আনন্দ না হয়? অনেক বিজ্ঞ পণ্ডিতদিগকে বলিতে শুনা যায় যে, আমাদের পুরুষদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট শিক্ষা অসম্পূর্ণ। বর্ত্তমান ইংরাজি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে স্পেন্সারেরও ঐ মত। পুরুষ সম্বন্ধে যদি বর্ত্তমান শিক্ষা অসম্পূর্ণ হইল,স্ত্রীলোক সম্বন্ধে যে উহা কত অসম্পূর্ণ, তাহা বলা যায় না।

স্বাস্থ্যরক্ষা ও শরীরপালন সম্বন্ধে যে সকলেরই কিছু কিছু জানা উচিত, সে বিষয়ে বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়,এ সম্বন্ধে ইংরাজি বিদ্যালয় সমূহের মধ্যে কলিকাতার দুই একটী বিদ্যালয় ভিন্ন কোনটীতেই কিছু শিক্ষা দেওয়া হয় না।

নেপোলিয়ান, শিক্ষিত মাতার দ্বারাই দেশের শ্রীবৃদ্ধি হইবে, পুনঃ পুনঃ এই কথা বলিয়াছিলেন। পুরুষের যে শিক্ষার প্রযোজন, তাহা যে সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীর উপযোগী নহে, তাহা সদ্বিবেচক মাত্রেই স্বীকার করিবেন। সন্তান প্রতিপালন ও তাহাদের শৈশব ও বাল্যকালের শিক্ষার বিষয় সকল স্ত্রীলোকেরই জানা একান্ত কর্ত্তব্য। স্ত্রী গৃহের কর্ত্রী। গৃহই তাঁহাদের রাজ্য। সেই রাজ্যের সকলে যাহাতে সুস্থ থাকে এবং তাহার সুখ সচ্ছন্দতা যাহাতে বৃদ্ধি হয় এবং সর্ব্বতোভাবে যাহাতে তাহার সুশৃঙ্খলা রক্ষা হয়, তাহা প্রধানতঃ গৃহিণীর কর্ত্তব্য। সেই জন্য,এই পুস্তক খানি সকল স্ত্রীলোককে পড়িতে বিশেষরূপে অনুরোধ করি। আমাদের বিশ্বাস, যদি বেথুন ও ভিক্টোরিয়া কলেজের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এই পুস্তকখানি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রীদিগের পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত করেন, তাহা হইলে স্ত্রী-শিক্ষার অত্যাবশ্যকীয় বিষয় মধ্যে ইহা কিঁয়ৎপরিমাণে সহায়তা করিবে।

অবশেষে আমরা আশা করি, ধর্ম্মদাস বাবু দীর্ঘজীবী হইয়া উত্তর উত্তর বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এইরূপ পুস্তক লিখিয়া বঙ্গভাষার পুষ্টিসাধন করিবেন। তাঁহার নিকট মাতৃভাষা বিশেষ রূপ ঋণী। আর বঙ্গ-সমাজ চির ঋণী। কেননা, বঙ্গদেশে মাতৃভাষায় এরূপ উৎকৃষ্ট পুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রচারিত হয় নাই।

২। High Education in Bengal and the University of Calcutta. By a native Philomath; Price five Annas.

আমরা এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা, কি রূপ শিক্ষা প্রণালী প্রবর্ত্তিত করা উচিত, আমাদের দেশের বর্ত্তমান শিক্ষার কি কি দোষ, প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দর রূপে ইহাতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্রন্থকার আপন মত সমর্থনের জন্য অনেক বড় বড় পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। পুস্তক খানি গভীর চিন্তা এবং গবেষণা পূর্ণ। শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে পুস্তক খানি এক একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

৩। **প্রেম ও ফুল**।—শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাস প্রণীত, মূল্য ৸৹। নব্যভারতের পাঠকগণের নিকট গোবিন্দ বাবু বিশেষ পরিচিত! অধিক পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। 'প্রেম ও ফুলে' যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে, ইহার অনেকগুলি কবিতা নব্যভারতে বাহির হইয়াছে। সে সকল কবিতা সম্বন্ধে অধিক আর কি মতামত প্রকাশ করিব। গোবিন্দ বাবুর স্বভাব-বর্ণনাশক্তি, পদ-লালিত্য আমাদের দেশের কোন কবি অপেক্ষা হীন নহে। এমন মধুর, এমন সরস কবিতা যিনি লিখিয়াছেন, তিনি কি আমাদের দেশে অমর হইবেন না? এলিজি নামক একটী কবিতা লিখিয়া গ্রে সাহেব কাব্য-জগতে অমর। আমরা বলি, "শ্মশান-সঙ্গীত," "বরষার বিল," "প্রমদা", "সারদা সুন্দরী", "নষ্ট চন্দ্র" এই সকল কবিতার যে কোন একটী লিখিলেই গোবিন্দ চন্দ্র অমর হইতেন। ইঁহার কবিতা পাঠে হৃদয়ের অন্তস্থল পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠে, যতবার পড়ি, ততবার শরীর রোমাঞ্চিত হয়, চক্ষু হইতে জল পড়ে। গোবিন্দ চন্দ্র কন্যা-হারা, স্ত্রী-হারা, ভাই-হারা হইয়া যে কয়েকটী কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায়, প্রেমের কি অক্ষয় স্মৃতিচিহ্ন ইঁহার হৃদয়-ভাণ্ডার হইতে বাহির হইয়া জগতের মুখকে উজ্জ্বল করিয়াছে! আর ফুলের সৌরভ—ইঁহার প্রতি কবিতায় স্ফুরিত। গোবিন্দ চন্দ্রের কবিতা, যে কোন কবির কবিতার সহিত তুলনা করি না কেন, কাহারও অপেক্ষা হীন নহে। 'প্রেম ও ফুল' সরল কবির গভীর হৃদয়োচ্ছ্বাস,—প্রেমের অস্ফুট স্মৃতি-ছায়া। যিনি পড়িবেন, তিনিই মোহিত হইয়া যাইবেন। গোবিন্দচন্দ্র সম্বন্ধে আর অধিক লেখা ভাল দেখায় না। ইঁহার নাম এখন আর গোপন নাই। আমরা পাঠকগণকে এক এক খানি প্রেম ও ফুল কিনিতে অনুরোধ করিয়া আজ ক্ষান্ত হইলাম।

'প্রেম ও ফুলের' একটী বিস্তৃত সমালোচনা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, আগামী বারে তাহা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

৪। **বিবেক**।—পাক্ষিক পত্র, বার্ষিক

মূল্য ২৲, ৪৮ নং গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর লেন, কলিকাতা। এই পাক্ষিক পত্রিকা খানির ৪ সংখ্যা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। অসাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম নামক প্রবন্ধটী খুব উদার ভাবে লেখা হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজকে সংস্কার করাই বোধ হয় পত্রিকা খানির উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একখানি পত্রিকার নিতান্ত প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদের মনে হয়। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কোন আক্রমণ না থাকিলেই ভাল হয়। আমরা পত্রিকায় পাঠ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম, বিবেক-সম্পাদককে ইতিমধ্যে প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা কোন মতামত প্রকাশ করিতে চাহি না। তবে এই পর্য্যন্ত বলি, যিনি কোন সমাজকে সংস্কার করিবার ভার গ্রহণ করেন, তাঁহাকে অপক্ষপাতী, ন্যায়পরায়ণ, অধ্যবসায়ী, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ এবং কষ্ট-সহিষ্ণু হওয়া প্রয়োজন। লোকের আক্রমণ, ঘৃণা-বিদ্বেষ, রোষ-কষায়িত কটাক্ষ, এ সকলকে তুচ্ছ করিতে না পারিলে কেহই এ গুরুতর কার্য্যে সফল-কাম হইতে পারেন না। "সমস্ত পৃথিবীও যদি চূর্ণ হইয়া যায়, তবুও ন্যায়কে রাজত্ব করিতে দেও," এই মহামন্ত্র গ্রহণ করিয়া বীরের ন্যায় অগ্রসর হইতে হয়। বিবেকের সম্পাদকের সেরূপ সহিষ্ণুতা নাই বলিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। প্রহারে প্রহার, ঘৃণায় ঘৃণা, নিন্দা-প্রচারে নিন্দাপ্রচার করা অতি দূষিত নীতি। বিবেকের সম্পাদক অন্যের গায়ে হাত না তুলিয়া অম্লান চিত্তে যদি প্রহার সহ্য করিতে পারিতেন, তবে তাঁহার মহত্ত্বের গৌরব আজি চতুর্দ্দিক বিঘোষিত হইত। তাহা হয় নাই বলিয়া বুঝিয়াছি, তিনি কিছু অসহিষ্ণু, কিছু চঞ্চল। তাঁহার দ্বারা এই পবিত্র এবং মহৎ কার্য্য সম্পাদিত হইবে বলিয়া আশা করিতে পারিতেছি না। অথচ একথা স্বীকার করি যে, ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় এরূপ একখানি পত্রিকার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বিবেকের সম্পাদক ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া প্রার্থনা-পূর্ণ হৃদয়ে কর্ত্তব্যপালনে সমর্থ হউন, বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি।

৫। ধর্ম্মবিজ্ঞানবীজ—তৃতীয়খণ্ড। বিধান যন্ত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত; মূল্য ৷৷০। এই পুস্তকের গ্রন্থকার কঠিন পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী রহিয়াছেন। এই দারুণ রোগে আক্রান্ত হওয়াতেই কিন্তু তাঁহার ভিতরের তেজের হ্রাস হয় নাই। তিনি শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করেন, এবং তাঁহার গভীর গবেষণা ও প্রার্থনার ফল জনসাধারণকে উপহার দেন। যে অবস্থায় লোক চক্ষের জল ফেলিয়া সময় কাটায়, সেই অবস্থায় গ্রন্থকার এই অপূর্ব্ব গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ, এবং মুদ্রিত করিয়াছেন। গ্রন্থকারকে শত শতবার প্রণাম করি।

গ্রন্থ খানি কিরূপ হইতেছে, কিছু বলা প্রয়োজন। পুস্তক খানি এখনও অসম্পূর্ণ। এই খণ্ডে, মনুষ্যত্ব, ঈশ্বর দর্শন, বিশ্বাস প্রভৃতি বিষয় অতি সুন্দর রূপে দক্ষতার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তারপর প্রহ্লাদ, নানক, শাক্যমুনি, কবীর, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাজনদিগের জীবন আলোচনা করিয়া দেখান হইয়াছে যে, তাঁহারা অপৌত্তলিক ছিলেন। এই কার্য্য সম্পাদন করিতে গ্রন্থকারকে যথেষ্ট অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে। তারপর ঈশ্বরের ত্রিবিধ ভাব, অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ রূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। তারপর বিশেষবিধান, নববিধান, এবং নববিধান-বিরোধীদিগের আপত্তি খণ্ডন করা হইয়াছে। তারপর শাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছে। পুস্তক খানি গভীর গবেষণা, গভীর চিন্তা এবং গভীর সাধন ভজনের ফল। এরূপ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায় অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। মতে মিলুক বা না মিলুক, প্রত্যেক ধর্ম্ম-পিপাসু ব্যক্তির এ পুস্তকখানি একবার পাঠ করিয়া দেখা উচিত।

ইংরাজ-শাসনে বঙ্গ-সাহিত্য।

(৪র্থ প্রস্তাব।)

শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় এপর্য্যন্ত "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" "পুষ্পমালা" ও "হিমাদ্রিকুসুম"—এই তিনখানি কাব্য ও "মেজ-বউ" নামক এক খানি উপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। "নির্ব্বাসিতের বিলাপ" সরল, মধুর, সকরুণ কবিতামালার সমষ্টি। অল্প দিন হইল, "হিমাদ্রি-কুসুম" প্রকাশিত হইয়াছে। কবির হিমালয় প্রদেশে অবস্থান সময়ে অবসরক্রমে যে সকল কবিতা রচিত হইযাছিল, সেইগুলি এই কাব্য মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই কাব্য ও তৎপ্রণীত "পুষ্পমালা" কাব্যে শিবনাথ বাবুর নিসর্গের সৌন্দর্য্য, ধর্ম্মের গাম্ভীর্য্য, হৃদয়ের সৌকুমার্য্য, চরিত্রের ঔদার্য্য, কবিত্বের ঐশ্বর্য্য, কল্পনাব মাধুর্য্য এবং দেশ-ভক্তির প্রাচুর্য্য দেখিয়া আমরা বিস্মিত ও চমৎকৃত হইয়া গিয়াছি। তাঁহার "উৎসর্গ" শীর্ষক কবিতাব অপেক্ষা উচ্চতর ভাব ও মহত্তর উদ্দেশ্য-পূর্ণ কবিতা বঙ্গভাষায় আর একটীও পড়িয়াছি বলিয়া ত মনে হয় না;—

"চরিত্রের শোভা চাই দেখিবারে,
ভারত-সন্তান তবে বলি তারে;"

*　　*　　*　　*

"আমি বড় দুঃখী—তাতে ক্ষতি নাই,
অন্যে সুখী ক'রে, সুখী হতে চাই,
নিজে ত কাঁদিব, কিন্তু মুছাইব,
অপরের আঁখি—এই ভিক্ষা চাই!
সত্য—ধন, মান, চাহে না এ প্রাণ
যদি কাজে লাগে—তবে বেঁচে যাই।
এই আশীর্ব্বাদ করহে ঈশ্বর!
বহু কষ্টে পূর্ণ আমার অন্তর;
খাটিতে বাঁচিব, খাটিয়া মরিব
এই বড় আশা—পূর্ণ কর তাই।"

কি নিঃস্বার্থ অভিলাষ!—কি অদম্য প্রাণের ব্যাকুলতা! শাস্ত্রী মহাশয়ের কবিতা সমূহমধ্যে দুষ্ট প্রণয়ের আবিলতা, ইংরাজী কবির নিকৃষ্ট অনুকরণ-প্রবণতা, দেশ-হিতৈষিতার ভাণ এবং আলো-আঁধারে কবিতার—লেশমাত্রও নাই। তাঁহার কাব্যসমূহ যারপর নাই সুরুচি-সম্পন্ন ও সদ্ভাব-পূর্ণ। শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী এক জন প্রকৃত হৃদয়বান ধার্ম্মিক কবি। "মেজ-বউ" একখানি মনোহর স্ত্রী-পাঠ্য "নভেল"।

শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এ পর্য্যন্ত 'চিত্ত-মুকুর,' 'বাসন্তী' ও 'চিন্তা' নামে গীতি-কাব্য এবং "যোগেশ" নামে এক খানি কাব্যোপন্যাস প্রণয়ন করিয়াছেন। তিন খানি গীতি-কাব্যের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় ভাবের প্রগাঢ়তা, চিন্তার গভীরতা ও মর্ম্মের উচ্ছ্বাস অতি উজ্জ্বল ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। অনেকগুলি কবিতা প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার সম্পূর্ণ উপযোগী। 'যোগেশ' প্রকৃত ঘটনা-মূলক কাব্য। কবির কোন বন্ধুর জীবন ইহাতে চিত্রিত হইয়াছে। যোগেশের শোচনীয় পরিণামের কথা স্মরণ হইলে তাঁহার হৃদয়ের দুর্ব্বলতার জন্য আর তাঁহাকে ঘৃণা করিতে পারা যায় না। তাঁহার প্রতি আমাদের সহানুভূতি জন্মে—আমরা শোক-সন্তপ্ত হই। মন্দাকিনীর 'পতির হৃদয়ে চাপিয়া বদন' সেই "**চিন্তা যে নিবিল না নাথ!**" বলিয়া ক্রন্দন-ধ্বনি জীবন থাকিতে আমরা ভুলিতে

পারিব না। ইহার অক্ষরে অক্ষরে যে বিচিত্র কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, নিবিষ্ট-চিত্তে তাহা আলোচনা করিলে কবির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার উদয় হয়। ঈশানচন্দ্র হেমচন্দ্রের সহোদর। "দাদার ভাই" বটে।

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় এই বয়সে যে কত গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এবং ঈশ্বর তাঁহাকে দীর্ঘ-জীবী করিলে যে আরও গ্রন্থ লিখিবেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তাঁহার একাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত রচনাগুলি দুই ভাগ বৃহদাকার গ্রন্থাবলীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তিনি কাব্য,উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, চুটকি-গল্প, সঙ্গীতাদির রচনা করিয়াছেন। তাঁহার কাব্য সকলের মধ্যে 'অবসর-সরোজিনী' শ্রেষ্ঠ। বাস্তবিক এখানি বঙ্গভাষার একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গীতি-কাব্য। তাঁহার অতি দ্রুত-রচনা-শক্তি আছে। রচনাও বেশ সরল ও মধুর। তিনি 'বীণা' নাম্নী একখানি কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। এরূপ ধরণের সাময়িক পত্রিকা রাজকৃষ্ণ বাবুর নিজের সৃষ্টি—অপূর্ব্ব সৃষ্টি। যে দুইখানি সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুবাদ করিয়া শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় অমর হইয়াছেন, এক্ষণে তাহার কথা উল্লেখ করিব। কীর্ত্তিবাস ও কাশীরাম, কথকের নিকট হইতে রামায়ণ ও মহাভারতের উপাখ্যান ভাগমাত্র শ্রবণ করিয়া দুইখানি প্রকাণ্ড মহাকাব্য রচনা দ্বারা বঙ্গ-সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। আর রাজকৃষ্ণ বাবু সেই দুইখানি মহাকাব্য বঙ্গভাষায় অবিকল পদ্যানুবাদ করিয়া যে কীর্ত্তিদেবীর চিরানুগ্রহ-ভাজন হইয়াছেন, ইহা বলাই বাহুল্য। রামায়ণ সম্পূর্ণ হইয়াছে। মহাভারতের অনুবাদ চলিতেছে। ধন্য রাজকৃষ্ণ রায়!—ধন্য তাঁহার অধ্যবসায়!

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয় এ পর্য্যন্ত চারিভাগ "গীতি-কবিতা" প্রণয়ন করিয়াছেন। গোবিন্দ বাবু একজন অত্যুৎকৃষ্ট গীতি-কবি। তাঁহার কবিতায় স্বদেশানুরাগের স্বর্গীয় তান অতি স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়।

তাঁহার—

"নির্ম্মল সলিলে বহিছে সদা তট-শালিনী
সুন্দর যমুনে ও,"
"কত কাল পরে বল ভারত রে,
দুঃখ-সাগরে সাঁতারে পার হবে?"

প্রভৃতি গীতি-কাব্য সকল সর্ব্ব-জন-সমাদৃত, ও সর্ব্বত্র গীত। তাহাদের পরিচয় আর নূতন করিয়া দিতে হইবে না। নিম্নে আর একটী কবিতা হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।—

"নে রে বিদায় ভারতে আজি হোরি!
আর এ ভূমে তুই নস্ অধিকারী॥
নিয়ে যা দূরে ওই যমুনা, বংশী,
ভ্রমর, কোকিল, শুক, সারী।
শুনিব ফ্লুট সুখে, ভাসিয়া টেম্স্-বুকে,
লাগে না ভালো এ যত কাল কানাই।
নিয়ে যে খুলে এই ঘাঘরি, চুনরি,
উড়নি, কাঁচলী, লাল শাড়ী।
গাউন, বনেট প'রে, নাচিব চা-খড়ি মেখে,
ভেঙ্গে ফেলা কুৎসিৎ ও রং পিচকারী।
যা রে বাগান হতে মালতী, মাধবী,
কাঞ্চন, কিংশুক আজি ছাড়ি।—
আসিবে বিগ্নোনিয়া, হাসিবে সোণার মেরি,
ভাল না তোদের রং, সৌরভ ভারী।
হওরে নীরব আজি মন্দিরা, বীণা,
মুরজ যাওলি দেশ ছাড়ি।

নাচিব কেবল বুটে, শুনি ড্রাম, ক্লরিনেটে,
পরিব না আর পায়ে ঘুংঘুর বেড়ী।
আজি রে সে তোর ওই গুঞ্জর কুহুতে
মলয়ে মধুর রস নাই।
গায়িবে নাইটিংগেল, মধুর রবিন কাণে,
চুম্বিবে কোমল "গেল" বরফ-বিদারী!
যালো সরিয়া দূরে ললিতে, ও রাধে!
তোরা কেউ যে ভাল না নারী।
আসিবে "হেলেনা" "ইভা," মোহিবে সে "এনা"
"রোজী,"—তোদের মলিন মুখ দেখিতে নারি।
কেনরে অলি, ঘুরি ঘুরি এই ফুলে,
বসিছ লাজেরে পরিহরি।
ওকি! গুণ্ গুণ্ কাণে,ছাড়, সর, যাও দূরে,
আসিছে বিলাতি কত প্রজাপতি সারি।"
ইত্যাদি।

এই অংশটী যেরূপ সুমধুর, সেইরূপ শ্লেষ পূর্ণ।

"উদাসিনী" বঙ্গভাষার এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্যোপন্যাস। ইহা মধুর ভাণ্ডার। ভাষা যারপর নাই সরল ও মধুর। কবির বর্ণনা শক্তি অসাধারণ। কাব্যখানি আদ্যন্ত একই রূপ মনোহর ভাবে গ্রথিত। পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই। না থাকুক, আমরা তাঁহাকে জানি। "সাগর-সঙ্গমে" ইঁহার আর এক খানি সুন্দর কবিত্ব-পূর্ণ কাব্যোপন্যাস।

শ্রীযুক্ত দীনেশচরণ বসু পূর্ব্ববঙ্গের আর এক জন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার "কবি-কাহিনী" ও "মানস-বিকাশ' দুইখানি অতি প্রশংসনীয় গীতি-কাব্য। ইঁহাদের মধ্যে কয়েকটী কবিতা হেম বাবুর যোগ্য। "রুল ব্রিটেনিয়া" শীর্ষক কবিতার বজ্র-গম্ভীর ধ্বনি এখনও আমাদের কর্ণে গর্জ্জিতেছে। "প্রেমের-বন্দনা" কবিতাটী যেমন সুমধুর ও সুললিত,সেইরূপ কবিত্বপূর্ণ। দীনেশ বাবু "কুল-কলঙ্কিনী" নামে একখানি উপন্যাসও লিখিয়াছেন। ইহার বর্ণনা হৃদয়-গ্রাহিণী হইলেও, চরিত্রাঙ্কন সুন্দর হয় নাই।

শ্রীযুক্ত বলদেব পালিত "কর্ণার্জ্জুন," "ভর্তৃহরি," "কাব্যমালা" প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা। এই সমস্ত পুস্তকের অনেক স্থল উচ্চ দরের কবিত্বে পূর্ণ। দুঃখিনী বঙ্গ-ভাষাকে যাঁহারা বিবিধ সংস্কৃত ছন্দের পরিচ্ছেদে শোভিত করিয়াছেন, বাবু বলদেব পালিত তাঁহাদের অগ্রগণ্য।

বাবু অধরলাল সেন "ললিতাসুন্দরী," "নলিনী," "মেনকা" প্রভৃতি অতি সুন্দর কয়েকখানি কাব্যের প্রণেতা। তিনি Byron, Southey, প্রভৃতি ইংরাজ কবির অনুকরণে এই সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। কবি অকালে পরলোকগত না হইলে তাঁহার দ্বারা ভাষার মুখ আরও উজ্জ্বল হইত, সন্দেহ নাই।

"কুসুমমালা" বঙ্গভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গীতি-কাব্য। শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ ঘোষ ইহা প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি বঙ্গ-দর্শনে সময়ে সময়ে যে সকল কবিতা লিখিতেন, তাহাই সংগৃহীত হইয়া "কুসুমমালা" নামে স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে।

বাবু রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "দানব-দলন" কাব্য রচনা করিয়াছেন। চণ্ডীর সহিত দানব-রাজ শুম্ভ ও তাঁহার ভ্রাতা নিশুম্ভের যুদ্ধ বর্ণনা ইঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়। কোন কোন স্থলে কবি অসাধারণ কবিত্ব শক্তি-প্রদর্শন করিয়াছেন।

বাবু নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় "ভুবন-

মোহিনী "প্রতিভা" প্রভৃতি কাব্য প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা বেশ সরল, মধুর ও কবিত্ব পূর্ণ। এক সময় এই কাব্য লইয়া দেশমধ্যে খুব আন্দোলন চলিয়াছিল।

মেদিনীপুর কলেজের পণ্ডিত মৃত ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় "সাবিত্রী-চরিত" কাব্য ও "বঙ্গের সেই এক দিন আর এই এক দিন" নামক প্রবন্ধ প্রণেতা। "সাবিত্রী চরিতের" ভাষা অতি সুন্দর; বর্ণনাও বিলক্ষণ হৃদয়গ্রাহিণী; অনেক স্থলেই চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রচুর কবিত্ব ও গুণপণা দেখাইয়াছেন। ইহা একখানি মনোহর স্ত্রী-পাঠ্য কাব্য। যথাস্থানে ইঁহার নাম উল্লিখিত হয় নাই বলিয়া আমরা দুঃখিত হইলাম।

শ্রীযুক্ত গোলাপচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "ভার্গব-বিজয়" নামক এক প্রকাণ্ড কাব্যের রচনা করিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক ভৃগুতনয় পরশুরামের দর্প-চূর্ণ ইহার বর্ণনীয় বিষয়। ইহার স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। স্বভাব-বর্ণনার অনেক স্থল সংস্কৃত কবির অনুকরণ হইলেও মনোহর হইয়াছে। দুঃখের বিষয়, এই কাব্যের ভাষা যারপর নাই দুর্ব্বোধ্য সুতরাং নীরস। এই জন্য ইহার কবিত্ব অনেক সময় পাঠক ও শ্রোতার চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে না।

শ্রীযুক্ত যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় স্বতন্ত্র কোন কাব্য না লিখিলেও তিনভাগ "পদ্য-পাঠের" মধ্যে যে সকল কবিতার রচনা করিয়াছেন, সে গুলিতে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব, মনোহর ভাব এবং সুললিত ভাষার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। যদুগোপাল বাবু একজন অতি প্রশংসনীয় কবি।

যথাস্থলে পণ্ডিত মধুসূদন বাচস্পতি মহাশয় প্রণীত "বসন্তসেনার" উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। এই পুস্তকের উপাখ্যান ভাগ সংস্কৃত নাটক হইতে গৃহীত। গদ্য পদ্যময়। ইহার অন্তর্গত কবিতা সমূহে বাচস্পতি মহাশয় বিলক্ষণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। একটু নমুনা দেখুন।

"তমোরাশি বিনাশিয়া,প্রাচীদিক্ প্রকাশিয়া,
উদয়-ভূধরে শশী দেখ ওই আসিছে।
উষা করি অনুভব, ডাকিছে বিহগ সব,
পাপ-নিশা গেল বলি মুদভরে ভাসিছে॥
বিলম্ব নাহিক আর, দেখ দেখ চন্দ্রমার,
রেখা দেখা যায় ওই, ক্রমে তমঃ টুটিছে।
যেন যমুনার জলে, রাজহংস কুতূহলে,
ডুবেছিল পুনরায় ক্রমে ক্রমে উঠিছে॥

* * * *

দেখ ওই সুধাকর প্রকাশিছে সুধা-কর,
দিগঙ্গনা দীপ জ্বালি যেন গৃহে রাখিছে।
প্রদীপের পিছে তমঃ, এ দীপের অন্যক্রম,
সম্মুখে তিমির রাশি প্রতীচিরে ঢাকিছে॥
অর্দ্ধভাগে জ্যোতি নাই,শোভাহীন শশী তাই,
উজ্জ্বল অপর ভাগ—দুই রূপ হয়েছে।
বুঝি বিয়োগীর শাপে,অর্দ্ধাঙ্গ ঘেরেছে পাপে,
সংযোগীর বরে অর্দ্ধভাগে কান্তি রয়েছে॥"

এ সকল "হটাৎ কবির" রচনা নহে,—আজিকার দিনের "স্বভাব কবিগণেরও" হৃদয়োচ্ছ্বাস নহে। একজন প্রকৃত শিক্ষিত রসজ্ঞ কবির বর্ণনা—যেমন সুললিত, তেমনি কবিত্বপূর্ণ।

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী "উদ্গীথার" রচনা করিয়াছেন। ভাষা সুমধুর, বিষয় উচ্চ; লক্ষ্য মহৎ এবং বর্ণনা অতিশয় হৃদয়গ্রাহিণী। ইহার অনেক স্থল পড়িতে পড়িতে মানস-বিহঙ্গ মাটীর পৃথিবী ছাড়িয়া পুণ্য-পবিত্রতাময় স্বর্গ-ধামে বিচরণ করিতে

থাকে; নীচতা, জড়তা চলিয়া যায়। প্রিয়নাথ বাবু এই মনোহর কাব্যে যথেষ্ট কবিত্ব শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি একজন ধর্ম্মের কবি। বাঙ্গালায় এই শ্রেণীর কবির সংখ্যা অত্যন্ত অল্প।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাস "প্রেম ও ফুল" নামক একখানি গীতি-কাব্য অল্পদিন হইল প্রকাশ করিয়াছেন। হেমবাবু যেমন "বঙ্গদর্শনের কবি," গোবিন্দ বাবুও তেমনই 'নব্যভারতের' কবি। আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া 'নব্যভারতে' যে সকল অতি সুন্দর, অতি মনোহর,—জ্বালাময়, সঙ্গীতময়,—কবিত্ব-পরিচায়ক, মানসিক-ক্ষমতা-সূচক,—সরল, অনর্গল কবিতার উৎস উৎসারিত হইয়া আসিতেছে, তাহাদের কতকগুলি বর্ত্তমান কাব্যে স্থান পাইয়াছে। কবি তরুণ বয়স্ক। তিনি এই বয়সেই "সংসারের সার, দেহের জীবন, জীবনের সর্ব্বস্ব" গৃহ-লক্ষ্মী হারাইয়া, 'সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই, পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটী নাই' হারাইয়া, 'শতশশি-রশ্মিগাথা, চারু ইন্দীবর আঁকা' তনয়াকে জন্মের মত বিসর্জ্জন দিয়া উদাসীন বেশে দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার কথা ভাবিলে চক্ষে জল আসে, প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। কিন্তু ইহাতে সাধারণের উপকার আছে,—সাহিত্যের লাভ আছে। বুঝি, ইহাই এসংসারের নিয়ম। তাঁহার বর্ণিত প্রেমে নরকের দুর্গন্ধ নাই; তাহাতে স্বর্গের সৌরভ আছে। তাঁহার এই কবিতা-লিখন বাহাদুরি লইবার জন্য নয়; এগুলি তাঁহার প্রাণের অনিবার্য্য উচ্ছ্বাসমাত্র। যখনই অভ্যন্তরস্থ জ্বালা অসহ্য হয়, 'বিস্মৃ-বিরস' তখ ই তাহা উদ্গীরণ করিতে থাকে; আর এই শোক-সন্তপ্ত, সন্ন্যাস-ব্রতাচারী কবির অন্তর্নিহিত প্রতিভাগ্নি অনি-বার্য্য হইয়া উঠিলেই তাহা লেখনী-পথে বাহির হইয়া পড়ে। এই তাঁহার প্রথম উদ্যম; ইহার ফল যদি এমন সুমধুর হইল, না জানি, পরিণত বয়সেই বা কিরূপ হইবে। ভগবান এই সংসার-দাব-দগ্ধ কবির মস্তকে শান্তিধারা বর্ষণ করুন।

এক্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যে কবিতার স্রোত ভিন্ন পথে চলিয়াছে;—কবিতা লিখিবার প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। কবিতার বিষয়ও স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। যাঁহারা এই গতি ফিরাইবার জন্য প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন, তাঁহাদের কয়েকজনের বিষয় সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর এই দলের অগ্রগণ্য। তিনি বঙ্গদেশের একজন অত্যুৎকৃষ্ট গীতি-কবি এবং সুলেখক। রবীন্দ্র বাবু এই অল্প বয়সে যেরূপ মানসিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বঙ্গ-সাহিত্য-সমাজে অপূর্ব্ব বলিতে হইবে। তিনি ইংরাজী গীতি-কাব্যের অনুকরণে বঙ্গভাষায় কবিতা লিখিতে এতদূর কৃত-কার্য্য হইয়াছেন যে, অনেক স্থলে সে গুলি আদর্শ কাব্যের পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। তিনি যেরূপ ভাষায় কবিতার রচনা করেন, তাহার তান ইতিপূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর মহাশয়দ্বয় প্রণীত কাব্য সমূহ মধ্যে অতি স্পষ্টভাবে শুনিতে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার কবিতায় কেমন একরূপ স্বপ্নময়, মোহময়, কল্পনাময়, বিষাদ-গীতির একটী নীরব সুর বাজিতেছে, যাহা পাঠক ও শ্রোতার মনকে উদাস সৌন্দর্য্যে পূর্ণ করিয়া ফেলে। "ভানুসিংহ

ঠাকুরের পদাবলী" বঙ্গভাষার অতি উপাদেয় পদার্থ। বৈষ্ণব কবিগণের পর, বঙ্কিম বাবু ভিন্ন, আর কোন বাঙ্গালী কবি রবীন্দ্র বাবুর ন্যায় সুমধুর ও বিশুদ্ধ ব্রজভাষায় কবিতা লিখিতে সমর্থ হয়েন নাই। "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" নামক উপন্যাসে তিনি বর্ণনা শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন; কিন্তু চরিত্রাঙ্কনে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। "রাজর্ষি" উপন্যাস হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই যথেষ্ট উপদেশ লাভ করিতে পারেন। "য়ুরোপ যাত্রীর পত্র" বেশ মিষ্ট ও সরল ভাষায় লিখিত। পড়িতে বিলক্ষণ কৌতূহল জন্মে,—কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হয় না। "বিবিধ প্রসঙ্গ" "আলোচনা" প্রভৃতি পুস্তকে অনেক চিন্তাগর্ভ, আমোদ ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ আছে। রবীন্দ্র বাবু এ পর্য্যন্ত ১৫।২০ খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। সত্যের অনুরোধে এই স্থলে অবশ্যই উল্লেখ করিতে হইবে যে, বাবু রবীন্দ্র নাথ ঠাকুরের অনেকগুলি কবিতার ভাষা অতিশয় অস্পষ্ট বলিয়া, তাহাদের অর্থগ্রহ করিতে পাঠককে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হয়। অনেকগুলি কবিতায় শুদ্ধ মিষ্ট, কোমল কথার শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে; তাহাদের কোনই অর্থ হয় না। এক ঘেয়ে দোষে তাঁহার কবিতা অতিশয় দুষ্ট। এই সকল কারণে তাঁহার কাব্য সমূহের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, সকল দিক্ দেখিয়া, কবিত্ব শক্তি অনুসারে বিচার করিতে হইলে, হেমচন্দ্র, নবীন চন্দ্র ভিন্ন আর কোন জীবিত বাঙ্গালী কবি,রবীন্দ্র নাথের অপেক্ষা উচ্চতর সিংহাসন পাইবার অধিকারী নহেন।

শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার বড়াল এই শ্রেণীর দ্বিতীয় আসন লাভে সর্ব্বথা অধিকারী। তিনি এ পর্য্যন্ত "প্রদীপ" "কনকাঞ্জলী" এবং "ভুল" প্রণয়ন করিয়াছেন; কবির বয়স অল্প;—এই বয়সেই তাঁহার লেখনী অজস্র মুক্তা বর্ষণ করিতেছে। অক্ষয় বাবুর খণ্ড কবিতা সকল যেমন সুমধুর, তেমনই ভাব-প্রধান। পড়িতে পড়িতে প্রাণের বাঁধুনি শিথিল হয়, মন উদাস হয়। তিনি ছোট ছোট কথায়, দুই চারি পংক্তির মধ্যে এমন মনোহর কবিত্ব-কুসুম ফুটাইতে পারেন যে, শত মুখে তাহার প্রশংসা করিতে হয়। ঈশ্বর তাঁহাকে প্রতিভা দিয়াছেন। তিনিও এই ঐশিক দানের যথাযোগ্য ব্যবহার করিতেছেন। ভরসা আছে, ভবিষ্যতে তাহা দ্বারা দুঃখিনী মাতৃভাষার মুখ আরও উজ্জ্বল হইবে।

"অশ্রুকণা" এই শ্রেণীর এক খানি অতি প্রশংসনীয় কাব্য। শ্রীমতী গিরীন্দ্র মোহিনী দাসী ইহার রচয়িত্রী। যে দেশের রমণী—বিধবা রমণী—এমন উৎকৃষ্ট কাব্য লিখিতে পারেন, সে দেশের ভবিষ্যদাকাশ যে সুপ্রসন্ন ও সমুজ্জ্বল, তাহা আর বলিতে হইবে না। ইনি ইতিপূর্ব্বে 'ভারত-কুসুম' প্রভৃতি কাব্যের রচনা করিয়াছেন। শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ভিন্ন, বঙ্গদেশে গিরীন্দ্র মোহিনীর সমতুল্য স্ত্রী-কবি আর নাই। তাঁহার বৈধব্য দেশের সৌভাগ্যের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বভাব বর্ণনায় তাঁহার ক্ষমতা অপরিসীম।

যে সময়ে শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়দ্বয় সংস্কৃতবহুল সাধুভাষায় গ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত পাইতেছিলেন, সেই সময়, প্যারী

চাঁদ মিত্র "টেকচাঁদ ঠাকুর" এই কল্পিত নাম ধারণ পূর্ব্বক 'আলালের ঘরের দুলাল' প্রণয়ন করেন। ইহা বাঙ্গালা ভাষার প্রথম উপন্যাস। ইহার ভাষা অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগরের প্রবর্ত্তিত ভাষা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র;—আদ্যোপান্ত গ্রাম্য ভাষায় লিখিত। প্যারীচাঁদ বাবুই এই অপূর্ব্ব ভাষার সৃষ্টিকর্ত্তা। বাঙ্গালার 'আদুরে গোপালেরা' কেমন করিয়া খারাপ হইয়া যায়, তাহার একটী জলন্ত চিত্র ইহাতে প্রদর্শিত হইয়াছে। চরিত্রাঙ্কনে প্যারী চাঁদ বাবুর শক্তি অতি প্রশংসনীয়। 'আলালের ঘরের দুলাল' ভিন্ন, তিনি 'রামারঞ্জিকা,' 'অভেদী,' "যৎকিঞ্চিৎ' 'গীতাঙ্কুর' প্রভৃতি আর কয়েক খানি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। 'রামারঞ্জিকায়' স্ত্রীলোকের জ্ঞাতব্য, শিক্ষনীয় অনেক বিষয়, দম্পতির কথোপকথনচ্ছলে, লিখিত হইয়াছে। 'অভেদী' 'ও' 'যৎকিঞ্চিৎ' দুই খানিই ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। জগদীশ্বরের অস্তিত্ব, আত্মার অমরত্ব, উপাসনা প্রভৃতি ইহাদের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'গীতাঙ্কুরে' কতকগুলি মনোহর ব্রহ্ম-সঙ্গীত আছে।

'বিপদ কে বলে বিপদ!
বুঝিলে বিপদ নহে, প্রকৃত সম্পদ।'

প্রভৃতি সঙ্গীত সকল অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছে।

তাহার পর, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়। ইহার 'হুতুম পেঁচার নক্সা' সেই সময়ের কলিকাতা সহরের একখানি সুন্দর দর্পণ—অবিকল প্রতিরূপ। বর্ণনা যারপর নাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত হইয়াছে। ইহার বিদ্রূপ-বাণ অতি তীক্ষ্ণ! কিন্তু দুঃখের বিষয়, অনেক স্থল ব্যক্তিগত॰ নীচ কটাক্ষে পূর্ণ। এই গ্রন্থের ভাষা টেকচাঁদী ভাষার অনুকরণ মাত্র। ইনিই লক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া, প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সাহায্যে মহাভারত অনুবাদ করিয়া চির-স্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন এবং স্বদেশীয়-গণকে অনন্ত রত্নের অধিকারী করিয়া দিয়া-ছেন।

এক্ষণে বঙ্গদেশে যে ভাষা প্রচলিত রহিয়াছে, তাহা সাগরী ও আলালী ভাষা হইতে সমুৎপন্ন। এই মিশ্র ভাষার প্রয়োগ-কর্ত্তা—প্রথিত-নামা শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায় মহাশয়।

বান্ধব-সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন ঘোষ স্বীয় পত্রিকায় যে সমস্ত প্রবন্ধ লিখি-য়াছিলেন, সেইগুলি প্রভাত-চিন্তা, ভ্রান্তি-বিনোদ প্রভৃতি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় আবেগ এরূপ প্রচণ্ড, গতি এত দ্রুত যে, ভাল করিয়া সকল দ্রব্য দেখিবার অবসর পাওয়া যায় না। এই নিমিত্ত ইহাদের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য সকল সময় পাঠকের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে না। তিনি একজন চিন্তা-শীল লেখক বলিয়া সর্ব্বত্র প্রতিপন্ন। কিন্তু একথা অবশ্যই বলিতে হইবে যে, কালী-প্রসন্ন বাবুর প্রস্তাব সকল বিদেশীয় লেখক-গণের চিন্তায় পূর্ণ—এগুলিতে তাঁহার নিজের সম্পত্তি অল্পই আছে। তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় অতি অল্প; কিন্তু সেগুলি শুদ্ধ ভাষা-চাতুর্য্য ও শব্দাড়ম্বরের গভীর ঘন-ঘটায় প্রচ্ছন্ন। "ভ্রান্তিবিনোদের" অনেক গুলি রচনা সরস, সুরুচিসঙ্গত, ব্যঙ্গোক্তি-পূর্ণ। আজ কালি বাঙ্গালা সাহিত্য-বাজারে যাঁহারা জঘন্য রসিকতার মাল লইয়া, নির্ব্বোধ খরিদ্দারের

চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া বাহাদুরীর হাসি হাসিয়া থাকেন, তাঁহারা একবার এই পুস্তক খানি পড়িয়া দেখিবেন। 'নারী-জাতি বিষয়ক প্রস্তাব' নামক পুস্তক অতি উপাদেয় হইয়াছে। আমরা প্রত্যেক বামা-হিতৈষী মহাশয়কে এখানি একবার পড়িতে অনুরোধ করি। তিনি কতকগুলি উৎকৃষ্ট সংগীতেরও রচনা করিয়াছেন। কালীপ্রসন্ন বাবু পূর্ব্ববঙ্গের একজন প্রসিদ্ধ বক্তা।

আর্য্যদর্শন-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ বিদ্যাভূষণ এ পর্য্যন্ত জন ষ্টুয়ার্ট মিলের জীবন-বৃত্ত, ম্যাট্সিনীর জীবনবৃত্ত, ওয়েলেসের জীবন-বৃত্ত, আত্মোৎসর্গ, হৃদয়োচ্ছ্বাস, সমালোচন মালা, এবং তিনভাগ শিক্ষা-সোপান প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার জীবন-চরিত সমূহ পাঠ করিলে, ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকার কতিপয় মহাপুরুষের হৃদয়-রাজ্যে প্রবেশলাভ করিতে পারা যায়। পাঠকের অন্তঃকরণ উচ্চতর ভাব ও মহত্তর লক্ষ্যে পূর্ণ হয়। তাঁহার শিক্ষাসোপান ত্রয় বালক বালিকাগণের উৎকৃষ্ট প্রথম শিক্ষার পাঠ্য-পুস্তক। হৃদয়োচ্ছ্বাস ভারত বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধের সমষ্টি। বাস্তবিক এই সকল পুস্তকে যোগেন্দ্র বাবুর অকপট স্বদেশানুরাগ অনলাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। তাঁহার ভাষা কাহারও অনুকরণ নহে। ইহা তাঁহার নিজের সম্পত্তি। ভাষা যেরূপ আবেগময়ী, সেইরূপ উন্মাদিনী। উদ্দীপনা ইহার প্রাণ। এই ভাষাই বাঙ্গালার প্রথমশ্রেণীর বক্তার ভাষা। বক্তব্য বিষয় সুস্পষ্ট করিবার জন্য তাঁহাকে অনেক সময় নূতন কথা বাঙ্গালায় গড়িতে হইয়াছে। ইহাতে বাঙ্গালা ভাষার সামান্য পুষ্টিসাধন হয় নাই।

এইবার আমরা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইতেছি। সেই পরলোক-গত মহাপুরুষের কথা স্মরণ হইলেই প্রাণ আকুল হইয়া উঠে, হৃদয় শোক-ভারে অবসন্ন হইয়া পড়ে। আমি যেন মনশ্চক্ষে এই মুহূর্ত্তেই 'সেই নিরহঙ্কার জ্ঞানী, বিনয়ী ধনী, অহিংসাপরায়ণ যোগীর একত্র মিলন-ভূমি' রাজকৃষ্ণ-মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছি। সেই আড়ম্বর-শূন্য অগাধ পাণ্ডিত্য, অটল সত্যানুরাগ ও অকৃত্রিম দেশবাৎসল্যের পবিত্র লীলাস্থল রাজকৃষ্ণ সমক্ষে দণ্ডায়মান রহিয়াছি। 'সেই বালকের ন্যায় সরল' রমণীর ন্যায় কোমল, কুসুমের ন্যায় সুন্দর, ঋষির ন্যায় পবিত্র রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বেদ-বাণী সকল এইক্ষণ যেন শ্রবণ করিয়া চরিতার্থ হইতেছি। একজন সাধুচরিত, সুলেখক একবার লিখিয়াছিলেন, "আমি বঙ্গদেশের অনেক সাধুচিত্র দেখিয়াছি, কিন্তু রাজকৃষ্ণ মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে যেমন পবিত্র ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, তেমন আর কাহাকে দেখিয়াও হয় নাই। এক জন বৈষ্ণব বলিয়া ছিলেন,—'সাধু সে, যাহাকে দেখিলে ভগবানকে মনে হয়।' এই সংজ্ঞায় রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাধু,—কারণ তাঁহাকে দেখিলেই ভগবানকে মনে হইত।" আমি বিষয় হইতে দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। পাঠকগণ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। রাজকৃষ্ণ বাবু ১ম শিক্ষা ব্যাকরণ, ১ম শিক্ষা ভূগোল, ১ম শিক্ষা বীজগণিত, ১ম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস, "রাজবালা নামক উপন্যাস," "কাব্য-কলাপ," "যৌবনোদ্যান," "মিত্র বিলাপ," এবং

কবিতামালা"—এই চারি খানি কাব্য, কালিদাসকৃত মেঘদূতের পদ্যানুবাদ এবং "নানা প্রবন্ধ" নামক এক খানি গদ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়া সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রথম শিক্ষা পুস্তক চতুষ্টয়ের ন্যায় বালকগণের প্রথম শিক্ষার উপযোগী পুস্তক আজিও বঙ্গ-ভাষায় নিতান্ত বিরল। তিনি উপন্যাস লিখিয়া কিছু মাত্রও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। কালিদাস কৃত মেঘদূতের অবিকল পদ্যানুবাদ করিতে এ পর্য্যন্ত তাঁহার ন্যায় আর কেহই সমর্থ হন নাই। তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস অতি ক্ষুদ্রাবয়ব; একশত পৃষ্ঠা মাত্র। কিন্তু এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে, তিনি অসামান্য গুণপনা দেখাইয়াছেন। ইহার ন্যায় উৎকৃষ্ট ইতিহাস বঙ্গভাষায় আর একখানিও রচিত হইয়াছে কিনা, জানিনা। এই পুস্তক বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য লিখিত হইলেও অনেক বয়োবৃদ্ধ ইহা হইতে স্বদেশ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। কিন্তু ইহাতে পাঠকের ঐতিহাসিক ক্ষুধানল নির্ব্বাণ হয় না,—উত্তরোত্তর উদ্দীপ্তই হইতে থাকে। বিজ্ঞ "বঙ্গদর্শন" একদিন যথার্থই বলিয়াছিলেন, "রাজকৃষ্ণ বাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস খানি মুষ্টি ভিক্ষা,—কিন্তু ইহা স্নুবর্ণের মুষ্টি।" এই গ্রন্থ লিখিতে তাঁহার সাত দিন মাত্র সময় লাগিয়াছিল। তাঁর কাব্য সকলের বিষয় অতি উচ্চ, অতি গভীর, অতি পবিত্র। এ গুলিতে প্রেম লইয়া ছেলে খেলা নাই। তাঁহার কবিতার বিবিধ মূর্ত্তি। বঙ্গদেশে দ্বিজেন্দ্র বাবু ও রাজকৃষ্ণ বাবুই দার্শনিক কবি। 'নানা-প্রবন্ধ' নামক পুস্তক তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ। ইহা জ্ঞানের ভাণ্ডার, রত্নের আকর। ইহার ঐতিহাসিক তত্ত্বগুলি বঙ্গ-সাহিত্যে অমূল্য। ইহাতে রাজকৃষ্ণ বাবু গভীর গবেষণা ও অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। এরূপ গ্রন্থ ভাষার গৌরব স্বরূপ। তিনি সংস্কৃত, বাঙ্গালা, ইংরাজী, লাটিন, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মনি, উর্দ্দু, হিন্দী, পার্সী, উড়িয়া, পালী ও ব্রজ-ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভারতবর্ষের একখানি ইতিহাস লিখিবার জন্য তাঁহার প্রাণের অদম্য ব্যাকুলতা ছিল। ইহার উপকরণও সংগৃহীত হইতেছিল। কিন্তু হায়, তাঁহার এই অভিলাষ পূর্ণ হইল না। চল্লিশ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই বঙ্গদেশের এই অমূল্য রত্নকে নিষ্ঠুর কাল অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। হতভাগ্য বঙ্গের ভাঙ্গা কপাল আবার ভাঙ্গিল।

শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার এ পর্য্যন্ত কয়েক খানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি 'নব-জীবন' নামক পত্র ও 'সাধারণী' নাম্নী সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক। সাধারণী এক্ষণে নববিভাকরের সহিত মিলিত হইয়াছে। প্রথম সময়ের 'বঙ্গদর্শনে 'গ্রাবু' 'দশ মহাবিদ্যা' 'উদ্দীপনা' প্রভৃতি অনেক গুলি সরস, গম্ভীর, শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধ তাঁহারই রচিত। 'শিক্ষা-নবিসের পদ্য' একখানি উৎকৃষ্ট পদ্যানুবাদ। Byron এর সেই অতি সুন্দর, গম্ভীর ভাবপূর্ণ- কবিতার "Roll on, thou deep and dark blue ocean—roll," অনুবাদটী অতি মনোহর হইয়াছে। 'আলোচনা' নামক পুস্তকখানিও উপাদেয় হইয়াছে। ২৪ পৃষ্ঠায় লিখিত তাঁহার 'গোচারণের মাঠের' সংবাদ অতি অল্পলোকেই রাখেন। ইহাতে একটীও যুক্তাক্ষর নাই। এই ক্ষুদ্র কাব্যে অক্ষয় বাবু অতি

উচ্ছদয়ের কবিত্ব শক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উপর অক্ষয়চন্দ্রের যে অসাধারণ অধিকার আছে, ইহাই তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। ইহার সর্ব্বত্রই নীরব কবিতার কেমন একটী তান বাজিতেছে; যাহাতে প্রাণ প্রফুল্ল হয়, হৃদয় উন্মত্ত হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইল।—

(১)

"সুগভীর সরোবরে ঢাকিয়াছে জল
কমলের পাতা আর কলমীর দল।"

(২)

"নিকটে বিটপী বট—নিবিড়, অসাড়,
গট হয়ে ব'সে যেন গাছের পাহাড়।"

(৩)

"সরলা কৃষক-বালা খাটে সারা দিন,
না জানে বিলাস-ভোগ, লালসা সৌখিন্।
বিকালে বিরাম পায় গৃহ-কাজ হ'তে,
কাঁখেতে কলস ল'য়ে আসে সেই পথে।
পুরাণ দীঘির পাড়ে সেই ভাঙ্গা ঘাট,
সারি সারি বসে সবে নাহি জানে ঠাট।
দিনের দুঃখের কথা কহিতে লাগিল—
বালিকার মাঝে যারা পতিহীনা ছিল,
না কহে অধিক কথা, না নাড়ে নয়ন,
ডুবিছে তপনদেব দেখে এক মন,
ভাঙ্গা ঘাটে, রবিপাটে, দেখিল আঁধার,
ভাঙ্গা কপালের কথা মনে হ'ল তার।
উপরে দেবতা পানে দেখিল চাহিয়া,
'উহু-উহু চোখ্ গেল' ডাকিল পাপিয়া।
'চখে' কি পড়িল বলি কাঁপিল আঁচল,
নামিল কাঁপিল তাহে সরোবর-জল।"

বঙ্গ-সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। এমন সাদা কথায়, জীবন্ত চিত্র আঁকিতে আমি আর কোন বাঙ্গালী কবিকে দেখি নাই। অন্ততঃ এই কয় ছত্রের জন্য অক্ষয় বাবু বঙ্গ-সাহিত্যে অমর হইবেন। এক্ষণে তিনি 'নবজীবনে' যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সে গুলিতে তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও লিপি-চাতুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু কোন কোন প্রবন্ধে তাঁহার সহৃদয়তার একান্ত অভাব দেখিয়া মনে বিষম দুঃখ উপস্থিত হয়। অক্ষয় বাবুর ন্যায় কৃতবিদ্য লোক যে পত্রের সম্পাদক, তাহাতে "বড় গল্প নয়," "অপূর্ব্ব ভ্রমণ-বৃত্তান্ত," প্রভৃতির ন্যায় জঘন্য কুৎসাপূর্ণ-প্রস্তাব প্রকাশিত হয়, ইহা তাঁহার পক্ষে বড় লজ্জা ও কলঙ্কের কথা। প্রবন্ধ নির্ব্বাচনের জন্য সম্পাদক দায়ী, অক্ষয় বাবুর ইহা স্মরণ রাখা উচিত।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু এ পর্য্যন্ত "শকুন্তলা-তত্ত্ব," "ফুল ও ফল," "গার্হস্থ্য-পাঠ," প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। "গার্হস্থ্য-পাঠ" গৃহী মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। স্ত্রী, পুরুষ সকলেই এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই। গৃহ-কর্ম্মের অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় ইহাতে সরল ভাষায় ও সুন্দর ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। "ফুল ও ফল" নামক মনোহর গ্রন্থ যিনিই অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিবেন, তিনিই বুঝিতে পারিবেন, চন্দ্র নাথ বাবুর উপদেশগুলি কিরূপ জ্বলন্ত, সৌন্দর্য্য-বোধ কেমন প্রখর, সহানুভূতি কত তীব্র, ভাব কিরূপ প্রগাঢ়, চিন্তা কত দূর-গামিনী। এই পুস্তক গদ্যে লিখিত হইলেও কাব্য—বঙ্গভাষার এক খানি অতি উপাদেয় কাব্য। কবি এই দুঃখ-সঙ্কুল, শব্দময় সংসারে, শোক-সন্তপ্তকে সান্ত্বনা দিবার জন্য, আশাকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত ফুলের ভাষায়, কোকিলের কল-কণ্ঠে বসন্তকে সাদরে আহ্বান করিয়াছেন। সে আহ্বান-গীতি কত মধুর!—

কত প্রাণারাম! কত শক্তিময়! তাঁহার "শকুন্তলা-তত্ত্ব," বঙ্গ-সাহিত্যে এক অতি আদরের—অতি গৌরবের সামগ্রী। ইহাতে চন্দ্রনাথ বাবুর ভাবুকতা, সহৃদয়তা, গুণ-গ্রাহিতা, চিন্তাশীলতা এবং অন্তর্দৃষ্টির প্রখরতার একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। ইউরোপীয় সমালোচকগণ কোন কোন স্থলে তাঁহার আদর্শ হইলেও আমরা স্পর্দ্ধার সহিত নির্দ্দেশ করিতেছি যে, বাবু চন্দ্রনাথ বসু প্রথম শ্রেণীর সমালোচক-দিগের পার্শ্বে সিংহাসন পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী। যাহার অনুবাদমাত্র পাঠ করিয়া অদ্বিতীয় জর্ম্মান কবি গেটে—'Wouldst thou the young year's blossoms and the fruits of its decline' ইত্যাদি স্তুতি-গানে আত্ম-হারা হইয়া গিয়াছিলেন, সেই "অভিজ্ঞান শকুন্তলার' অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্যের এমন বিশদ ব্যাখ্যা আমরা আর কখন শুনি নাই। যে ভাষায় এরূপ সমালোচনা বাহির হয়, সে ভাষাও ধন্য, এবং যে জাতির মধ্যে এইরূপ সমা-লোচকের আবির্ভাব হয়, সে জাতিও সৌভাগ্যশালী। যিনি "শকুন্তলা-তত্ত্ব" এবং "ফুল ও ফলের" রচনা করিয়াছেন, তিনি "পশুপতি-সংবাদের' ন্যায় অসার, জঘন্য কুৎসা-পূর্ণ পুস্তক লিখিতে গেলেন কেন, বুঝিতে পারিলাম না। **ইহাই চন্দ্রের কলঙ্ক।**

শ্রীযুক্ত ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় এ পর্য্যন্ত "ঐতিহাসিক উপন্যাস" "পারি-বারিক প্রবন্ধ," "[illegible] নেক গুলি বিদ্যা[illegible] করি-য়াছেন [illegible] ইংরাজী শিক্ষি[illegible] ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস। এই পুস্তকের বিজ্ঞাপনে ভূদেব বাবু লিখিয়াছেন,—"শ্রীযুক্ত হজসন্ প্রাট্ সাহেব এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি লইয়া আদ্যোপান্ত সমুদায় পাঠ করতঃ বিশিষ্টরূপ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমি তাহাতেই সাহস প্রাপ্ত হইয়া এই পুস্তক মুদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত হই।" ভূদেব বাবু পরম বিজ্ঞ ও পণ্ডিত। কিন্তু তিনি এই পুস্তক প্রকাশের যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা অতীব হাস্য-জনক। তাঁহার মত লোকের এইরূপ 'সার্টিফিকেট' গ্রহণ কিছুতেই শোভা পায় না। 'পারি-বারিক-প্রবন্ধ' খানি প্রত্যেক গৃহস্থের এক একবার পাঠ করা কর্ত্তব্য। ইহাতে গৃহ-ধর্ম্মের যাবতীয় গুরুতর বিষয় সুচারু-রূপে লিখিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র স[illegible] লিখিয়াছেন, 'ভূদেব ফুটিলেন পুষ্পা-ঞ্জলিতে।' বাস্তবিক ভূদেব বাবুর অনন্ত স্ব[illegible]শানুরাগ, পবিত্র আর্য্যভাব, রূপক বর্ণনার প্রগাঢ়তা, ভাষার পারিপাট্য এবং চিন্তাশক্তির পরিচয় 'পুষ্পাঞ্জলির' প্রতি পৃষ্ঠায় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ খানি ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় অনু-বাদিত হওয়া আবশ্যক। যে উচ্চলক্ষ্য, সাধু সঙ্কল্প, গভীর আকাঙ্ক্ষা "পুষ্পাঞ্জলির" অক্ষরে অক্ষরে নিহিত রহিয়াছে, সেগুলি প্রকৃত দেশ-হিতৈষী ভারতের সু-সন্তান মাত্রেরই জপমালা হউক।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহা-শয় "রোমাবতী" "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব" এবং অনেকগুলি বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। "রোমা-বতী" কাদম্বরী প্রভৃতির ন্যায় একখানি আখ্যায়িকা। ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ভাষা

বিশুদ্ধ ও মনোহর। ইহা তাঁহার নিজের সম্পত্তি। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে ব্যাকরণের নিয়ম সকল অতি যত্নসহকারে রক্ষিত হইয়াছে। ব্যাকরণ-দুষ্ট পদ প্রয়োগ তাঁহার কোন গ্রন্থের কোথাও দৃষ্ট হয় না। 'নীতি-পথ' গ্রন্থ বালকদিগের জন্য লিখিত হইলেও, অনেক বয়োবৃদ্ধ ইহা হইতে জ্ঞান লাভ করিতে পারেন। ভাষা যেমন সরল, তেমনিই সুললিত। ইহাতে বর্ণিত গল্প গুলিও ততোধিক মনোহর ও শিক্ষাপ্রদ। 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব' ন্যায়রত্ন মহাশয়ের অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ এবং বঙ্গভাষার অমূল্য রত্ন। এই প্রকাণ্ড গ্রন্থে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম, অটল অধ্যবসায়, অগাধ পাণ্ডিত্য, গভীর শাস্ত্র-জ্ঞান ও বহু বিস্তৃত অধ্যয়নের ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ন্যায়রত্ন মহাশয় সুশিক্ষিত ও সুলেখক; কিন্তু এই পুস্তকে তিনি গ্রন্থকারদিগের সম্বন্ধে যে সকল মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাদের কোন কোন স্থলে তাঁহার একদেশদর্শিতার স্পষ্ট পরিচয় পাইয়া আমরা অতিশয় বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। বিশেষতঃ পাশ্চাত্য ভাষায় কৃতবিদ্য বঙ্গদেশের অগ্রগণ্য লেখকদিগের ছন্দ ও দুই চারিটী সংস্কৃত ব্যাকরণ-বিরুদ্ধ পদ-প্রয়োগ লইয়া তিনি যেরূপ তীব্রভাবে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় লেখকের পক্ষে শোভা পায় না। এইরূপ হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা সুরুচি-সঙ্গত নহে। তিনি মাতৃভাষার জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা কেবল তাঁহারই সাধ্য। ভরসা করি, আমাদের কথা শূন্যে বিলীন হইবে না।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় 'সারস্বত কুঞ্জ' ও 'উদ্ভ্রান্ত প্রেমের' রচনা করিয়াছেন। 'সারস্বত কুঞ্জ' কতকগুলি আমোদ ও শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধের সমষ্টি। 'রাম বসুর বিরহ' ও 'বাঙ্গালীর কল্পনা-প্রিয়তা' অতি সুন্দর হইয়াছে। শেষোক্ত প্রস্তাবটী বঙ্গদর্শনে বাহির হয়। তখন ইহা 'বাঙ্গালী কবি কেন?' এই শিরোনাম-যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ আমরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত নামকরণ সঙ্গত বলিয়াই মনে হয়। 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম' বঙ্গভাষার একখানি অত্যুৎকৃষ্ট গদ্য-কাব্য। এই অপূর্ব্ব গ্রন্থ পাঠ করিলে, চন্দ্রশেখর বাবু যে কিরূপ উচ্চ দরের ভাবুক, চিন্তাশীল, পণ্ডিত এবং কবি, তাহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। দুই এক স্থানে ঈশ্বর লইয়া তিনি যেরূপ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা যারপর নাই নিন্দনীয় ও লজ্জা-কর। ইহার ভাষা বঙ্কিম বাবুর ভাষার উৎকৃষ্ট অনুকরণ।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'ভারত-মহিলা' ও 'বাল্মীকির জয়' প্রণয়ন করিয়াছেন। 'ভারত-মহিলা' শাস্ত্রী মহাশয়ের দীর্ঘকাল-ব্যাপী পরিশ্রম ও গবেষণার ফল। সীতা হইতে আরম্ভ করিয়া রাণী ভবানী পর্য্যন্ত রমণী-রত্ন সকলের চরিত্র তিনি অপূর্ব্ব নৈপুণ্যের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। 'বাল্মীকির জয়' বঙ্গভাষার একটী উজ্জ্বল রত্ন এবং শাস্ত্রী মহাশয়ের চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। এই গ্রন্থের মূল মন্ত্র ভ্রাতৃভাব—মনুষ্য মধ্যে অনা [illegible] -বিস্তার। ইহা প্রথম [illegible] ন্দাম কল্প-নায পূর্ণ [illegible] তি উৎ-কৃষ্ট। [illegible] যে

একটী বর্ণনা আছে, বঙ্গ-সাহিত্যে তাহার তুলনা নাই। 'উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্য' হরপ্রসাদ বাবুর একটী বক্তৃতা। ইহাতে বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় অল্পের মধ্যে সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহার রচনা করিতে, তাঁহাকে যথেষ্ট অধ্যয়ন ও অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র বসু, "কাব্যসুন্দরী" ও "সমাজ চিন্তা" প্রণয়ন করিয়াছেন। 'সমাজ চিন্তা' পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, পূর্ণ বাবু একজন সমাজ-তত্ত্বজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তি। ইহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতা ও ভূয়োদর্শনের যথেষ্ট পরিচয় আছে। 'কাব্য-সুন্দরীতে' বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস বর্ণিত সুন্দরীগণের মধ্যে কয়েক জনের চরিত্র সমালোচিত হইয়াছে। পূর্ণবাবু একজন বিখ্যাত সমালোচক। বঙ্কিম বাবুর প্রণীত স্ত্রী-চরিত্র গুলির সৌন্দর্য্য তাঁহার দ্বারা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় পূর্ণ বাবুর ভাবুকতা, চিন্তাশীলতা ও লিপি-নৈপুণ্যেরও উজ্জল প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ চন্দ্র রায়চৌধুরী "মানব-প্রকৃতি," ও "বন-ফুলের" রচনা করিয়াছেন। "বন-ফুল" কতকগুলি অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধের সমষ্টি। গ্রন্থকার যে একজন ভাবুক, চিন্তাশীল, ও কৃতবিদ্য, তাহা এ পুস্তক পাঠে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ক্ষীরোদ বাবু ঐ গুলিকে "বন-ফুল" নাম দিয়াছেন। আমরা বলি, এ সকল যদি বনফুল হয়, তবে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে এই রূপ বনফুল ফুটুক্। তাঁহার "মানব-প্রকৃতি" বাঙ্গালা-সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। মানবপ্রকৃতি যে ক্রমোন্নতিশীল, তাহা ডারবিন প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় ইউরোপীয় জ্ঞানীগণের অভিমত। ক্ষীরোদ বাবু বিস্তৃত অধ্যয়ন ও যথেষ্ট পরিশ্রম দ্বারা নানা ইংরাজী গ্রন্থ হইতে এই মতের সার সঙ্কলন করিয়া মাতৃভাষার ভাণ্ডার আরও পূর্ণ করিয়া দিয়াছেন। এরূপ ধরণের পুস্তক বাঙ্গালায় আর একখানিও নাই। বঙ্গবাসীমাত্রেই এই মনোহর গ্রন্থের জন্য ক্ষীরোদ বাবুর নিকট ঋণী থাকিবেন, সন্দেহ নাই। তাঁহার হৃদয় যে কবিত্বময়, তাহার পরিচয়—"প্রেম-হার"। বাঙ্গালা ভাষার আদিকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত যে সকল উৎকৃষ্ট প্রেম-সঙ্গীত রচিত হইয়াছে, তাহাদের কতকগুলি চয়ন করিয়া ক্ষীরোদ বাবু এই মনোহর "প্রেম-হার" গাঁথিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে বিরচিত "মানব-তত্ত্ব" একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহাতে বীরেশ্বর বাবুর স্বদেশানুরাগ, পাণ্ডিত্য, চিন্তাশীলতা ও সমাজ-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতার প্রচুর প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমরা প্রত্যেক রক্ষণশীল সমাজ-সংস্কারককে ইহা এক একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি। সত্যের অনুরোধে এই স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, এই পুস্তকের কোন কোন স্থলে গ্রন্থকার একদেশদর্শিতা ও হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতার স্পষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আমাদের হাঁচি, টিক্‌টিকী পর্য্যন্ত ভাল, আর সাহেবদের কিছুই ভাল নয়—এ মত যারপর নাই অনুদার। তিনি কয়েকখানি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন। "জাহ্নবী" ও 'সহচরী' তাঁহারই সম্পাদিত দুই খানি মাসিক পত্রিকা।

বাবু রামদাস সেন তিনভাগ "ঐতিহাসিক-রহস্য" "রত্ন-রহস্য," "ভারত-রহস্য," "বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছেন। রামদাস বাবু কমলার প্রসাদ-ভাজন হইয়াও যে ভারতীর অর্চনায় জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে সামান্য প্রশংসার কথা নহে। তিনি একজন প্রত্ন-তত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র সমাদৃত। বাস্তবিক তাঁহার পাঁচ ভাগ "রহস্যে" প্রাচীন ভারতের অনেক রহস্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কয়েকখানি গ্রন্থ বঙ্গভাষার অমূল্য সম্পত্তি—সাহিত্য-ক্ষেত্রে রামদাস বাবুর অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ। তিনি ইউরোপের নানাদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। "বাঙ্গালীর ইউরোপ দর্শন" সেই ভ্রমণের ফল। পুস্তক খানি এরূপ সরল ও সুললিত ভাষায় লিখিত যে, ইহা উপন্যাসের ন্যায় মনোরম হইয়াছে। তিনি পূর্ব্বে কবিতা লিখিতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। "কবিতা-লহরী" সেই সময়ের রচনা। ইহার স্থানে স্থানে সুন্দর কবিত্ব-শক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। রামদাস বাবু অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া না গেলে, তাঁহার দ্বারা মাতৃভাষার মুখ আরও উজ্জ্বল হইত, সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত এ পর্য্যন্ত 'জয়দেব-চরিত' 'পাণিনি-বিচার,' 'আর্য্য-কীর্ত্তি,' 'সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস' দুইভাগ, ও কয়েকখানি স্কুল-পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনিও একজন পুরাতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত। যাঁহারা "জয়দেব রচিত" ও "পাণিনি-বিচার" নামক গ্রন্থদ্বয় পাঠ করিবেন, তাঁহারা রজনী বাবুর গভীর গবেষণা ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। "আর্য্য-কীর্ত্তিতে" ভারতের কয়েকটী বীরাঙ্গণা ও কতিপয় বীরপুরুষের চিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হইয়াছে। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত উদ্দীপনা-পূর্ণ, জ্বলন্ত ভাষায় লিখিত। দুই ভাগ "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" বঙ্গভাষার মহামূল্য সম্পত্তি এবং রজনী বাবুর চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি। ইহাতে তাঁহার স্বাধীন চিন্তা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, গভীর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধিৎসার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এরূপ ইতিহাস ভাষার গৌরব স্থল। কিন্তু তিনি অর্থলোভে সম্প্রতি নানা প্রকার স্কুল-পাঠ্য পুস্তক লিখিয়া সাহিত্য-জীবন হারাইতেছেন। তিনি মোক্ষমূলর ও কটন সাহেব প্রণীত দুইখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ "সেনরাজগণ" বা বাঙ্গালার শেষ রাজবংশের ইতিহাস, "রাজমালা" বা ত্রিপুরার রাজাদিগের বিবরণ, এবং আর কয়েক খানি গ্রন্থের রচনা করেন। আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁহারা কোন কথা কহিবার অধিকারী, কৈলাস বাবু তাঁহাদের মধ্যে এক জন। উপরোক্ত দুইখানি গ্রন্থ যাঁহারা বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগকে আমাদের সহিত এক মত হইতেই হইবে। বাস্তবিক এই দুই খানি পুস্তক প্রণয়ন করিতে কৈলাস বাবুকে যে যথেষ্ট পরিশ্রম ও অধ্যয়ন করিতে হইয়াছে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। মাসিক পত্রে প্রকাশিত, তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ সকল আমরা বিশেষ প্রীতির সহিত পাঠ করিয়া থাকি। তাঁহার সংগৃহীত "সাধক সঙ্গীত" সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। শ্যামাবিষয়ক এত গুলি উৎকৃষ্ট

সঙ্গীতের একত্র সমাবেশ ইতিপূর্ব্বে আমরা আর কখনও দেখি নাই। তিনি কয়েক খানি সংস্কৃত পুস্তকের সম্পাদন ও অনুবাদ করিয়াছেন।

'সভ্যতার ইতিহাসে' শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণদাস যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি বাকলস্, গিজো প্রভৃতি সভ্যতার ইতিহাস-লেখকদিগের কথা বঙ্গভাষায় বেশ পরিষ্কার করিয়া লিখিয়াছেন। তিনি কয়েক বৎসর 'জ্ঞানাঙ্কুর' নামক উৎকৃষ্ট মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন। তাহাতে তিনি অনেক গুলি ক্ষমতা-সূচক-প্রবন্ধের রচনা করেন।

শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত' 'গ্রীক ও হিন্দু' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। এই দুইখানি গ্রন্থ লিখিতে প্রফুল্ল বাবুকে যে বিস্তৃত অধ্যয়ন ও যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এগুলি মাতৃভাষার বিলক্ষণ পুষ্টিসাধন করিয়াছে। তবে, ভাষার দোষে ইহাদের অর্দ্ধেক সৌন[illegible]বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শ্রীযুক্ত হরিমোহন মুখোপাধ্যায় 'কবিচরিত,' 'রস-সাগর' প্রভৃতি প্রণয়ন করেন। 'কবিচরিতে' বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি এবং আদিকাল হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত প্রধান প্রধান কবিগণের জীবনী ও কবিত্ব-সমালোচনা আছে। ইহার জন্য হরিমোহন বাবুর নিকট বঙ্গভাষানুরাগী মাত্রেই ঋণী। ইহার পূর্ব্বে এরূপ ধরণের পুস্তক আর ছিল না। সুতরাং ইহার রচনা করিতে তাঁহাকে বিস্তর আয়াস ও শ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছে। 'রস-সাগরে' কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ীর জীবনী ও তাঁহার অনেক গুলি পাদ-পূরণ আছে। ইনিই মহারাজা গিরীশচন্দ্রের সভায় থাকিয়া 'রস-সাগর' উপাধি প্রাপ্ত হন। এই হরিমোহন বাবুই Tod's Rajasthan এর এক অতি সুন্দর সংস্করণ করেন। 'জয়াবতী ইঁহার প্রণীত একখানি সুপাঠ্য আখ্যায়িকা।'

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রমোহন বসুর 'কাশ্মীর-কুসুম' বাঙ্গালা ভাষায় নূতন সামগ্রী। ইহা পাঠ করিলে কাশ্মীরের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারা যায়। ইহার ভাষা সরল ও সুললিত; বর্ণনা হৃদয়গ্রাহিনী। পড়িতে কিছুমাত্র ক্লান্তি বোধ হয় না। পাঠকালে উপন্যাস পড়িতেছি বলিয়া মনে হয়।

মৃত মধুসূদন মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'সুশীলার উপখ্যান' কয়ভাগ উৎকৃষ্ট স্ত্রী-পাঠ্য পুস্তক। যখন স্ত্রী-শিক্ষা বাঙ্গালীর অন্তঃপুরে প্রথম প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময়ে ইহা রচিত হয়। শিক্ষার্থিনী বঙ্গ-নারীগণ পূর্ব্বে ইহা অতি আদরের সহিত পাঠ করিতেন।

কলিকাতাস্থ সাবিত্রী সভা হইতে প্রকাশিত 'সাবিত্রী' বঙ্গভাষার এক অপূর্ব্ব গ্রন্থ। এরূপ ধরণের পুস্তক বাঙ্গালায় এই নূতন। যাঁহারা এই সভায় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই চিন্তাশীল, কৃতবিদ্য এবং মাতৃভাষার ঐকান্তিক উপাসক। সুতরাং তাঁহাদের লিখিত প্রস্তাবগুলি যে সুপাঠ্য হইবে, তাহা আর কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। সভার সম্পাদক গোবিন্দ বাবু এই সকল সরল, জ্ঞানগর্ভ, চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ একত্র সংগ্রহ করিয়া 'সাবিত্রী' নামে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই সাধু অনুষ্ঠানের জন্য তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। স্বতন্ত্র

ভাবে থাকিলে প্রবন্ধগুলি হয়তঃ এক ধারে পড়িয়া থাকিত, কিন্তু এইরূপ পুস্তক মধ্যে নিবিষ্ট হওয়াতে তাহারা সকলেরই মনোযোগ আকর্ষণ করিবে এবং সাহিত্যে স্থায়ী ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

বঙ্কিম বাবু ভিন্ন বাঙ্গালায় আজিও প্রথম শ্রেণীর জীবন-চরিত-লেখক জন্মগ্রহণ করেন নাই। বসওয়েলের গুণ ও দোষ লইয়া এপর্য্যন্ত আর কোন বাঙ্গালী জীবনচরিত গ্রন্থ রচনা করিতে পারেন নাই। অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় যাঁহারা জীবনবৃত্ত লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্ত চিরঞ্জীব শর্ম্মা, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক প্রধান।

যোগেন্দ্র বাবুর বিষয় ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। নগেন্দ্র বাবু রামমোহন রায়, ও থিওডার পার্কারের জীবনবৃত্ত; শ্রীযুত চিরঞ্জীব শর্ম্মার ভক্তি-চৈতন্য-চন্দ্রিকা, কেশব-চরিত এবং ঈশাচরিতামৃত; কৃষ্ণ বাবুর বুদ্ধদেব ও মহম্মদ-চরিত দেশ মধ্যে বিলক্ষণ প্রচলিত। এই সকল পুস্তকে গ্রন্থকারদিগের পাণ্ডিত্য ও লিপি-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহারা আপন আপন গ্রন্থের নায়কদিগের চরিত্র অতি উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন। বাবু কালীময় ঘটক প্রণীত দুই ভাগ চরিত্রাষ্টকে এদেশের ১৬ জন প্রধান ব্যক্তির জীবনী অতি সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। বালক ও বৃদ্ধগণ ইহা হইতে যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। শ্রীযুত মহেন্দ্র নাথ রায় বিদ্যানিধি বিরচিত 'বাবু অক্ষয় কুমার দত্তের জীবন চরিত' এই শ্রেণীর একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার রচনা করিতে মহেন্দ্র বাবুকে যে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহার উজ্জ্বল উদাহরণ পুস্তকের প্রতি পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার রচনা পরিপাটী। ভাষা বিশুদ্ধ। মহেন্দ্র বাবুর বয়স অল্প। এই বয়সে তিনি এই দুরূহ কার্য্যে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে আশা আছে, ভবিষ্যতে তাঁহার লেখনী হইতে আরও কত মনোহর পুস্তক বাহির হইবে। তাঁহার 'হানিম্যানের জীবনী' আর এক খানি সুপাঠ্য গ্রন্থ।

শ্রীযুক্ত বঙ্কিম বাবু প্রণীত 'ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্তের জীবন চরিত ও কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধ' নামক পুস্তকের কলেবর অতি ক্ষুদ্র—৮০ পৃষ্ঠা মাত্র। কিন্তু গুণ গৌরবে ইহা এই শ্রেণীর শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। যত দিন বঙ্গভাষা থাকিবে ততদিন ইহার বিনাশ নাই। জীবনচরিত লেখা অতি কঠিন ব্যাপার। কাহারও জীবনের ঘটনাবলীর শুষ্ক উল্লেখমাত্র জীবনচরিত নহে। অথবা কাহারও জীবনের শুদ্ধ আলোকাংশ প্রদর্শন করাও জীবনচরিতের লক্ষ্য নহে। যাঁহার জীবনী লিখিত হইবে, তিনি কিরূপ মনুষ্য—পাঠককে বুঝাইতে হইবে। তাঁহার আলোক ও অন্ধকার ভাগ—তাঁহার গুণ ও দোষের কথা অকপটভাবে খুলিয়া বলা আবশ্যক। নতুবা পাঠক পূর্ণভাবে জীবন-চরিত পাঠের ফললাভে বঞ্চিত থাকিবেন। এই সকল কারণে কেবল বঙ্কিম বাবুর পুস্তক খানিই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। এই গ্রন্থের ভাষা তেজস্বিনী; বর্ণনা হৃদয়-গ্রাহিণী; রচনা-প্রণালী

পরিপাটী। আমরা প্রত্যেক বাঙ্গালীকে ইহা এক একবার পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ পর্য্যন্ত তিন ভাগ "পাঁচুঠাকুর," "কল্পতরু" এবং "ভারত-উদ্ধার" প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ব্যঙ্গ ও রহস্য পূর্ণ প্রস্তাব রচনায় বিশেষ পারদর্শী। "কল্পতরু" বঙ্গভাষার এক খানি অত্যুৎকৃষ্ট উপন্যাস। ইহাতে তাঁহার রহস্য-পটুতা; মানব-চরিত্র-জ্ঞান এবং লিপি-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঁচুঠাকুর তিন ভাগে এমন কতকগুলি প্রবন্ধ আছে, যাহাতে ইন্দ্রনাথ বাবুর মানসিক ক্ষমতার একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে। "ভারতের প্রাচীন ইতিহাস," "কাবুলস্থ সংবাদ-দাতার পত্র" "পঞ্চানন্দী ব্যাকরণ," "পাঁচী ধোবানী." "দে পাড়ার লক্ষ্মী বৈষ্ণবী," "নূতন ভূগোল" প্রভৃতির ন্যায় প্রস্তাব সকল আমার কথার সাক্ষী।" "ভারত-উদ্ধার" এক খানি ব্যঙ্গ বীররসাত্মক কাব্য এবং বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ। এপর্য্যন্ত বঙ্গভাষায় ব্যঙ্গ ও রহস্য পূর্ণ যত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে গদ্যে "মুচি-রাম গুড়ের জীবন চরিত" ও "লোক-রহস্য" এবং পদ্যে এই "ভারত-উদ্ধার" সর্ব্বাংশে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এই হাস্যরস উদ্দীপক" "মহাকাব্য" খানি পাঠ করিতে করিতে আমরা রচয়িতাকে প্রাণ খুলিয়া প্রশংসা করিয়াছি। তাঁহার বর্ণনা শক্তি অসাধারণ এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ লিখিবার ক্ষমতাও অপরিসীম। বাবু ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে একজন সুশিক্ষিত ও সুলেখক, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু সত্যের অনুরোধে এই স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যক যে, তাঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধে সহৃদয়তার নিতান্ত অভাব দেখিয়া মনে বিষম দুঃখ উপস্থিত হয়; বিকৃত রুচির পরিচয় পাইয়া তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে। যিনি সাধারণের পাঠ্য পত্রিকায় লজ্জা ও ভদ্রতার মাথা খাইয়া "শনি-বারের পালা" গাইতে পারেন, তিনি কৃত-বিদ্য হইলেও অসামাজিক, সুলেখক হইলেও নিন্দাভাজন। তিনি বাবু কেশব চন্দ্র সেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"সুলভ সমাচারে দেখিয়াছি, তুমি নববিধানে "সীতা উদ্ধার" করিয়াছ; এখন অনুরোধ এই, প্রাচীন বিধানে যাহা হইবার তাহা হইয়াছে, নব বিধানে যেন লঙ্কা কাণ্ডটা আর করিও না—কথাটা রাখিবে?" ইন্দ্রনাথ বাবু যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই বাঙ্গালী জাতির ভূষণ স্বরূপ, মহা মনীষা সম্পন্ন সভ্য জগতে প্রথিতনামা, পরম ভগবদ্ভক্ত কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধে এইরূপ রসিকতা (?) প্রকাশের প্রয়াস পাওয়া, কতদূর সুরুচি-সঙ্গত ও শীতলতার পরিচায়ক হইয়াছে, পাঠকগণ তাহার বিচার করি-বেন। ইঁহার অনেকগুলি প্রবন্ধই এই রূপ।

"একাদশ অবতার" বঙ্গভাষার আর একখানি অতি উচ্চদরের ব্যঙ্গ কাব্য। বাঙ্গালার কোন ক্ষমতাশালী সুলেখক "মহাকবি ধূর্জ্জটি" এই কল্পিত নাম ধারণ করিয়া ইহার রচনা করিয়াছেন। কবি উপহার পত্রে লিখিয়াছেন,—"পঞ্চানন্দ! একাদশ অবতার তোমার, এবং তুমি একাদশ অবতারের উপযুক্ত; সেই জন্য ইহা তোমাকেই অর্পণ করিলাম।" মহা-

কবি ধূর্জ্জটি পঞ্চানন্দ ও তাঁহার দলবলকে যাহা দিয়াছেন, তাঁহারা তাহা পাইবার সম্পূর্ণ অধিকারী বটে। তবে তাঁহাদের রোগ শান্তির জন্য কবিরাজ মহাশয় যে ঔষধ ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা অতিশয় তিক্ত। বাঙ্গালা ভাষার উপর লেখকের অধিকার অসাধারণ। অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনায় তাঁহার নৈপুণ্য অপূর্ব্ব। অলঙ্কার প্রয়োগে তিনি মন্ত্র-সিদ্ধ। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত কবিত্ব পূর্ণ। বিশেষতঃ একাদশ সর্গের প্রথম সাত পৃষ্ঠায় আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে। দুঃখ এই, এই কবিত্ব-শোভা সকলের চক্ষে পড়িবে না, কেন না, এরূপ ব্যঙ্গ-কাব্য সাহিত্যে কখনই স্থায়ী হয় না। ব্যঙ্গ কবিতার আবর্জ্জনার মধ্যে এই মনোহর কবিত্ব-কুসুম বিকশিত না হইলে, ইহা নিশ্চয়ই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারিত। বাস্তবিক একাদশ সর্গের প্রথমাংশ পড়িতে পড়িতে সেই পুরাতন কবিতা—"সিংহ ক্ষুণ্ণ করীন্দ্র কুম্ভ পতিতং রক্তাক্ত মুক্তা ফলং" ইত্যাদি আমাদের মনে উদয় হয়। এই কবির "রাজ-উদাসীন" বঙ্গভাষার এক খানি সু-পাঠ্য ক্ষুদ্র কাব্য।

শ্রীহেমনাথ মিত্র।

আর কি কোন শাখা নাই ?

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত "বেদান্তদর্শনের নূতন প্রকাশ" প্রস্তাবের প্রতিবাদ প্রসঙ্গে 'আত্মা ও অহংবৃত্তি' নামে একটী প্রবন্ধ আমরা গত বৈশাখ মাসে প্রকাশ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্র বাবু আত্মপক্ষ সমর্থন নিমিত্ত আমাদিগের উক্ত প্রবন্ধের উত্তরে "যে শাখায় উপবেশন সেই শাখার মূলচ্ছেদন" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ তত্ত্ববোধিনী ও ভারতী—এই উভয় পত্রিকাতেই এককালে প্রকাশিত করিয়াছেন। তদুত্তরে আমাদের যাহা বলিবার আছে, তাহার কিয়দংশ পুনরুক্তি বিবেচনা হইলেও আবশ্যক বোধে নিম্নে নিবেদন করিলাম।

সাংখ্যসার গ্রন্থোক্ত "দ্রষ্টা সামান্যতঃ সিদ্ধো জানেঽহমিতিধীবলাৎ" বচনটীর প্রকৃত অর্থ নিষ্পত্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু মহা আপত্তি তুলিয়াছেন। তাঁহার রচিত মূল প্রস্তাবে ঐ বচনটীর এইরূপ অর্থ করা হইয়াছিল, যথা—"আমি জানি" এইরূপ বুদ্ধিবলেই (এক কথায়—অহংবৃত্তি বলেই) আত্মসিদ্ধ হয়।" আমরা তাঁহার প্রতিবাদে এইরূপ অর্থ নিষ্পত্তি হওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়াছিলাম যথা—'আমি জানি" ইত্যাকার বুদ্ধিবৃত্তি হইতে সেই দ্রষ্টা সমান্য অনুমান বলে সপ্রমাণিত হয়েন।" দ্বিজেন্দ্র বাবু এক্ষণে বলিতেছেন, উক্ত বচনটীর এইরূপ অর্থ নিষ্পত্তি হওয়া বড়ই অযৌক্তিক, ষোল আনাই আমাদের মনগড়া। তিনি বিবেচনা করেন যে "সামান্যতঃ" কথাটি উক্ত বচন মধ্যে না দিলেও চলিত; তবে যে বিজ্ঞানভিক্ষু ঐ কথাটি সন্নিবেশ করিয়াছেন

সেটা বেশীর ভাগ, উহা রাখিলেই রাখিতে পারিতেন। আসল কথা এই যে, শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু উক্ত বচন দ্বারা দ্রষ্টাকে প্রত্যক্ষ বলে সিদ্ধ করিতে চাহেন, আর আমরা তদ্দ্বারা দ্রষ্টাকে অনুমান বলে সিদ্ধ করিতে চাহি—সুতরাং বিরোধ উপস্থিত।

বিরোধ মীমাংসা কারণ দেখা কর্ত্তব্য যে, এবিষয়ে আসল রচয়িতার—সাংখ্য-সার-কর্ত্তার প্রকৃত অভিপ্রায় কি? সাংখ্যসার-কর্ত্তা দ্রষ্টাকে প্রত্যক্ষবলে সিদ্ধ করিতে চাহেন না, অনুমান বলে সিদ্ধ করিতে চাহেন? মহর্ষি কপিল প্রণীত মূল সাংখ্য-দর্শনের সারাংশ লইয়াই সাংখ্যসার-গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, এবং সাংখ্যসার-কর্ত্তা বিজ্ঞানভিক্ষুই তাহার প্রবচন ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অতএব উপরোক্ত বিষয়ে মূল সাংখ্যদর্শন কি ব্যবস্থা দিতেছেন, তাহা এস্থলে দেখা আবশ্যক। সাংখ্যদর্শন বলিতেছেন—"সামান্যতো দৃষ্টাদুভয়সিদ্ধিঃ" বিজ্ঞানভিক্ষু তাহাতে ভাষ্য করিতেছেন এই—"অনুমানং তাবৎ ত্রিবিধং ভবতি। পূর্ব্ববৎ শেষবৎ সামান্যতো দৃষ্টং চেতি।... সামান্যতো দৃষ্টং চ তদুভয়ভিন্নমনুমানম্। যত্র সামান্যতঃ প্রত্যক্ষাদিজাতীয়মাদায় ব্যাপ্তি গ্রহাৎ পক্ষ ধর্ম্মতাবলেন তদ্বিজাতীয়োঽপ্রত্যক্ষাদ্যর্থঃ সিদ্ধ্যতি। যথা রূপাদিজ্ঞানে ক্রিয়াত্বেন করণবত্তানুমানম্। অত্রহি পৃথিবীত্বাদি জাতীয়ং কুঠারাদিকরণমাদায় ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা তদ্বিজাতীয়মতিন্দ্রীয়ং জ্ঞানকরণমিন্দ্রিয়ং সাধ্যত ইতি। তত্র সামান্যতোদৃষ্টাদনুমানদ্বয়োঃ প্রকৃতি পুরুষয়োঃ সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। তত্র প্রকৃতেঃ সামান্যতো দৃষ্টমনুমানম্। যথা মহত্তত্ত্বং সুখ দুঃখমোহধর্ম্মকদ্রব্যোপাদানকং কার্য্যত্বে সতি সুখদুঃখমোহধর্ম্মকত্বাৎ সুবর্ণাদিজকুণ্ডলাদিব দিত্যাদী। পুরুষে তু যদ্যপ্যনুমানাপেক্ষা নাস্তি সর্ব্বসম্মতত্বাৎ তথাপি প্রকৃত্যাদি বিবেকে সামান্যতো দৃষ্টমেবাপেক্ষ্যতে। তদযথা—প্রধানং পরার্থং সংহত্যকারিত্বাদ্ গৃহাদিবদিতি। অত্রহি প্রত্যক্ষসিদ্ধং দেহাদ্যর্থকত্বং গৃহাদিষু গৃহীত্বা তদ্বিজাতীয়ঃ পুরুষঃ প্রধানাদিপরত্বেনানুমীয়তে। এখানে সাংখ্য-দর্শন ও বিজ্ঞানভিক্ষু সমস্বরে প্রকাশ করিতেছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনুমান বলে সিদ্ধ হয়েন। যদিও পুরুষ কোন প্রকার প্রমাজ্ঞানের অধীন হইতে পারেন না, তথাপি প্রকৃত্যাদি বিবেক কারণ তাঁহাকেই ভোক্তা ও স্বামীরূপে সপ্রমাণার্থ, তাঁহার অনুমান প্রকরণ কথিত হইতেছে। পূর্ব্ববৎ শেষবৎ ও সামান্যতো দৃষ্ট—এই তিন প্রকার অনুমানের মধ্যে কেবল সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলেই তদুভয়ে প্রতিপন্ন হয়েন। সামান্যতঃ প্রত্যক্ষাদি জাতীয় বিষয় গ্রহণ করিয়া ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা পক্ষধর্ম্মবলে তদ্বিজাতীয় কোন অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের নিরূপণ, যে অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়, তাহাকেই বলে সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান। মনে কর আমার রূপাদি জ্ঞান হইতেছে, তাহাতে আমার মন মধ্যে প্রশ্ন উপস্থিত হইল যে, এই রূপাদি জ্ঞান কি কারণে কিরূপে সম্ভবপর? তখন ভাবিলাম যে, যখন একটী ক্রিয়া ঘটিতেছে, তখন সেই ক্রিয়ার অবশ্যই কোন কারণ আছে; কারণ করণ ভিন্ন ক্রিয়া নাই ও হইতে পারে না। এই সিদ্ধান্ত কোথা হইতে পাইলাম—না পূর্ব্বে বরাবর দেখিয়া আসিয়াছি—যেখানেই কোন ক্রিয়া হইয়াছে, সেইখানে তাহার করণও আছে; যেমন বৃক্ষ ছেদন আদি ক্রিয়াতে দেখিয়াছি যে

কুঠারাদি করণ ভিন্ন তাহা সম্পন্ন হয় না; সুতরাং আমার এইরূপাদি জ্ঞানরূপ কার্য্যের অবশ্যই করণ আছে, সেই করণ এখানে কি হইতে পারে—না অপ্রত্যক্ষীভূত ইন্দ্রিয়। অতএব সিদ্ধান্ত হইল, রূপাদি জ্ঞান অপ্রত্যক্ষীভূত ইন্দ্রিয়রূপ করণের দ্বারায় সম্ভব হইতেছে। এখন বিবেচনা কর—রূপাদি জ্ঞান ও ছেদন-ক্রিয়া উভয়েই প্রত্যক্ষ জাতীয় সামান্য বিষয়, কিন্তু ছেদন-ক্রিয়াতে করণ ছিল কি? কুঠারাদি; কিন্তু রূপাদি জ্ঞানের করণ হইল কি—না কুঠারাদির বিজাতীয় অপ্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়; অতএব এই অনুমান সামান্য মাত্র বিষয় হইতে আরম্ভ হইলেও ব্যাপ্তি জ্ঞান দ্বারা পক্ষ ধর্ম্মবলে বিজাতীয় অপ্রত্যক্ষীভূত পদার্থের সত্তা সিদ্ধ হইতেছে। এবম্বিধ সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের দ্বারায় প্রকৃতি পুরুষ সিদ্ধ হয়েন বলিলে বুঝিতে হইবে যে, তদ্বারা প্রকৃতির অস্তিত্ব ও পুরুষের ভোক্তৃত্বই সপ্রমাণিত হইয়া থাকে। সুবর্ণাদিজকুণ্ডলাবৎ বস্ত্রাদি কার্য্য শয্যাদিবৎ সামান্য প্রত্যক্ষজাতীয় অনুমানের বিষয় গ্রহণ করিয়া, সুখদুঃখ মোহ ধর্ম্মযুক্ত মহত্তত্বাদি কার্য্য হইবে, তাহাদিগের সাধারণ উপাদান গ্রহণ করিলেই প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে পুরুষের ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদনার্থ কহিতেছেন—দেহাদির নিমিত্তই সকলে গৃহ করিয়া থাকে। যে পদার্থের স্বপ্রয়োজনতা কিছু নাই, তাহা পরে প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যেই অবশ্য সৃষ্ট হইয়া থাকে; এবম্বিধ ব্যাপ্তিজ্ঞান গ্রহণের বলে গৃহাদি দর্শনে—দেহাদিকেই যেমন তাহাদিগের ভোগকর্ত্তা বলিয়া অনুমিত হয়, সেইরূপ প্রকৃতির কার্য্য দৃষ্টে উক্তবিধ ব্যাপ্তিজ্ঞান দ্বারা দেহাদির বিজাতীয় পুরুষই তাহার ভোগকর্ত্তা বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে।

এই ত গেল সাংখ্যদর্শনের মূল সূত্রের উপর বিজ্ঞানভিক্ষুর ভাষ্য। তাহার পর স্বপ্রণীত সাংখ্যসার গ্রন্থের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তিনি ঠিক ঐ সামান্যতোদৃষ্টানুমান বলেই প্রকৃতির অস্তিত্ব সিদ্ধ করিয়াছেন; তবে কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে তিনি বলিতেছেন "অনুমানস্য সামান্য মাত্রবিষয়কত্বাৎ" কি প্রকার—না "বস্ত্রাদি কার্য্য শয্যাদিবৎ।" আমরা তদনুযায়ী আমাদিগের পূর্ব্ব প্রস্তাবে সামান্যানুমানের লক্ষণ দিয়াছিলাম। তদ্দ্বারা যে পূর্ব্বোক্ত সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানই লক্ষিত হইয়াছিল, তাহা আর বোধ করি শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয়ের এখন বুঝিতে বাকী থাকিবে না।

প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমান বলে সিদ্ধ করিয়া ঠিক তাহার পর পরিচ্ছেদ প্রারম্ভেই বিজ্ঞানভিক্ষু বলিতেছেন—

তত্র সামান্যতঃ সিদ্ধো জ্ঞানেঽহমিতি ধীবলাৎ
দ্রষ্টাতো নিত্যবিভ্বাদি ধর্ম্মৈরেব স সাধ্যতে ॥

এখন আমরা এই শ্লোকের কি রূপ অর্থ করিব? যদি উক্ত প্রবচন ভাষ্যের কথার সহিত এখানকার কথার মিল রাখাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা হয়, তাহা হইলে দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে সায় দিয়া আমরা অনুমান কথাটা একেবারেই ছাড়িয়া দিতে পারি না। মূল সাংখ্যদর্শনে যেরূপ ভাব দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিপ্রায় যেরূপে ব্যক্ত হইতে দেখিয়াছি, আর সাংখ্যসার গ্রন্থমধ্যে প্রকৃতির অস্তিত্ব অনুমান প্রকরণে মূল সাংখ্যদর্শনের সহিত বিজ্ঞানভিক্ষু যেরূপ মিল রাখিয়াছেন দেখিয়াছি, তখন পুরুষের

ভোক্তৃত্ব সপ্রমাণ করিতে গিয়া সেইমত মিল রাখাই যে বিজ্ঞানভিক্ষুর অভিপ্রায় হইবে, সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ অত্যল্প মাত্রই থাকে। তাহার পর এই স্থলে সাংখ্যদর্শনের উল্লিখিত মূল সূত্রের ভাব বজায় রাখিলে, পরিষ্কার অর্থনিষ্পত্তি পক্ষে যদি কোন প্রকার বাধা না থাকা দৃষ্টিগোচর হয়, তবে এবম্বিধ অর্থনিষ্পত্তিই যে গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রেত—সে বিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ কিছুমাত্রই থাকে না। অতএব আমরা অনুমান শব্দ সন্নিবেশিত রাখিয়াই উক্ত শ্লোকের অর্থ করিব, এবং তদ্দ্বারা দেখাইব যে, তাহা না করিলে সংখ্য দর্শনের উক্ত শ্লোক মূল সূত্র ও তৎভাষ্যের সহিত এই স্থলের কোন মিল কি সৌসাদৃশ্য থাকে না ও থাকিতে পারে না।

উক্ত শ্লোকের অর্থ আমরা এইরূপ করি যথা—"আমি জানি" ইত্যাদি বুদ্ধি বৃত্তিসমূহ হইতে সেই দ্রষ্টা পুরুষ সামান্য বা সামান্যতো দৃ অনুমানের বলে, নিত্য বিভু আদি ধর্ম্ম দ্বারা অর্থাৎ নিত্যপ্রভু বা ভোক্তা আদি লক্ষণ বিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধ হয়েন। সাংখ্যদর্শনের উল্লিখিত মূল শ্লোকে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের বলে প্রকৃতির অস্তিত্ব ও পুরুষের ভোক্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছিল। সাংখ্যসার-কর্ত্তা বক্ষ্যমান শ্লোকের পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উক্ত অনুমান বলে প্রকৃতির অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়া,এইখানে পুরুষের ভোক্তৃত্বও সেই অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ করিলেন। এখন দেখা যাউক যে, উক্ত সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান এইখানে প্রয়োগ করা যুক্তিসঙ্গত বটে কিনা। আমি জানি ইত্যাকার বুদ্ধি বৃত্তি প্রকৃতিরই কার্য্য, যেহেতু তাহা সম্পূর্ণই বিষয়োপরক্ত, বিষয় থাকিলে আছে, না থাকিলে নাই;অথবা ইহাতে আমাদের নিজেরই বা কিছু বলিবার আবশ্যক কি আছে? ইহা সাংখ্যশাস্ত্রের একটী অবিসম্বাদিত মত যে বুদ্ধি প্রকৃতির ধর্ম্ম, প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাংখ্যদর্শনের উল্লিখিত মূলসূত্রের ভাষ্যে বিজ্ঞানভিক্ষু বুঝাইযাছিলেন যে, প্রকৃতি কার্য্য হইতে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান বলেই পুরুষ তাহার ভোক্তা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়েন। এখানেও সেই কথা বুঝাইলেন—আমি জানি ইত্যাকার বুদ্ধিবৃত্তিরূপ প্রত্যক্ষ প্রকৃতির কার্য্য হইতে সামান্য বা সামান্যতো দৃষ্ট অনুমান বলে অপ্রত্যক্ষ পুরুষের ভোক্তৃত্ব সিদ্ধ করিলেন। প্রবচন ভাষ্যের আরো অনেক জায়গার সহিত বক্ষ্যমান শ্লোকার্থের চমৎকার সৌসাদৃশ্য দেখাইতে পারা যায়, কিন্তু যাহা দেখান হইল, বর্ত্তমান প্রস্তাবের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট হইল বিবেচনায়, আমরা তাহাতে নিরস্ত রহিলাম। যাহা দেখাইলাম, তদ্দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয় যে, অনুমান কথাটা উক্ত শ্লোকে না থাকিলেও তাহা নিশ্চিন্তই আমাদের মনগড়া করিয়া ঢোকান হয় নাই। কথাটা যে সম্পূর্ণ আমাদিগের নূতন আমদানী, এমত নহে।

কিন্তু আমাদিগের পূর্ব্ব প্রবন্ধ হইতে বাছিয়া বাছিয়া এই অংশ টুকু লইয়া শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয় কেন যে এত গোলমাল করিয়াছেন—তাহা বুঝিলাম না। বিজ্ঞানভিক্ষুর উক্তি ও তাহাতে আমরা যে অর্থ করিয়াছিলাম, সেই অংশ টুকু আমাদের ঐ প্রবন্ধ হইতে বাদ দিলে বা উহ্য রাখিলেও যে আমাদের প্রবন্ধের পক্ষে কিছুমাত্র হানিজনক হইত, এমন বিবেচনা হয় না। মূল যুক্তির অনুসরণে প্রতিবাদ প্রসঙ্গে উত্থাপন না করিয়া শাখা প্রশাখা লইয়া বাদানুবাদ করিলে, শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু যে কি ফললাভ করিবেন—

বলিতে পারি না। আমরা ত জানি যে ইহাতে বিতণ্ডা মাত্র সার।

'সামান্যতঃ' কথাটি প্রত্যক্ষ মূলক স্থির করিয়া দ্বিজেন্দ্র বাবু তাহা হইতে আত্মজ্ঞান সপ্রমাণ করিতেছেন যথা—"যখন আমি একটা ঘট দেখিতেছি, তখন ঘট পদার্থ আমার বাহিরে বর্ত্তমান, ঘটজ্ঞান আমার অন্তরে বর্ত্তমান, কিন্তু যখন আমি আপনাকে জানিতেছি, তখন অহং পদার্থও আমার অন্তরে বর্ত্তমান—অহংজ্ঞানও আমার অন্তরে বর্ত্তমান, এবং দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী অভেদ সম্বন্ধও আমার অন্তরে বর্ত্তমান। বিষয়জ্ঞানের বেলায় জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞান—এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আত্মজ্ঞানের বেলা—জ্ঞানের বিষয় (আমি) এবং জ্ঞান (আমি জানিতেছি) দুইএর মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। * * * অতএব আমি জানিতেছি, ইহা আত্মার অস্তিত্বের আনুমানিক প্রমাণ নহে, কিন্তু সাক্ষাৎ প্রমাণ।" আবার সেই পুরাতন কথা। আমরা যে আত্মা ও অহংবৃত্তি প্রবন্ধে এত করিয়া দেখাইয়া মরিলাম যে, বেদান্তশাস্ত্রাদিমতে আত্মা বলিতে এক বুঝায়—অহংবৃত্তি বলিতে আর এক বুঝায়, আত্মা অর্থে নির্ব্বিশেষ কূটস্থ ব্রহ্ম, ও অহংবৃত্তি অর্থে সবিশেষ দেহস্থ জীব; অতএব এতদুভয় কদাপি এক হইতে পারে না—সুতরাং অহংজ্ঞান ও আত্মজ্ঞান উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যাপার; দ্বিজেন্দ্র বাবু আমাদিগের সে সকল কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিলেন না; আমাদিগের কথিত যুক্তি ও বিচার প্রণালীর মধ্যে কোথায় ভ্রম প্রমাদ হইয়াছে তাহা দেখাইলেন না, সে সকল যুক্তির উল্লেখই করিলেন না, অথচ অনায়াসে আবার সেই আপনার কথা পাড়িলেন, আবার অহং জ্ঞানকেই আত্ম বা ব্রহ্মজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন; সর্ব্বতোভাবে আপনার রায়ই বজায় রাখিলেন।—এই সকল কথা খণ্ডন করিতে গিয়া আবার যে পূর্ব্ব কথিত বাদানুবাদের পুনরুত্থাপন—চর্ব্বিত চর্ব্বণ—তাহাতে আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না। আমাদের প্রবৃত্তি না হওয়ার আর এক কারণ এই যে, আমরা জানি, বিশেষ করিয়াই জানি, যে হাজার দেখাই—হাজার বকিয়া মরি—এরূপ হাকিমদের রায় ফিরিবার নহে।

এইত আমি বসিয়া বসিয়া আপনাকে আপনি জানিতেছি—তবে ইহাই কি আমার আত্মজ্ঞান হওয়ার চূড়ান্ত প্রমাণ? আত্মজ্ঞান যদি এ রকম হয়, তবে আবাল বৃদ্ধ কেনা আত্মজ্ঞানের অধিকারী? সকলেই ত। যখন আমি আমাকে জানিতেছি, তখনও ত জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা—এই ত্রিপুটীর অভেদ মিলনাবস্থা দেখিতে পাইতেছি, তবে আর ইহাকে আত্মজ্ঞান কেনন৷ বলিব? আমরা ইহার উত্তরে বলি যে, এমন না হইলে আর অহংজ্ঞান আত্মচৈতন্যের ভাণার্থবিশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত হইবে কেন? ভাণ চমৎকার বটে, নকলের নকলত্ব চূড়ান্ত তাহাতে আর সন্দেহ কি? সূক্ষ্ম হিসাবে বিচার করিয়া দেখিতে দেখিতে আভাস চৈতন্যের নকলত্ব স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

কেবল আমাকে আমি বলিয়া জানিলেই ত আর আত্মজ্ঞান হয় না? দেহাদি অতিক্রম করিয়া, পঞ্চকোষের ব্যতিরিক্ত হইয়া, তন্ত্রমতে ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া, আপনাকে আপনি জানিতে হইবে—তাহাকেই বলে আত্মজ্ঞান। শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয়ই

কি এ কথা স্বীকার করেন না? করেন, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। তবে তাঁহার সহিত আমাদিগের বিরোধ কোথায়, তাহা দেখাইতেছি। তিনি বলেন, অর্থাৎ তাঁহার কথার মোট ভাব এই যে, আমাকে আধ্যাত্মিক আমি বলিয়া জানিতে হইবে। "আমি আমাকে জানিতেছি" বাক্যটীর ভিতর প্রথম আমি যে দ্বিতীয় "আমি" কে নির্দ্দেশ করিতেছে তাহা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ তাহা সম্পূর্ণ উপাধি ও দেহাদি বর্জ্জিত অপরিচ্ছিন্ন নিত্য অহংপদার্থ। অতএব অহংবৃত্তি দ্বারাই আত্মা জ্ঞেয় হইতেছেন। আমাকে দেহাদি উপাধি বিশিষ্ট অহং বলিয়া জানাই মোহমূলক, কিন্তু আমাকে সর্ব্বপ্রকার উপাধি-বর্জ্জিত অহং পদার্থ বলিয়া জানা—জ্ঞানমূলক। আমরা বলি, সকল প্রকার উপাধি বর্জ্জিত দেহাদি অতিরিক্ত অহং পদার্থকে অহং বলিয়া জানিতে পারিলে ত তবে তাহা আমার অহংবৃত্তির গম্য বা জ্ঞেয় হইবে? তাঁহার আধ্যাত্মিক কথার যদি এইরূপ অর্থ হয়—যে, যাহা দেহাদি ভাব বিহীন (সুতরাং আমাদিগের মতে যাহা সকল প্রকার উপাধি বিষয় বা ইদংজ্ঞানের অতীত) তাহাই আধ্যাত্মিক, তবে এবম্বিধ আধ্যাত্মিক 'আমি' চিরকালই আমার অহংবৃত্তির অর্থাৎ অহং ইত্যাকার জ্ঞানের পক্ষে অজ্ঞেয় থাকিবে। সুতরাং উভয় পক্ষে বিরোধ উপস্থিত।

বেদান্ত শাস্ত্র আমাদিগকে মোটামুটি এই শিক্ষা দেন :—দেখ যে যাহার ব্যাপক, সে তাহা হইতে পৃথক; সুতরাং বিষয়ী বিষয় হইতে অত্যন্ত পৃথক্; এই মূল যুক্তির অনুসরণে বিচার কর। যা কিছু ইদং শব্দ সঙ্গত বিষয় পদার্থ—সে সমস্তই তোমার এই অস্মৎ প্রত্যয় গোচর অহংরূপ বিষয়ী হইতে পৃথক। এই ইদংরূপ বিষয় জড়িত হইয়া তুমি আপনার স্বরূপ হারাইয়া বসিয়াছ। ইদংরূপ বিষয় সমূহ নশ্বর, অনন্ত অস্থির, তুমি তাহাতে জড়িত হইয়া প্রকাশ পাইতেছ বলিয়াই তোমার স্বরূপ অস্থিরবৎ প্রকাশ পাইতেছে। তুমি যদি নির্ব্বিষয়ী হইয়া প্রকাশ হও, তবেই তুমি আপনার হারানো স্বরূপ পুনঃ প্রাপ্ত হইবে; তবেই তুমি স্থির প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। অতএব তুমি যে আপনাকে বিষয়ীরূপে ভাবিতেছ, তাহাতে বিরত হও। তুমি গোড়ায় স্বরূপে বা ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পাইতে, কিন্তু এখন তোমার এই ব্যবহারিক দশায় তুমি সেই ব্রহ্মরূপের পরিবর্ত্তে, বিষয়ী অর্থাৎ অহংবৃত্তি স্বরূপে আপনাকে ভাবিতেছ। এই অহংজ্ঞান তোমার স্বরূপ নহে। দেখ ইদংবৃত্তিরূপ বিষয় বাহ্য দেহাদিতে উপরক্ত হইলেই তবে তুমি অহংজ্ঞান লাভ কর, তবে আর ইহাকে স্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ কর কেন? যখন তোমার অহং ইত্যাকার জ্ঞান প্রতিষিদ্ধ হইবে, তখন তুমি আপন স্বরূপে ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে, তখন তুমি আত্মজ্ঞানরূপ পরমধনের অধিকারী হইবে। ইত্যাদি।

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য কি ইহার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছেন? শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যের অবিকল অনুবাদ যাহা করিয়াছেন, তাহাতে কি প্রকাশ পায়? শঙ্করাচার্য্য বলিতেছেন "অস্মৎপ্রত্যয় গোচর বিষয়ীতে যুস্মৎ প্রত্যয় গোচর বিষয়ের এবং তদীয় ধর্ম্মের যে আরোপ, তাহা মিথ্যা হওয়াই যুক্ত"। শঙ্করাচার্য্যের এই কথার বিরুদ্ধে আমাদেরই কি কিছু বলিবার

আছে? কিছুই নাই। আমরা শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি, শঙ্করাচার্য্য কিসে অস্মৎ প্রত্যয় শব্দটি ব্যবহার করিতেছেন? বিষয়ীরূপ অহংপদার্থে না নির্বিষয়ী অহং পদার্থে? আভাস চৈতন্যে না স্বরূপ চৈতন্যে? তিনি বলিতেছেন, অস্মৎ প্রত্যয় গোচর বিষয়ী যাহা বিষয়ের স্বত্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট, তাহাকেই বিষয়ী বলিয়া অবধারণ করা কর্ত্তব্য— আমি বিষয়ের কোন স্বত্ব লইলাম না, কি পাইলাম না, এ অবস্থায় কেহ আমাকে বিষয়ী বলিয়া সম্বোধন করিতে পারে না—অতএব যে বিষয়ী সেই অস্মৎ প্রত্যয় গোচর হইবে; যে ইদংবৃত্তিরূপ বিষয়ের জ্ঞাতা ভোক্তা কর্ত্তা, সেই অস্মৎ প্রত্যয় গোচর হইবে; যেখানে সেই আত্মা একান্ত অবিষয়ী হইবেন না, সেই খানেই তিনি অস্মৎ প্রত্যয়ভাগী হইবেন; যেখানে আমি ইদং রূপ বিষয়গুলির কর্ত্তা ভোক্তা, এক কথায় বিষয়ী, সেই খানেই আমি অস্মৎ প্রত্যয়ভাগী হইব, অর্থাৎ অহং ইত্যাকার জ্ঞানের অধিকারী হইব, বা তদাকারে প্রকাশ পাইব; কিন্তু যেখানে আমি সর্ব্বপ্রকার দেহাদিভাব বিহীন, সর্ব্বপ্রকার উপাধির সহিত বিষয় বা ইদংজ্ঞানের অতীত, এক কথায় যেখানে আমি অর্থে আধ্যাত্মিক আমি—সে আমি বা নির্ব্বিশেষ অহং পদার্থও কি অস্মৎ প্রত্যয়ভাগী হইবে? ইহাকেই বলে বক্তা বলেন এক, শ্রোতা বোঝেন আর।

অতঃপর আমাদিগের পূর্ব্ব প্রবন্ধে যে যে বিষয় বিশেষ করিয়া দেখান হইয়াছিল, পাঠকবর্গের বোধ-সৌকর্য্যার্থ—সে গুলির কিঞ্চিন্মাত্র আভাস এস্থলে দেওয়া আবশ্যক বোধ হইতেছে। আমরা তথায় দেখাইয়াছিলাম:—(১) অনাত্মসংযোগে অন্তঃকরণ মধ্যে খণ্ডতা উপস্থিত হইলে—এক দিকে ভোক্তা জ্ঞাতা কর্ত্তা বিষয়ী অহম্বৃত্তি, অন্য দিকে ভোগ্য জ্ঞেয় কার্য্যরূপ বিষয় ইদংবৃত্তির যুগপৎ অভিব্যক্তি ঘটিয়া থাকে। (২) এতদুভয় বৃত্তির মধ্যে একটি রাখিয়া অপরটি ছাঁটিয়া ফেলিয়া দিবার চেষ্টা করা বৃথা, কারণ তাহা হইলে কে কাহার বিষয় হইবে? কার্য্য অভাবে কর্ত্তার অস্তিত্ব কি প্রকার—না খপুষ্পবৎ। (৩) বেদান্ত শাস্ত্রাদিতে প্রকাশ—যে কর্ত্তৃত্বাদি ভাববিহীন উপাধি-বর্জ্জিত নিরপেক্ষ যে চৈতন্য, তাহাই আত্মা, অহংবৃত্তি আপেক্ষিক, সুতরাং তাহা সেই নিরপেক্ষ কূটস্থ চৈতন্যকে স্বরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। (৪) যাঁহারা মনে করেন যে, যখন আমি আমাকে ভাবি, তখন আমাকে ইদংভাববর্জ্জিত করিয়াই ভাবি, তাঁহারা বড়ই ভ্রম বুঝেন; আরোহী ব্যক্তি পোতের ভিতর বসিয়া মনে করিতে পারে যে, সে কোথাও যাইতেছে না—এক স্থানেই আছে। পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির ধারণার সহিত এই আরোহীর ধারণার তুলনা করা যাইতে পারে। চিত্তের এবম্বিধ ধারণা, প্রত্যক্ষ বিশেষ কোন বিষয় জনিত না হইলেও, তাহাকে স্থূল সূক্ষ্মাদি উপাধি বর্জ্জিত বলা যাইতে পারে না। (৫) জাগ্রতাবস্থাই অহংবৃত্তির স্থূল বা মুখ্য উপাধি, স্বপ্নাবস্থাই অহংবৃত্তির তৈজস বা সূক্ষ্মোপাধি, এবং সুষুপ্তির অবস্থাই অহংবৃত্তির প্রজ্ঞানোপাধি। বেদান্তশাস্ত্রমতে তৈজস ও প্রজ্ঞান উপাধির নাম অহংবৃত্তি নহে, কারণ প্রকাশধর্ম্মের অবস্থান্তর পরিগ্রহে, একই পদার্থের ভিন্ন ভিন্ন নামকরণ হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য; অতএব 'অহং-

বৃত্তি বলিলে জাগ্রদবস্থার অহংজ্ঞানই বুঝিতে হইবে। (৬) উপরোক্ত ত্রিবিধ অবস্থা বা উপাধি পর্য্যালোচনায় জানা যায় যে, বিষয়ের নিশ্চেষ্টতার পরিমাণ অনুসারে অহংবৃত্তি ও নিশ্চেষ্টতার ভাব পাইয়া থাকে; সুতরাং বিষয়ের উত্তেজনায় যাহার উত্তেজনা, বিষয়ের সূক্ষ্মতায় যাহার সূক্ষ্মতা, ও বিষয়ের নিশ্চেষ্টতায় যাহার নিশ্চেষ্টতা, তাহার যে বিষয়ের অভাবে অভাব ঘটিবে—ইহা স্বীকার না করিয়া থাকা যায় না। (৭) অতএব যখন আমি আমাকে জানিব, তখন হয় বিষয়ের মধ্য দিয়া—না হয় উপাধির মধ্য দিয়াই আমাকে জানিব; উপাধি বর্জ্জিত নিরপেক্ষ আমি বা আত্মা স্বরূপতঃ আমার জ্ঞানে অর্থাৎ অহংবৃত্তি মূলক জ্ঞানে আসিবে না ও আসিতে পারে না।

এই সকল যুক্তির প্রতিকূলে শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয়ের বড় একটা বলিবার কথা আছে কি না তাহা আমরা জানি না, কারণ তিনি তাহা অপ্রকাশ রাখিয়াছেন; কিন্তু বলিবার কথা থাকুক বা নাই থাকুক, মীমাংসাটা তাঁহার বড়ই বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইয়াছে; এবং তা হইবারই কথা। তিনি এক অহংবৃত্তির দ্বারা সকল দিক বজায় রাখিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। বেদান্তবাদ ও তাঁহার স্বকৃত ব্রাহ্মধর্ম্মবাদ, অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈতবাদ, হিন্দুদর্শন শাস্ত্র ও ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্র, এই সমস্ত বিষয়ের সামঞ্জস্য তিনি এক অহংবৃত্তির জোরে রক্ষা করেন। এখন সেই অহংবৃত্তি দ্বারা আত্মা যদি জ্ঞেয় না হয়েন, সেই অহংবৃত্তি যদি নিত্য বলিয়া প্রতিপন্ন না হয়, তবে বিপদের কথা বটে; অতএব তিনি যে কোন প্রকারে হউক অহংবৃত্তির নিত্যত্ব রক্ষা করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন। অহংবৃত্তির নিত্যত্ব রক্ষা করিতে গিয়া তিনি খিচুড়ির পর এক মিক্শ্চার প্রস্তুত করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সেই মিক্শ্চারের দ্বারায় অহংবৃত্তিকে সুষুপ্তির করাল কবল হইতে উদ্ধার করিবেন—এই তাঁহার অভিপ্রায়।

তদুদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন—"লোকে কথায় বলে তেলে জলে কিছুতেই মিশ খায় না—তেলে জলে এত যে প্রভেদ, তথাপি একটা কাচের পাত্রে তেল ও জল রাখিলে উভয়ের সন্ধি স্থলে একটি চক্রাকৃতি অভেদ স্থান লক্ষিত হয়; সেই অভেদ স্থানটিকে তৈল রেখাও বলা যাইতে পারে, জল রেখাও বলা যাইতে পারে। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এত যে প্রভেদ, তথাপি উভয়ের অভেদ স্থান আছে—যেমন সুষুপ্তি। সুষুপ্তির যে অংশে জ্ঞানের সংস্রব আছে সেই অংশে সুষুপ্তির ভিতর অহংবৃত্তিও আছে, এবং সেই অংশেই আমরা বলি যে আমরা সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম; সুষুপ্তির যে অংশে অজ্ঞানাবস্থা, আমরা তাহা বলি না—বলিতে পারিও না; কেন না একেবারে যাহা জ্ঞানবহির্ভূত তাহার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহা অনর্থক বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নহে।" কিন্তু কি করিব, প্রবন্ধের গুণে—তিনি যাহা নিষেধ করিতেছেন তাহাই আমাদিগকে করিতে হইতেছে। সুষুপ্তির যে অংশ জ্ঞান বহির্ভূত, আমরা তাহার সম্বন্ধেই দু একটা কথা বলিব। আশা করি, শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয় আমাদের বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবুর মতে জ্ঞান কাহাকে কহে?—না, যাহা অহংবৃত্তি মূলক, অহং-

বৃত্তি সর্ব্বস্ব—এক কথায় যাহা অহংবৃত্তি—তাহাই জ্ঞান; আর অজ্ঞান কাহার নাম—না যাহা অহংবৃত্তি বহির্ভূত, সাদা কথায় যেখানে "আমি জানি" এ জ্ঞান থাকে না, তাহাই অজ্ঞান। তিনি তৈলে ও জলে সংমিশ্রণ করিয়া, তদ্দ্বারা এমন একটি অবস্থার সত্তা—কেবল সত্তামাত্র—স্বীকার করিতেছেন, যেখানে "আমি জানি" কথা চলে না। অহংবৃত্তির বহির্ভূত সেই অবস্থা সম্বন্ধে কিছু জানিতে সক্ষম না হইলেও তাহার সত্তা স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছেন। অতএব তিনি নিজেই সুষুপ্তির ভিতর এমন একটা অবস্থা স্বীকার করিলেন, যাহা অজ্ঞেয়; এবং অজ্ঞেয় বলিয়াই তৎসম্বন্ধে কোন কথা কহা বাচালতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন।

হিন্দুশাস্ত্রাদি মতে উক্ত অজ্ঞেয় অবস্থাই অহংবৃত্তির কারণাবস্থা, এবং কারণাবস্থা বলিয়াই তাহাতে অহংবৃত্তির লয় হইয়া থাকে। "নাশঃ কারণলয়ঃ" ইহা হিন্দুশাস্ত্রের অবিসম্বাদিত মত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কারণে লয় হওয়ার নামই নাশ। যেখানে অহংবৃত্তির বহির্ভূত, সেইখানেই অহংবৃত্তির রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত। বালুকাকণা প্রায় ক্ষুদ্র বীজের ভিতর যেমন সুবৃহৎ বৃক্ষের শাখা প্রশাখা পত্র পুষ্পের কোন চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না, জীবের সামান্য রেতঃবিন্দুর ভিতর যেমন জীবের অবয়বাদির, মন বুদ্ধি ধর্ম্মাদির কোন অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ গোচর হয় না, সেইরূপ অহংবৃত্তির বীজ অবস্থায় অহংবৃত্তির কোন আকারই থাকে না; অহংবৃত্তি বলিতে যে জ্ঞান বুঝিয়াথাকি, সেই জ্ঞানের একটু নিদর্শন ও সেইখানে খুঁজিয়া পাই না, তাই সে অবস্থার নাম অজ্ঞান।

অহংবৃত্তির স্বীয় বীজত্বে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, অর্দ্ধলয় সুষুপ্তির উদয় হইয়া থাকে; এবং এই অর্দ্ধলয় সুষুপ্তির দৃষ্টান্তই আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে দিয়াছিলাম। এই অবস্থায় অহংবৃত্তি সম্পূর্ণ বীজাকারে পরিণত হয় না বলিয়াই ইহার কিয়দংশে জ্ঞানের অস্তিত্ব খুঁজিলে পাওয়া যায় কিন্তু তা ও অতি অস্ফুটভাবে—আর কিয়দংশে হাজার খুঁজিয়া মরি, জ্ঞানের অস্তিত্ব আদবেই দেখিতে পাওয়া যায় না। মুমূর্ষূ ব্যক্তির যেমন একবার নাড়ী আসে, একবার নাড়ী যায়—এই আছে, এই নাই—অহংবৃত্তিরও এখন ইদংবৃত্তিরূপ বিষয়াভাবে সেই দশা হইয়া পড়িয়াছে। এই অবস্থাতে দ্বিজেন্দ্র বাবু অহংবৃত্তির বিলোপ হওয়া অস্বীকার করিয়া তৈলজলের উপমা খাটাইয়াছেন; কিন্তু তারপর?

তারপর যখন অহংবৃত্তি সম্যকভাবে বীজাকারে পরিণত হয়—যখন তাহার গোটাটাই অজ্ঞান, যখন কেবল সত্তামাত্র স্বীকার করিয়াই নিরস্ত হই, তখন সম্যক লয় সুষুপ্তির উদয় হয়। এ সম্বন্ধে আমরা নিজে কিছু বলিতে চাহি না। বিজ্ঞান ভিক্ষুর কথা শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয়ের কথঞ্চিৎ আদরণীয় হইতে পারে বিবেচনায়, আমরা তাঁহার কথাই তুলিতেছি।

"তত্র জাগ্রন্নামাবস্থেন্দ্রিয় দ্বারা বুদ্ধের্ব্বিষয়াকারঃ পরিণামঃ। স্বপ্নাবস্থাচ সংস্কার মাত্রজন্যস্তাদৃশঃ পরিণামঃ। সুষুপ্ত্যবস্থা চ দ্বিবিধার্দ্ধ সমগ্রলয়ভেদেন। তত্রার্দ্ধলয়ে বিষয়াকারাবৃত্তির্নভবতি। কিন্তু স্বগত সুখদুঃখমোহাকারৈব বুদ্ধির্বৃত্তি ভবতি। অন্যথোত্থিতস্ত সুখমহমস্বাপ্সমিত্যাদিরূপ সুষুপ্তিকালীন সুখাদি স্মরণানুপপত্তেঃ। সমগ্র-

লয়ে তু বুদ্ধের্বিসামান্যাভাবো মরণাদাবিব ভবতি।·····সা চ সুষুপ্তি বৃত্ত্যভাবরূপেতি পুরুষঃ তৎসাক্ষী ন ভবতি। পুরুষস্য বৃত্তি-মাত্রসাক্ষিত্বাৎ।" এই সমগ্র লয় সুষুপ্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয়ের জলে তেলের মিক্‌শ্চারের উদাহরণটা খাটে কি ? এখানে যে সমস্তটাই তেল বা সমস্তটাই জল। যে তৈল জল হইতে হয়, কিম্বা যে জল তৈল হইতে হয়, সে জলই বা কেমন, আর সে তেলই বা কেমন ? সুতরাং আমরা বুঝিতেছি যে, যে কোন রকমে হউক, এই সমগ্রলয় সুষুপ্তির অবস্থা অস্বীকার করা ভিন্ন প্রতিপক্ষ মহাশয়ের গত্যন্তর নাই। (এইখানে আর একটী গোড়ার কথা পাঠক মহাশয়গণকে স্মরণ করাইয়া দিই—এই বিজ্ঞানভিক্ষুই না শ্রদ্ধেয় প্রতি-পক্ষ মহাশয়কে অহংবৃত্তিতেই আত্মা-প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ এই ব্যবস্থা দিয়াছিলেন ?)

যখন বুঝিতেছি জাগ্রদবস্থার অন্তর্ভাবে স্বপ্নাবস্থা, স্বপ্নাবস্থার অন্তর্ভাবে অর্দ্ধলয় সুষুপ্তি, অর্দ্ধলয় সুষুপ্তির অন্তর্ভাবে সমগ্রলয় সুষুপ্তির উদয় হইতেছে ; আবার সমগ্রলয় সুষুপ্তির ব্যুত্থানে ঠিক সেই পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া বিপরীতক্রমে অর্দ্ধলয় সুষুপ্তি হইতে জাগ্রদবস্থার আবির্ভাব হইতেছে ; তখন সমগ্রলয় সুষুপ্তিকে জাগ্রদবস্থার ও অহং-বৃত্তির লয়স্থান বা কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যুক্তিসঙ্গত—না—একটীকে তেল অপর টীকে জল নির্দ্দেশ করিয়া তদুভয়ের মধ্যে অভেদচক্রের সৃষ্টি করা যুক্তিসঙ্গত ?

এখন অহংবৃত্তির বীজ স্থানই যদি অজ্ঞেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইল, তবে যে আত্মা শাস্ত্রমতে স্বরূপতঃ সেই বীজেরও অতীত বলিয়া বর্ণিত, সেই আত্মাকে আমরা অহংবৃত্তির জ্ঞেয় বলিব না অজ্ঞেয় বলিব ? শ্রুতি বলিতেছেন।

এক আত্মা চ মন্তব্যো জাগ্রৎ স্বপ্নসুষুপ্তিষু।
স্থানত্রয়াদ্ব্যতীতস্য পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥
(ব্রহ্মবিন্দূপনিষদ।)

তবে যে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু বলেন যে আমি অহংবৃত্তির বলে আমাকে দেহা-দির অতীত বলিয়া জানিব, তাহা যে কত দূর সম্ভবপর—তাহা তিনিই জানেন ; কিন্তু তিনি যেমন করিয়া জানিতে ইচ্ছা করেন জানুন—সম্ভব হউক বা অসম্ভব হউক, তিনি যখন প্রত্যক্ষ জানিতেছেন, তখন আর তৎপ্রতি আমাদের বক্তব্য কি থাকিতে পারে ? আমাদের কথটা এই যে, এমন অসম্ভব আপনার স্কন্ধের বোঝা শঙ্করাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য বেদান্ত শাস্ত্রা-দির স্কন্ধে চাপাইতেছেন কেন ? না চাপা-ইলে কি চলিত না ?

দেহাদির অতীত হওয়াও যা, বিষয়ের অতীত হওয়াও তাই ; আর বিষয়ের অতীত হওয়া যা, অবস্থা ও উপাধির অতীত হওয়াও তাই ; আর উপাধি ও অবস্থার অতীত হওয়া যা, অহংবৃত্তি বা অহংজ্ঞানের অতীত হওয়া তাই। দেহাদির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্থূল দেহ ও রাগ-দ্বেষাধীন মন বলিয়া থামিলে চলিবে কেন ? পঞ্চ-প্রাণ, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, সমস্ত মন, সমস্ত বুদ্ধি, অনাদি অনির্ব্বাচ্য উক্ত বীজদেহ, শঙ্করাচার্য্যেরমতে এ সমস্তই দেহ বলিয়া পরিগণিত ; অতএব এ সমস্ত বলা আবশ্যক। তবে আর বাকী রহিল কি ? কার্য্য গেল, করণ গেল, কারণ গেল, কর্ত্তাটি কিন্তু যেমন তেমনই রহিলেন ?

অতঃপর "অজ্ঞেয়" কথাটি বলিতে

আমরা কি বুঝি তাহাই বলিতেছি। ইহ-জীবনে অহংবৃত্তিই আমাদের সকল জ্ঞানের মূল। যাহা আমি জানিলাম না বা জানি না, তাহা যে কিরূপে জ্ঞানপদে বাচ্য হইতে পারে, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। অথচ এই অহংবৃত্তি যে অনিত্য ও আপেক্ষিক, যুক্তিপ্রমাণে ইহা স্বীকার করিতেই হয়। সামান্য রেতঃবিন্দুতে যে প্রসুপ্ত জীব চৈতন্য থাকে তাহা আমার জ্ঞানের অতীত, অথচ যুক্তি প্রমাণে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, যথন সেই রেতঃবিন্দু বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া এই শরীর মন, বুদ্ধি অহংবৃত্তি আদির প্রকাশ করিয়াছে, তথন এই সকলই বীজরূপে অবশ্য সেই রেতঃবিন্দুর ভিতর অব্যক্ত ভাবে ছিল। তদ্ব্যতীত সুষুপ্তি আদি অবস্থার আলোচনায় অহংবৃত্তি স্বভাবতঃই আপেক্ষিক ও উপাধি-গত বলিয়া প্রকাশ পায়। অতএব যথন সকল উপাধি যায়, যখন সকল আবরণ ভেদ হয়, সকল দেহ সকল বিষয় লয় পায়, তথন যাহা কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে তাহার সত্তাই বলি আর শূন্যই বলি—একই কথা।

ঊর্দ্ধশূন্য মধঃ শূন্যং মধ্য শূন্যং যদাত্মকং
সর্ব্বশূন্যং স আত্মেতি সমাধিস্থস্য লক্ষণং।

যুক্তি এই শূন্যের সত্তামাত্র স্বীকার করিয়াই নিরস্ত হয়, তারপর পরম কারুণিক শ্রুতি দেখা দেন, তাহার ভিতর দিয়া যুগে যুগে সিদ্ধ মহাপুরুষগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন তাহা শুনিতে পাই; তাঁহারা বলেন "তত্ত্বমসি" তুমিই সেই হও। বিষয়ের মধ্যে পতিত হইয়া উপাধির আবর্ত্তে ঘূর্ণায়মান হইতেছ। বিষয়ী হইয়া অহংবৃত্তি রূপে প্রকাশ পাইতেছ, ইহা তোমার স্বরূপ নহে; অতএব এই মিথ্যা ঘুচাও; যাহা নিত্য স্বপ্রকাশ তাহা আপনা হইতেই প্রকাশ পাইবে। আমরা ঐ মিথ্যা স্বরূপ হইতে মুক্ত। আমরা আত্মা হইয়া আত্মা জানিয়াছি।

অতএব "অজ্ঞেয়" অর্থে শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু যে মনে করেন, যে যাহা কথন প্রকাশিত হইবে না ও হইতে পারে না, আমরা তাহাতে সায় দিতে পারি না। আমরা বলি, আমাদের বর্ত্তমান অহংবৃত্তির পক্ষেই সেই জ্ঞান অজ্ঞেয়, কিন্তু অহংবৃত্তি নিত্য নহে; সুতরাং অহংবৃত্তি প্রতিষিদ্ধ হইলেই সেই জ্ঞান স্বরূপে প্রকাশ পাইবে। অহংবৃত্তি সমূলে ঘুচাইলে যে জ্ঞান প্রকাশ পাইবে, তাহা যে কি প্রকার—তাহা এথন আমাদের জানিবার উপায় নাই। নাই থাকুক, কিন্তু অহংবৃত্তি অনিত্য বিধায় তাহার প্রতিষিদ্ধ হওন পক্ষে সম্ভবতঃ কোন বাধা দৃষ্ট হয় না। আর অহংবৃত্তির তিরোভাবে যাহা প্রকাশ পাইবে, তাহাতে যে জ্ঞান আদি আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, তৎপক্ষে শ্রুতি-মুক্ত পুরুষগণের বাক্যই আমাদিগের একমাত্র প্রমাণ। শাস্ত্রমতে শ্রুতি ভিন্ন আত্মার অন্য সমস্ত প্রমাণ অগ্রাহ্য।

তাই "আত্মা ও অহংবৃত্তি" প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম—প্রকৃত সিদ্ধান্ত করিতে হইলে শ্রুতি ও অনুভব উভয়েরই প্রয়োজন। যেখানে যুক্তি দেখাইয়া দিবে যে অনুভবের সীমা এই পর্য্যন্ত, তথন সেই সীমার পর হইতে শ্রুতির সাহায্য লওয়া আবশ্যক। যদি অনুভবকেই যুক্তির চরম সীমা করা যায়, তাহা হইলে প্রমাণ হয় এই, যে আত্মা কি নিরপেক্ষ জ্ঞান নাই

ও থাকিতে পারে না, কারণ যা কিছু দেখিতেছি—যা কিছু জানিতেছি সে সমস্তই আপেক্ষিক ; অতএব খপুষ্পবৎ নিরপেক্ষ জ্ঞানের কথা তুলিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু শ্রুতি বলেন যে তাহাই আমাদের সর্ব্বস্ব, যেহেতু তাহাই একমাত্র নিত্য। অনুভবের রাজ্যে অনুভবই রাজা, শ্রুতির রাজ্যে শ্রুতিই রাজা। সুতরাং আমাদিগের উভয়ের কথাই শুনা কর্ত্তব্য। উভয় শাখা একত্র করিয়াই উপবেশন বিধেয়। যদি আমরা অনুভবকেই প্রমাণের একমাত্র দ্বার বলিয়া বিবেচনা করিতাম, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণ থাকিলে চলিত. কিন্তু এই দ্বিবিধ প্রমাণে আমাদিগের বিবেচনায় পর্য্যাপ্ত নহে ; আমরা বলি প্রমাণ ত্রিবিধ—প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম। প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি (যোগসূত্র)। যদি আমরা অনুভব বা অহংবৃত্তি মূলক জ্ঞানকেই সর্ব্বস্ব করিতাম, তাহা হইলে অবশ্য দ্বিজেন্দ্র বাবু আমাদিগকে বলিতে পারিতেন যে, অহংবৃত্তির মূল উচ্ছেদ করিতে গিয়া আমরা যে শাখায় উপবেশন করিয়াছিলাম সেই শাখার মূল উচ্ছেদ করিয়াছি ; কিন্তু তাহা ত আর নহে। শ্রুতি প্রমাণে যদি আমরা অহংবৃত্তির উপাধি রূপ মূল উচ্ছেদ করিয়াই থাকি, তাহাতে আর আমাদের পক্ষে হানিজনক হইল কি ? শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয় কি বুঝাইতে চাহেন যে, যাহা প্রকৃত অনুভবের অতীত, তাহার মীমাংসা ও অনুভবাত্মক যুক্তিসাপেক্ষ ? যাহা আমি জানি না, তাহার প্রকৃত মীমাংসা এই যে আমি জানি ? অহংবৃত্তিই কি আমাদের একমাত্র অবলম্বনীয় শাখা ? আর কি কোন শাখা নাই ?

অজ্ঞেয় পক্ষে সিদ্ধান্ত করায় শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয় আমাদিগের প্রতি গুটি কত রহস্যোক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন যথা—গুরু হইয়া মর্দ্দা ছাগলের দুগ্ধ দোহন ; ব্যাঙ্কের তহবিল খালি অথচ তাহা হইতে হাজার হাজার টাকার নোট সৃষ্টিকরণ ইত্যাদি। এই সকল রহস্যনিহিত যুক্তিরত্ন এই অজ্ঞেয় হইতে জ্ঞান অর্থাৎ অহংবৃত্তির সৃষ্টি, অননুভাব্য পদার্থ হইতে অনুভাবাত্মক পদার্থের সৃষ্টি, একেবারেই অসম্ভব। শ্রদ্ধেয় প্রতিপক্ষ মহাশয়ের এবম্বিধ যুক্তিকে যদি অকাট্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে ক্ষেত্রতত্ত্বের ব্যবস্থা মতে বিন্দু হইতে ক্ষেত্রের উৎপত্তি, অথবা পদার্থ দর্শন শাস্ত্রের ব্যবস্থা মতে অনু হইতে পদার্থের উৎপত্তি ও অসম্ভব হইয়া পড়ে। দৈর্ঘ্য বিস্তার রহিত বিন্দু হইতে প্রমাণ জ্ঞানে লক্ষ লক্ষ রাশ রাশ বিন্দুর সংযোজনায় ক্ষেত্রের উৎপত্তি অসম্ভব বিবেচনা হইলেও যদি তাহা অপ্রামাণ্য না হয়, তবে এই অজ্ঞেয় আত্মা হইতে প্রমাণ জ্ঞানে অহংবৃত্তির উৎপত্তি অসম্ভব বোধ হইলেই বা তাহা অপ্রামাণ্য হইবে কিসে ? রহস্য পটুতা কখন যুক্তির সারবত্তার প্রমাণ নহে ও হইতে পারে না।

শ্রীবিপিন বিহারী সেন।

চৈতন্য চরিত ও চৈতন্য ধর্ম্ম। (২৩শ)

জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার।

পুণ্য সত্তা বাচক; পাপ অসত্তা বাচক বা অভাবাত্মক। আলোক সত্তা বাচক, অন্ধকার অভাবাত্মক। আলোকের অভাবই অন্ধকার নামে আখ্যাত, পুণ্যের অভাবই পাপ নামে অভিহিত। পাপ অবস্তু, শূন্য, প্রকৃত পক্ষে কিছুই নয়। পুণ্য বস্তু বা সত্তা। পুণ্যময়ের পুণ্যরাজ্য মধ্যে পুণ্য বা ধর্ম্ম মানবাত্মার চিরসহচর বা অচ্ছেদ্য গুণ রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; যাবৎ সৃষ্টি লীলা তাবৎ ইহার স্থিতি, জীব প্রকৃতির সহিত ইহা ওত প্রোতরূপে অনুস্যূত। জীবাত্মা হইতে কেহ পুণ্যের সত্তা একবারে উন্মূলিত করিতে পারে না; যিনি যত ইহা হইতে দূরে থাকুন, তিনি যে একেবারে পুণ্যহীন হইবেন তাহা অসম্ভব। জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতা, রতি, মতি, দয়া, শ্রদ্ধা, ধৃতি, ক্ষমা, আনন্দ প্রভৃতি যে সমুদায় অসংখ্য বিচিত্র শক্তির বীজ মানবাত্মার অন্তর্ভূত আছে, যাহাদিগের বিকাশ হইলেই জীবের বিকাশ হয়, সে সকল সৎখণ্ড বা চিৎখণ্ড কেহ আমরা পুণ্যনামে অভিহিত করিলাম। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বের নামই পুণ্যতত্ত্ব। এই অর্থে কাম, ক্রোধ, লোভ, ঘৃণা প্রভৃতি নিকৃষ্ট শক্তি গুলিও পুণ্যপদ বাচ্য হইতেছে। কারণ তাহারাও সৃষ্টির অন্তর্গত। পাপের প্রকৃতি কিন্তু এরূপ নহে; পাপ সৃষ্টি ছাড়া, বিধাতার রাজ্য মধ্যে তাহার স্থান নাই। উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট সমস্ত প্রকৃতির অপরিস্ফুট অবস্থা যে পাপের অবস্থা, তাহা নহে; কিন্তু ঐ সকলের অযথা প্রয়োগই পাপ। তবেই দেখা যাইতেছে যে পাপের রাজ্য কল্পনার বা মোহের রাজ্য। কল্পনা কখন বস্তু নয়, সুতরাং পাপ অবস্তু। পুণ্যবান ব্যক্তি যেমন বস্তু লাভ করিয়া লীলাময়ের লীলা রাজ্যে অগ্রসর হইতে থাকেন, পাপী তেমনি পাপ করিয়া ভগবানের রাজ্য ছাড়িয়া মরীচিকাময় স্বীয় কল্পনার ও স্বপ্নের রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়। একজন বস্তুলাভ করে, আর একজন অবস্তুতে ডুবিয়া মরে। এই জন্য প্রকৃত ভগবৎ পরায়ণ সাধু ব্যক্তি পাপের নিত্যত্বে কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। যাঁহারা পাপের বস্তুত্বে বিশ্বাস করেন, পাপের সৃষ্টি বিষয়েও সুতরাং তাহাদের বিশ্বাস করিতে হয়; আবার অনন্ত পুণ্যের আধার ভগবান পাপের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেন না। তাঁহারা পাপ-প্রসবিতা সয়তান বা পাপ পুরুষের নিত্যত্বে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হন। ইহার ফল সিদ্ধান্ত এই দাঁড়ায় যে, পাপীর পাপ দূরীভূত না হইলে জীবাত্মার অনন্ত কালের সহচর হইল। কাজে কাজেই দুর্ভাগ্য জীবের কপালে অনন্ত নরক ভোগ বই আর কি হইতে পারে। খ্রীষ্টধর্ম্ম এই মতের পক্ষপাতী। ঐ ধর্ম্মে এই পাপ মোচনের যে উপায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহা যিনি অবলম্বন করিতে পারিলেন, তিনি সৌভাগ্যবান, কিন্তু যাঁহারা উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না, বা সেই পরিত্রাণ পদ্ধতি যাঁহারা জানিতে পারেন নাই, অথবা যাঁহাদের জীবিতকালে ঐ পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচারিত হয় নাই, তাঁহাদের

কপালে অনন্ত নরক লিখিত হইল। মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান কিন্তু এই মতে সায় দিতে পারে না। ভগবত্তত্ত্বের নিকট পাপ অবস্তু, সুতরাং চিরস্থায়ী নহে। মরীচিকার স্থায়িত্ব কোথায়? স্বপ্নের নিত্যত্ব অসম্ভব। সুতরাং চিরকাল কেহ পাপী থাকিতে পারে না। যে যতই কেন মনুষ্যত্ব বিহীন দুরাচার পাপী হউক না, তাহার মোহ ছুটিবেই ছুটিবে, স্বপ্ন ভাঙ্গিবেই ভাঙ্গিবে, ভ্রান্তি যাইবেই যাইবে। এ জীবনে না যায় তাহাতে কি? অনন্ত জীবন পড়িয়া আছে।

কি সুখের সংবাদ! কি আশার কথা! এমন না হইলে কি পাপীদের মাথা রাখিবার স্থান থাকিত? পাপের এই আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া দুরাচার পাষাণ হৃদয় কঠিন পাপীদেরও আশু উদ্ধার কল্পে নিরাশ হওয়া যায় না। যেমন স্বপ্ন সঞ্চারণ করিয়া স্বপ্নটী ভাঙ্গাইয়া দিতে পারিলেই তাহাকে প্রকৃতিস্থ করা যায়, তেমনি পাপের মোহ ছাড়াইতে পারিলেই পাপী আপন জীবনগতি দেখিতে পায়; পুণ্য পাইবার জন্য ব্যাকুল হয়, এবং এত দিন কল্পনা ভ্রমণের জন্য অনুতাপ করে। এই রোগের সাধু চিকিৎসক যাঁহারা, তাঁহারা এই চমক্ ছাড়াইবার জন্যই যুগে যুগে যে সকল কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, ধর্ম্ম জগতের ইতিহাস তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ভূতের রোজা মন্ত্র পড়িয়া ভূত ছাড়ায়, এ কথায় আজ কাল সকলে বিশ্বাস করিবেন না, কিন্তু পাপ ভূতের রোজাগণ অলৌকিক মন্ত্র বলে যে মহাপাপীর উদ্ধার-সাধন করিয়াছেন, তাহাতে কে অবিশ্বাস করিতে পারে? এক দুই দশ দিনে বা দু'বছর," দশ বছরে নহে, এক মিনিটের মধ্যে পাপের মরীচিকা দূরীভূত হইয়াছে। কল্পনা-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তাহার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে। পাপ বস্তু বা সত্ত্বা হইলে ইহা কখনই সম্ভব হইত না; রত্নাকর, বাল্মীকি, দুরাত্মা সল সাধু পল,নৃশংস ব্যাধ, পরম ভক্ত হইতে পারিত না। যে মহামন্ত্র বলে এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার সংসাধিত হইয়াছে, তাহা ভগবানের নাম। নিত্যানন্দ এই সমস্ত তত্ত্ব বিশেষরূপে অবগত ছিলেন; তাই জগাই মাধাইয়ের উদ্ধার সাধনে পূর্ণ আশা করিতেছিলেন।

নিত্যানন্দ যে দিন হরিদাসের সঙ্গে নাম প্রচারে যাইয়া মদ্যপদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে তাহাদিগের উপর কেমন একটা টান হইয়াছিল, তাহাদের উদ্ধারের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যখন তখন তাহাদিগের নিকটে যাইতেন ও গোপনে থাকিয়া তাহাদের কার্য্য কলাপ পরীক্ষা করিতেন। জগাই মাধাই তখন ঘোর উন্মত্ত অবস্থায়, সুতরাং নিতাইয়ের এই সব সাধু চেষ্টা জানিতে পারে নাই। এই অবস্থায় এক দিন রজনীযোগে নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করিয়া আসিতে আসিতে পাপী দুইটার সমীপবর্ত্তী হইলেন। আগন্তুকের পদশব্দ শুনিয়া মাতাল দুইজন 'কে রে কে রে' করিয়া চীৎকার করতঃ জিজ্ঞাসা করিল, তোর নাম কি? নিত্যানন্দ প্রেমভাবে উত্তর করিলেন 'আমার নাম অবধূত'। 'আর যাস কোথা' বলিয়া মাধাই নিকটস্থিত কলসী ভাঙ্গা মুট্‌কী কুড়াইয়া লইয়া তাঁহার প্রতি নিষ্ঠুররূপে ছুড়িতে লাগিল। মুট্‌কী নিতাইয়ের মস্তকে

লাগিয়া ফুটিয়া দর দরিত ধারে রক্ত পড়িতে লাগিল :—

"একদিন নিত্যানন্দ নগর ভ্রমিয়া,
রাত্রিতে আইসে, দুই ধরিল বেড়িয়া।
কে রে কে রে বলি ডাকে জগাই মাধাই ;
নিত্যানন্দ বলেন প্রভুর বাড়ী যাই।
মদ্যের বিক্ষেপে বলে কিবা নাম তোর ;
নিত্যানন্দ বলে অবধূত নাম মোর।
বাল্যভাবে মহামত্ত নিত্যানন্দ রায়,
মদ্যপের সঙ্গে কথা কহয়ে লীলায়।
উদ্ধারিব দুইজন হেন আছে মনে,
অতএব নিশাভাগে আইল সেস্থানে।
অবধূত নাম শুনি মাধাই কাঁপিয়া,
মারিল প্রভুর শিরে মুট্‌কী তুলিয়া,
ফুটিল মুট্‌কী শিরে, রক্তপড়ে ধারে ;
নিত্যানন্দ মহাপ্রভু গোবিন্দ স্মরে।"

চৈঃ ভাঃ।

নিতাই মুট্‌কীর আঘাত খাইয়া ব্যথিত হওয়া দূরে থাকুক প্রেমে বিহ্বল হইয়া উঠিলেন, আপনার মাথা দিয়া যে দর বিগলিত ধারে শোণিত পড়িতেছে, তাহা গ্রাহ্য নাই, জগাই মাধাইয়ের দুষ্কৃতি দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তিনি যে সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাদের অপরাধ মার্জ্জনা করিলেন, শুধু তাহা নহে ; সেই রুধিরাপ্লুত কলেবরে তাহাদের আলিঙ্গন করিবার জন্য ধাবিত হইলেন। বড় ভাই ছোট ভাইয়ের মার খাইয়া যেমন প্রেম ভাবে তাহাকে আদর করে, মহা প্রেমিক নিতাই তেমনি বাহু বিস্তার করত আলিঙ্গন করিতে গেলেন :—

"মাধাইরে আয় ভাই !
মেরেছিস্ কলসীর কাণা ;
তাঁরে ! তা বলে কি প্রেম দিব না।"

ধন্য প্রেম ! জগতী তলে তুমিই ধন্য ! ভগবানের জীবন্ত শক্তি ; তুমিই ধন্য। আর নিতাই ! ধন্য তোমার প্রেম শিক্ষা ! এ প্রেম কি তুমি প্রেমময়ীর পাঠশালায় শিখেছিলে ? নইলে স্বার্থপর জগতে ইহার ছবি তো দেখিতে পাই না। প্রেমময় ! তুমিই ধন্য যে দুর্বৃত্ত মানব জাতীর মধ্যে এমন স্বর্গের জিনিষ পাঠাইয়া ছিলে। এ প্রেম না হলে কি অসুর কুল উদ্ধার হতো ! সাধুর রক্তে যে পাপীর পরিত্রাণ, একথা আর অবিশ্বাস করিব কেমন করে ? ঈশার রক্তে পৃথিবী উদ্ধার হইল, হরিদাসের শোণিতে নিশ্চয় যবনকুল দ্রবীভূত হইল, আর নিত্যানন্দের শোণিতে আজ জগাই মাধাই তরে গেল, তবে আমরা পাপীদের উদ্ধার হইতে আর বাকি কি থাকিল, তাই আজ আনন্দে সকলে হরি হরি বল।

নিকটে থাকিয়া জগাই এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে ছিল, বিদ্যুদ্বেগে যেন এক মহাশক্তি তাহার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার মাথা ঘুরাইয়া দিল। চকিতালোকে তাহার পাপ জীবনের পাপপূর্ণ প্রতিকৃতি যুগপৎ মনশ্চক্ষুর নিকট উপস্থিত হইল, কে যেন জোর করিয়া তাহার চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া নিত্যানন্দের স্বর্গীয় প্রেম পূর্ণ জীবন-ছবির সহিত তাহার ঘৃণিত ও কলঙ্কিত জীবনের তুলনা করিয়া দিল। অমনি পাপের বিঘোর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, মোহের চট্‌কা ছুটিয়া গেল এবং স্বপ্ন সঞ্চারীর স্বপ্ন ভঙ্গ হইলে যেমত হয়, সে আপনার অবস্থা তেমনি দেখিতে পাইল। পাপের প্রলেপ যত কেন ঘনীভূত হউক না, উহা অবস্তু, ভুয়া বই তো নয়, তাই অস্তিত্ব পূর্ণ পুণ্য রূপিণী ভগবচ্ছক্তি কে কখন চিরকাল

আবৃত করিয়া রাখিতে পারে না। সেই জন্য মাধাই নিত্যানন্দকে বিনা দোষে যে নির্ঘাত প্রহার করিল, তাহা দেখিয়া জগাইয়ের প্রাণে দয়া হইল, সে মাধাইকে পুনর্ব্বার মারিতে না দিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল :—

"দয়া হৈল জগাইর, রক্ত দেখি মাথে,
আর বার মারিতে ধরিল তার হাতে।
কেন হেন করিলে নির্দ্দয় তুমি দৃঢ়,
দেশান্তরী মারিয়া কি হৈলে তুমি বড়।
এড়, এড় অবধূতে না মারিও আর,
সন্ন্যাসী মারিয়া কোন ভালই তোমার।"

যেথানে এই ব্যাপার সংঘটিত হইতেছিল, সেথান হইতে বিশ্বম্ভরের বাড়ী অধিক দূর নহে। গৌরচন্দ্র তথন বহির্ব্বাটীতে স্বদলে বসিয়া ভগবৎ প্রসঙ্গ করিতেছিলেন। এমন সময় এক জন লোক যাইয়া মাধাই কর্ত্তৃক নিত্যানন্দের প্রহার বৃত্তান্ত জানাইল। গৌরচন্দ্র সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া তৎক্ষণাৎ ঘটনা ক্ষেত্রে আসিয়া দেখিলেন, বহুজন সমাকীর্ণের মধ্যে নিত্যানন্দ দণ্ডায়মান, মস্তক দিয়া দরদরিতধারে রক্ত পড়িতেছে। অদূরে জগাই মাধাই দাঁড়াইয়া আছে, আর নিতাই সেই রক্তাক্ত কলেবরে হাসিতে হাসিতে আততায়ীদিগকে আলিঙ্গন করিতে চাহিতেছেন ;—

"নিতাইর অঙ্গে সব রক্ত পড়ে ধারে,
হাসে নিত্যানন্দ সেই উইর ভিতরে।"

নিতাইর অঙ্গে রক্ত-ধারা দেখিয়া, গৌরচন্দ্র ক্রোধে অধীর হইয়া পাপীদিগকে সংহার করিবার জন্য 'চক্র! চক্র!' বলিয়া সুদর্শন চক্রকে নাকি স্মরণ করিলেন। কথিত আছে যে, ভক্তগণ চক্রের আগমন দেখিতে পাইয়া প্রমাদ গণনা করিতেছিলেন, এমন সময় নিত্যানন্দ গৌরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে "মাধাই মারিতেছিল বটে, কিন্তু জগাই করুণা-পরবশ হইয়া মাধাইকে মারিতে দেয় নাই; আমি বিশেষ কোন আঘাত পাই নাই; দৈবে রক্ত পড়িয়াছে; তাহাতে কিছু হানি হয় নাই। যাহা হউক, তুমি স্থির হও, আমার অনুরোধ, এ দুই জনকে কিছু বলিতে পাইবে না।'

"আতে ব্যতে নিত্যানন্দ করে নিবেদন,
মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই,
দৈবে সে পড়িল রক্ত দুঃখ নাহি পাই।
মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভু এ দুই শরীর,
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির।"

এই দৃশ্য প্রথম দেখিয়া গৌরের ক্রোধোদ্রেক হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নহে, কিন্তু চক্র স্মরণ ও চক্রের আবির্ভাবের বৃত্তান্তটা অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। যাহা হউক, 'মাধাই মারিতে জগাই রাখিয়াছে' এই কথা শুনিয়া গৌরের ভাবান্তর উপস্থিত হইল; তাঁহার প্রেম-প্রবণ হৃদয়ের প্রেম উথলিয়া উঠিল। তথন তিনি জগাইকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন :—

"জগাই রাখিল এই বচন শুনিয়া,
জগাইরে আলিঙ্গন কৈল সুখী হৈয়া।
জগাইরে! বলে কৃষ্ণ কৃপা করুন তোরে,
নিত্যানন্দে রাখিয়া কিনিলা তুমি মোরে।
যে অভীষ্ট চিত্তে থাকে তাহা তুমি মাগ,
আজ হৈতে হউ তোর প্রেম ভক্তি লাভ।"

নিত্যানন্দের স্বর্গীয় প্রেম প্রভাবে ইতিপূর্ব্বেই জগাইর প্রাণে সুমহৎ পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়াছিল, যে টুকু বাকী ছিল, তাহা গৌরের প্রেমালিঙ্গনে পূর্ণ

হইয়া গেল। সত্য সত্যই জগাইয়ের পাপ মোহ ছুটিয়া গেল, চিরকালের সঞ্চিত পাপরাশি স্মরণ করিয়া অনুতাপানলে তাহার প্রাণ দগ্ধ হইতে লাগিল, জীবনের জঘন্যতা স্মরণ করিয়া তাহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল ; এবং সাক্ষাৎ পাপ পুরুষ বিকটাকার দেহ ধরিয়া তাহাকে যেন গ্রাস করিতে আসিল। জগাই মূর্চ্ছিত হইয়া ধরাতলে পড়িয়া গেল। ধন্য! ভগবান্ তোমার প্রেমের মহিমা; মুহূর্ত্তমাত্রে যুগ প্রলয় উপস্থিত। এক নিমিষে ঘোরতর মহা পাপী উদ্ধার হইয়া গেল। মূর্চ্ছাবস্থায় জগাই স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে সকল সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছিল, তাহারা রাক্ষসীর মূর্ত্তি ধরিয়া আলুলায়িত কেশে বিকট হাস্য করিতে করিতে তাহাকে যেন বিষ্ঠা-গর্ত্তে চুবাইতেছে, যে অবলার অবৈধ গর্ভোৎপাদন করায় কলঙ্কিনী কলঙ্ক লুকাইতে আত্মহত্যা করিয়াছিল, সে যেন তপ্ত লৌহ শলাকা তাহার চক্ষের গহ্বরে ফুটাইয়া দিতেছে। যেন ভয়ানক তৃষ্ণায় তাহার গলা শুকাইয়া গিয়াছে, আর ইতিপূর্ব্বে যাহাদের সে যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়াছিল, তাহারা হাসিতে হাসিতে যেন দুর্গন্ধময় আগ্নেয় সুরা আনিয়া তাহার মুখে ঢালিয়া দিতেছে, পাপী দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চীৎকার করিতেছে। ইহারি মধ্যে দেখে যেন অতি দূর হইতে "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া রুধিরাক্ত কলেবরে নিত্যানন্দ তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিতেছেন, এবং ক্ষণকাল পরে দেখিল যেন বিশ্বম্ভর শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্ম চতুর্ভুজধারী বিষ্ণুরূপে হাসিতে হাসিতে আসিয়া স্বীয় পাদপদ্ম তাহার বক্ষঃস্থলে ধারণ করিলেন, অমনি সেই পিশাচ রাক্ষস সকল অন্তর্হিত হইয়া গেল ও নরকের ভীষণ দৃশ্যের পরিবর্ত্তে স্বর্গের অনুপম শোভা চারিদিকে প্রকাশিত হইল। এই অবস্থায় চৈতন্য লাভ হইলে, পুরাতন ও কঠিন পাপী জগাই বিশ্বম্ভরের চরণ ধরিয়া নিস্তারের জন্য বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। জগাই ও মাধাইর শরীর মাত্র পৃথক, দুইজনে একপ্রাণ। বাল্যাবধি যত পাপ করিয়াছে, দুইজনে একত্রে; যেমন জননীর এক স্তন্য-ধারায় যুগল-তনয় পুষ্ট হয়, তেমনি পাপ-পিশাচীর একই কলুষ স্রোতে উভয় পাপী-সম্বর্দ্ধিত হইয়াছে। এখন একজন পুণ্যবান হইল; একজন পাপী থাকিয়া গেল; তাহাতো হইতে পারে না। মাধাই নিত্যানন্দকে প্রহার করিয়া কিছু অপ্রতিভ হইয়া নিকটে বসিয়াছিল, জগাইর ঈদৃশ অবস্থা পরিবর্ত্তন দেখিতে দেখিতে ও অনুতাপের ক্রন্দন শুনিতে শুনিতে তাহারও ভাবান্তর উপস্থিত হইল। জগাইয়ের প্রাণের পরিবর্ত্তনের ঢেউ আসিয়া যেন তাহার হৃদয়েও লাগিল। কে জানে কি শক্তি প্রভাবে তাহারও পাপের নেশা ছুটিয়া গেল; তখন সে ব্যাকুল চিত্তে শ্রীগৌরাঙ্গকে বলিতে লাগিল :—

"আমরা দুইজনে এক সঙ্গে চিরকাল পাপ করিয়া আসিতেছি; সুখ দুঃখ যখন যাহা ঘটিয়াছে, উভয়ে সমানাংশে ভোগ করিয়াছি, এখন জগাই পুন্যবান হবে, আর আমি পাপী থাকিয়া যাইব, তাহা হইতে পারে না; আর তোমারই অনুগ্রহ বা কেমন করে এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিবে? আমি দুরন্ত পাতকী। গৌর! তুমি ভিন্ন আমাকে আর কে

উদ্ধার করিবে, আমাকে রক্ষা কর।

"এক জীব দুই দেহ জগাই মাধাই,
এক পুণ্য এক পাপ বৈসে এক ঠাঁই।
জগাইরে প্রভু যবে অনুগ্রহ কৈল,
মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল।
আথে ব্যথে নিত্যানন্দের বসন এড়িয়া,
পড়িল চরণ ধরি দণ্ডবৎ হৈয়া।
দুইজনে এক ঠাঁই কৈল বহু পাপ;
অনুগ্রহ কেন প্রভু দেখি দুই ভাগ।
"মোরে অনুগ্রহ কর লই তোর নাম;
আমার উদ্ধার করিবারে নাহি আন।"

বিশ্বম্ভর বজ্র গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, তোমার নিষ্কৃতি নাই; তুমি সাধু দেহে রক্তপাত করিয়াছ, সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

মাধাই দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে কহিল, আমার উদ্ধার না হইলে তোমাকেই বা ছাড়ে কে? শুনিয়াছি, তুমি পাপ রোগের সুচিকিৎসক; আমার রোগের ব্যবস্থা করিতে না পারিলে কিসের তোমার চিকিৎসা-নৈপুণ্য! এখন আমার গতি কি হবে, বলিয়া দাও।

বিশ্বম্ভর মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, সাধুর রক্তে পাপীর পাপ-প্রায়শ্চিত্ত হয় শুনিয়াছি; তাই আজ নিত্যানন্দের রক্তপাতে পাপী দুইটা উদ্ধার হইতেছে। প্রকাশ্যে মাধাইকে বলিলেন, তুমি নিত্যানন্দ স্থানে অপরাধী, তিনি ভিন্ন তোমার পাপ ক্ষমা করিতে কাহারও সাধ্য নাই।

"প্রভু বলে অপরাধ কৈলে তুমি বড়;
নিত্যানন্দ চরণ ধরিয়া তুমি পড়।"

মাধাই তখন কাঁদিতে কাঁদিতে নিত্যানন্দের চরণে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল।

"বিশ্বম্ভর বলে শুন নিত্যানন্দ রায়;
চরণে পড়িল কৃপা করিতে যুয়ায়।
তোমার অঙ্গেতে যেন কৈল রক্তপাত;
তুমি সে ক্ষমিতে পার পড়িল তোমাত।"

উদার প্রেমিক নিতাই হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, এই তো কথা!

"কোন জন্মে থাকে যদি আমার সুকৃত,
সব দিলাম মাধাইরে শুনহ নিশ্চিত।
মোর স্থানে অপরাধ কিছু দায় নাই,
মায়া ছাড় কৃপা কর তোমার মাধাই।"

বিশ্বম্ভর বলিলেন, আচ্ছা! নিতাই তবে মার খেতে খেতে যে আলিঙ্গনটা দিতে গিয়েছিলে, সেটা আর বাকি থাকে কেন? যদি, হলো তো ভাল করাই হউক। "সে তো অনেক দিন হয়ে গিয়েছে!" এই বলিতে বলিতে নিত্যানন্দ অনুতপ্ত মাধাইকে কোলে করিয়া লইলেন। সাধু দেহ সংস্পর্শে মাধাইর দিব্যজ্ঞান লাভ হইল। তখন পাপী দুইজন কাঁদিতে কাঁদিতে গৌর নিতাইয়ের স্তব করিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর বলিলেন "শুন জগাই মাধাই! আর তোমরা পাপ করিও না।"

তাহারা অনুতাপের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিল "বাপ! আবার?"

"প্রভু বলে তোরা আর না করিস্ পাপ!
জগাই মাধাই বলে আর নারে বাপ।"

বিশ্বম্ভর পুনরায় তাহাদের সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—"শুন! তোমরা যদি আর পাপ পথে গমন না কর, তাহা হইলে তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের কলুষ রাশি কৃষ্ণ মার্জ্জনা করিয়া পরম মঙ্গল করিবেন, তোমাদের দেহে নিত্য বিরাজ করিবেন; এবং পূর্ব্বে তোমাদের স্পর্শে যাঁহারা গঙ্গাস্নান করিয়াছেন, এখন তোমাদের

অঙ্গ স্পর্শে, তাঁহারা গঙ্গা স্পর্শের ন্যায় পুণ্য মনে করিবেন। ভক্তের ইচ্ছা কখন বিফল হইবার নহে; নিত্যানন্দের অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ হইবে।"

জগাই মাধাই গৌরের ঈদৃশ প্রেমপূর্ণ ভাষা শুনিয়া আনন্দে মোহ প্রাপ্ত হইল। তখন বিশ্বম্ভর ভক্তগণকে আদেশ করিলেন যে,সকলে এ দুই জনকে তুলিয়া আমার বাড়ীতে লইয়া চল। আজ এ দুই জনের সঙ্গে সংকীর্ত্তনে নাচিতে হইবে।" ভক্তগণ তাহাই করিলে গৌরচন্দ্র সদলে গৃহাভিমুখে গমন করিলেন এবং বহির্দ্বার বন্ধ করিয়া বৈষ্ণব দল লইয়া মহা সংকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। যে সকল লোক রাজপথে এই ব্যাপার দেখিতেছিল, তাহারা অবাক্ হইয়া গেল। অচির কাল মধ্যেই নগরে রাষ্ট হইয়া পড়িল যে, নিমাই পণ্ডিত দুর্দ্ধর্ষ জগাই মাধাইকে সাধু করিয়াছে। ইহাতে পাষণ্ডীদিগের অহঙ্কার চূর্ণ হইল ও নিমাইয়ের প্রতি লোকের ভক্তি শ্রদ্ধা আকৃষ্ট হইল।

জগাই মাধাইয়ের গলা ধরিয়া অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনে মাতামাতি হইলে, গৌরের প্রেমভক্তির জীবন্ত আবির্ভাব দেখিয়া পাপী দুই জন একেবারে গলিয়া গেল, এক দণ্ডে নরক হইতে স্বর্গে উঠিয়া পড়িল, কত প্রকার দৈন্য করিয়া পাপের জন্য অনুশোচনা করিতে লাগিল এবং অশেষ প্রকারে নিতাই গৌরের স্তুতি বন্দনা করিল। কীর্ত্তনান্তে বিশ্বম্ভর সকল বৈষ্ণবগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোমাদের যাঁহার নিকট এ দুই জন যত অপরাধ করিয়াছে, তোমরা কায়মনোবাক্যে তাহা মার্জ্জনা করিয়া ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হও; আর আজ হইতে কেহ ইহাদিগকে মদ্যপ কি পাপী বলিয়া ঘৃণা করিতে পারিবে না; ইহাদের শরীরে আর পাপ নাই: তোমরা সকলে ইহাদিগকে আপন কনিষ্ঠ সহোদরের ন্যায় দেখিবে, ও শ্রদ্ধা পূর্ব্বক আহার দিবে। যদি কখন কেহ ইহাদিগকে পরিহাস করে, আমি বলিতেছি, নিশ্চয়ই তাহার সর্ব্বনাশ হইবে।"

"এ দুইয়েরে পাপী হেন না করিবে মনে,
এ দুইয়ের পাপ মুই লইনু আপনে।
ইহা জানি এ দুয়েরে সকল বৈষ্ণব,
দেখিবে অভেদ দৃষ্টে যেন তুমি সব।
শুন এই আজ্ঞা মোর; যে হয় আমার,
এ দুয়েরে শ্রদ্ধা করি যে দিবে আহার।
"অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে যত মধু আছে;
যে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে।
এ দুয়েরে বটমাত্র দিবে যেই জন;
তাহার কৃষ্ণের মুখে মধু সমর্পণ।
এ দুই জনেরে যে করিবে পরিহাস।
এ দুইয়ের অপরাধে তার সর্ব্বনাশ।"

প্রভুর আজ্ঞায় বৈষ্ণবগণ তখন মহানন্দে জগাই মাধাই ও একে একে প্রত্যেকের চরণ তলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে চরণ ধূলি লইতে লাগিল এবং সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সকলে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিলেন।—

"প্রভু বলে এ দুই মদ্যপ নহে আর;
আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার।
সবে মিলি অনুগ্রহ কর এ দুয়েরে,
জন্মে জন্মে আর যেন কৃষ্ণ না পাশরে।
যেরূপে যাহার ঠাঁই আছে অপরাধ;
ক্ষমিয়া এদের প্রতি করহ প্রসাদ।
শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই মাধাই;
সবার চরণ ধরি পড়ে, সেই ঠাঁই।
সর্ব্ব মহাভাগবতে কৈল আশীর্ব্বাদ;
জগাই মাধাই হৈল নির-অপরাধ।"

গৌরচন্দ্র তখন সেই গভীর রজনীযোগে

ভক্তদল লইয়া গঙ্গাস্নান করিতে চলিলেন, এবং গঙ্গার প্রসন্ন জল মধ্যে অঙ্গমার্জ্জন ও শিশু বালকের ন্যায় পরস্পর জলকেলি ও সন্তরণ করিয়া সকলকে মাল্যচন্দন পরাইয়া বিদায় দিলেন। জগাই মাধাই ইহার আগে কত দিন গঙ্গাস্নান করিয়াছিল; কিন্তু আজিকার ন্যায় তাঁহারা গঙ্গাজল একদিনও শীতল ও পবিত্র বলিয়া অনুভব করিতে পারে নাই। আজি যেন আকাশে চন্দ্র মধুধারা বর্ষণ করিতেছিল, এবং প্রকৃতির ছবিতেও সুধা মাখান ছিল। সত্য সত্যই আজ তাহারা জলাভিষিক্ত হইল স্নানান্তে। বিশ্বম্ভর নিজ হস্তে তাহাদের মাল্য চন্দন পরাইয়া দিলেন। সে রাত্রি মাধাই ভক্তদিগের আলয়েই যাপন করিলেন।

জগাই মাধাই সেই অবধি সাধু সঙ্গে বাস করিতে লাগিল এবং কঠোর সাধনব্রত গ্রহণ করিয়া তাহাতেই সমস্তদিন অতিবাহিত করিতে লাগিল। অল্প দিন মধ্যেই তাহারা সাধনায় কৃতকার্য্য হইয়া পরম ধার্ম্মিক বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে পারিল। তাহাদের দৈনিক সাধনের নিয়ম এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

"উষাকালে গঙ্গাস্নান করিয়া নির্জ্জনে
দুই লক্ষ হরিনাম লয় প্রতিদিনে।
আপনারে ধিক্কার করয়ে অনুক্ষণ;
নিরবধি কৃষ্ণ বলি করয়ে ক্রন্দন।
পাইয়া কৃষ্ণের তত্ত্ব পরম উদার;
কৃষ্ণেরে সুজন দেখে সকল সংসার।
পূর্ব্বে যে করিল হিংসা তাহা সঙরিয়া;
কাঁদিয়া ভূমিতে পরে মূর্চ্ছিত হইয়া।
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে,
সঙরি চৈতন্য কৃপা দুইজন কাঁদে।
সর্ব্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বম্ভর;
অনুগ্রহ আশ্বাস করয়ে নিরন্তর।
আপনি বসিয়া প্রভু ভোজন করায়;
তথাপিও দোঁহে চিত্তে সোয়াথ না পায়।"

মাধাই নিত্যানন্দকে যে প্রকার করিয়াছিল, তাহার জন্য সে নিরন্তর অনুতাপ ও ক্রন্দন করিত। নিতাই যদিও সে অপ... গ্রহ করেন নাই; কিন্তু মাধাইয়ের তাহাতে চিত্তে শান্তি হইত না। ইহার জন্য সে থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া উঠিত ও কখন কখন ছুটিয়া নিত্যানন্দের নিকট যাইয়া ক্রন্দন করিত। এক দিন নির্জ্জনে নিতাইয়ের দেখা পাইয়া সে আকুল নয়নে কাঁদিতে লাগিল ও অশেষ প্রকারে নিতাইয়ের স্তুতি করিতে লাগিল। মার খাইয়া যে প্রেম দিতে পারে, তাঁহাকে সে তাঁর সামান্য মানুষ জ্ঞান করিতে পারিল না। নিতাই বলিলেন—'মাধাই' তুমি আমার পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়, পুত্র মারিলে কি পিতার তাহাতে ব্যথা লাগে?
"শিশু পুত্র মারিলে কি বাপ দুঃখ পায়,
এই মত তোমার প্রহার মোর গায়।"

তখন মাধাই বলিল, প্রভো, যদি আমায় এত দয়া করিলেন, তবে আমাকে আ... একটী উপদেশ বলিয়া দিন্। আ... প্রাণীর হিংসা করিয়াছি, তাহাদের ... চিনি না, চিনিলে প্রত্যেকের চরণে ... ক্ষমা প্রার্থনা করিতাম, সেই ... অপরিচিত জনের সম্বন্ধে আমার অপ... কিসে যাইবে?

নিতাই ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহি... "ইহার জন্য চিন্তিত হইও না, এই ... নগরে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলে... স্নান করিয়া থাকেন, তুমি স্বহস্তে গঙ্গা...

ঘাটগুলি সুন্দররূপে পরিষ্কার করিয়া রাখিবে। যেন সকলে অনায়াসে ঘাটে বসিয়া স্নান করিতে পারেন, এবং যাঁহারা স্নানে আসিবেন, তাঁহাদের সকলকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া দৈন্যভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। এই পর-সেবাতেই তোমার সকল পাপ অন্তর্হিত হইবে :—

"প্রভু বলে কবি শুন তোমার উপায়,
গঙ্গা ঘাট সজ্জা তুমি করহ সদায়।
সুখে লোক যখন করিবে গঙ্গা স্নান,
তখন তোমারে সবে করিবে কল্যাণ।
কাকু করি সবারে করিবে নমস্কার ;
ইথে সবে অপরাধ ক্ষমিবে তোমার।"

মাধাই আর বাক্য ব্যয় না করিয়া নিত্যানন্দকে প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সেবায় ব্রতী হইল। স্বহস্তে কোদালি লইয়া সে ঘাটে ঘাটে ঘাট পরিষ্কার করিতে লাগিল এবং যাহাকে দেখে কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় অপরাধের কথা বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল। মহাত্মা মাধাই গঙ্গাতীরে এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিল। যেখানে ভাগ্যবান মাধাই তপস্যা করিত, এখনও লোকে তাহাকে মাধাইয়ের ঘাট বলে।

"উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণে,
চলিল প্রভুরে করি বহু প্রদক্ষিণে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে নয়নে পড়ে জল ;
গঙ্গাঘাট সজ্জা করে দেখয়ে সকল।
লোক দেখি করে বড় অপূর্ব্ব গেয়ান ;
সবারে মাধাই করে দণ্ড পরণাম।
"জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈনু অপরাধ ;
সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ।
মাধইর ক্রন্দনে কাঁদয়ে সর্ব্বজন।
আনন্দে গোবিন্দ সবে করয়ে স্মরণ।
পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই ;
ব্রহ্মচারী হেন খ্যাতি হইল তথাই।
নিরবধি গঙ্গা দেখে, থাকে গঙ্গাঘাটে।
স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনিই খাটে।
অদ্যাপিও চিহ্ন আছে চৈতন্য কৃপায় ;
মাধাইর ঘাট বলি সর্ব্ব লোকে গায়।"

এদিকে গ্রামের মধ্যে একটা মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লোকে বলিতে লাগিল, যে এ দুই মহাপাপীকে সচ্চরিত্র সাধু করিতে পারে, সে কখনই সামান্য মানুষ নহে। পাষণ্ডীদিগের মস্তক অবনত হইল : এবং লোকে বিশ্বম্ভরের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। আর জগাই মাধাই নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের প্রেমের কীর্ত্তিস্তম্ভ রূপে বিরাজ করিতে লাগিল।

"শুনিল সকল লোক নিমাই পণ্ডিত,
জগাই মাধাইরে কৈল উত্তম চরিত।
শুনিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত ;
সবে বলে নর নহে নিমাই পণ্ডিত।
না বুঝি নিন্দয়ে যত সকল দুর্জ্জন,
নিমাই পণ্ডিত সত্য করয়ে কীর্ত্তন।
নিমাই পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস,
নষ্ট হবে যে তাঁরে করিবে উপহাস।
এ দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে,
সেই বা ঈশ্বর কি ঈশ্বর শক্তি ধরে।
এই মত সৎকীর্ত্তি হইল দোঁহার।
চৈতন্য প্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার।"

চৈতন্য ভাগবত-গ্রন্থাবলম্বনে উপরি উক্ত ঘটনা বিবৃত হইল। চৈতন্য-মঙ্গলের বৃত্তান্ত ইহা অপেক্ষা কিছু বিভিন্ন। চৈতন্য-মঙ্গলকার লোচন দাস বলেন যে, যে দিন শ্রীগৌরাঙ্গ স্বদলে নগর সংকীর্ত্তন করিতে বাহির হইয়াছিলেন, সেই সময় সংকীর্ত্তন মধ্যস্থিত নিত্যানন্দের মস্তকে মাধাই কলসীর

মুটকী প্রহার করিয়াছিল! নিত্যানন্দ তাহাতে কোপ করা দূরে থাকুক, ক্রুদ্ধ গৌরচন্দ্রকে সান্ত্বনা করিয়া পাপীদিগকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পরে সংকীর্ত্তনের দল চলিয়া গেলে জগাই মাধাই অনুতপ্ত হৃদয়ে বিশ্বম্ভরের আলয়ে যাইয়া কাঁদিয়া পড়িয়াছিল, তখন গৌরসুন্দর তাহাদিগকে গঙ্গাতীরে লইয়া গিয়া গঙ্গাজল ও তুলসী সংযোগে তাহাদিগের পাপ উৎসর্গ করাইয়া নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাপী দুই জন নবজীবন লাভ করিল। পাপের অসারত্ব প্রতিপন্ন হইল, পুণ্য প্রেম-ভক্তির জীবন্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইল, এবং জগতের সকল পাপীর নিকটে আশাপ্রদ সুমঙ্গল সমাচার প্রচারিত হইল। ধন্য বিচিত্রকর্ম্মা ভগবন্! তুমিই ধন্য।

শ্রীজগদীশ্বর গুপ্ত।

ফুলরেণু।

(অন্ধকার)

হৃদয়ের এক মাত্র তুমি প্রতিকৃতি,
দুঃখীর কেবল মাত্র তুমিই সম্বল,
অতীতের একমাত্র তুমি আছ স্মৃতি,
লইয়া সে সুখ দুঃখ হাসি অশ্রুজল!
সেই মান অভিমান তাহার পীরিতি,
তোমারি—তোমারি চেয়ে গাঢ় অন্ধকার,
নিবিয়াছে চন্দ্র সূর্য্য, ডুবিয়াছে ক্ষিতি,
গ্রাসিয়াছে একেবারে সমস্ত সংসার!
ক'রেছে তোমারি চেয়ে এত আত্মসাৎ,
ক'রেছে তোমারি চেয়ে এত আপনার,
চিনি না আমারে আমি তার কি আমার!
পারিনা আমারে আর করিতে তফাৎ!
কে ছিলাম আমি আগে, কেবা ছিল সেই,
জীবিত দু'জনে আজ কেবা আমি এই!

(আমার)

যে দিন প্রথম দেখা—প্রথম মিলন,
কত কথা ব'লেছিলে ধরিয়া গলায়,
একটুকু অবশিষ্ট না রাখিয়া মন,
সমস্ত ঢালিয়া দিলে স্নেহ মমতায়!
কত যে সুদীর্ঘ শ্বাস, কত যে চুম্বন,
বুক ভাসাইয়া দিলে কত অশ্রুজল!
হৃদয় ভরিয়া দিলে তপ্ত আলিঙ্গন,
এখনো প্রাণের জ্বালা হয়নি শীতল!
তুমি'তো ভুলিয়া গে'ছ—কবে কোন্ দিন,
কাহারে দিতে কারে দি'ছ—হয়েছিল ভুল,
আমারো বুঝিতে ভুল হয়েছে সে দিন,
এখন বুঝিয়া প্রাণ হতেছে আকুল!
দু'জনে ক'রেছি ভুল,—শুধু কি আমার
সরলা! প্রাণের জ্বালা নাহি যাবে আর?

(নাই শুধু মন!)

প্রতিদিন ব'সে থাকি পথ পানে চেয়ে,
পাইব তোমার পত্র—আশার আশায়;
ডোবে কত রবি শশী অস্তাচলে যেয়ে,
একদিনো সরলারে নাহি পাওয়া যায়!
দিনান্তে নাহি কি পাও তিল অবসর,
মাসান্তে নাহি কি পাও মুহূর্ত্ত সময়?
লিখিতে একটী ছত্র—একটী অক্ষর,
মনে কর সময়ের এত অপব্যয়?
ছিল দিন—এক দিন—যে দিন তোমার,
সংসারের শতকার্য্য—শত ব্যস্ততায়,

কত চুম্ব আলিঙ্গন কত অশ্রুধার,
কত পত্রে কত ছত্রে পাইয়াছি হায়!
সেই তুমি, সেই আমি,—সেই দুই জন!
তেমনি সময় আছে—নাই শুধু মন!

(রমণীর মন)

রমণীর মন—
কি যে ইন্দ্রজালে আঁকা, কি যে ইন্দ্রধনু ঢাকা
কামনা কোয়াসা মাখা মোহ আবরণ,
কি যে সে মোহিনী মন্ত্র রয়েছে গোপন!
কি যে সে অক্ষর দু'টী, নীলনেত্রে আছে ফুটি,
ত্রিভুবনে কার সাধ্য করে অধ্যয়ন?
কত চেষ্টা যত্ন করি, উলটি পালটি পড়ি,
কিছুতে পারিনা অর্থ করিতে গ্রহণ!
কি যে সে অজ্ঞাত ভাষা, দেব কি দৈত্যের আশা
ঝলকে ঝলকে যেন করে উদ্গীরণ!
অতি ক্ষুদ্র দুই বিন্দু, অকূল অসীম সিন্ধু,
উথলি উঠিছে তাহে প্রলয় প্লাবন!
ত্রিদিবের সুধা নিয়া, ধরণীর ধূলা দিয়া
রসাতল নিঙ্গাড়িয়া করিয়া মিলন।
ঢালিয়াছে কত ছাঁচ, মৃত্তিকা কাঞ্চন কাচে
পারিনি তেমন আর করিতে গঠন,
রমণীর মন!!!

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র দাস।

প্রবাসীর পত্র।

সময়ের গতি অনিবার্য্য, অবিশ্রাম। সময়ের স্রোতে কত মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে, প্রহরের পর প্রহর, দিবসের পর দিবস, বর্ষের পর বর্ষ, যুগের পর যুগ ভাসিয়া যাইতেছে,—ক্ষুদ্র-হৃদয় মানবের সাধ্য কি তাহার ইয়ত্তা করে? তরঙ্গ-সঙ্গিনীকূল-কূল-নাদিনী স্রোতস্বিনী অবিচলিত তরঙ্গে তরঙ্গায়িতা, অবিরাম প্রবাহে প্রবহমানা;—ঘটনা-বৈচিত্র্যময় সময় ও বিঘ্ন বাধা না মানিয়া সংসারক্ষেত্রে বিবর্ত্তন-চক্রে অনিবার বিঘূর্ণিত, সমদর্পে সমান বেগে অনন্তের পথে ধাবমান। সময়ের গতির সঙ্গে, ঘটনার বিচিত্রতার সঙ্গে আজি আমার ক্ষুদ্র জীবলীলারও অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। চিরদিন যাহাদের সঙ্গে রস-তরঙ্গে বিভোর ছিলাম, চিরদিন যে স্থান আনন্দ-নিকেতন প্রীতি-ভূমি বোধ হইত, চিরদিন যে আচার-ব্যবহার রীতি-নীতি প্রকৃতির সঙ্গে অনুপ্রাণিত হইয়াছিল—আজি সেই সঙ্গ, সেই স্থান, সেই পদ্ধতি পরিহার করিয়া ভিন্ন মার্গ আশ্রয় করিতে হইয়াছে। জানি আমি—এত দিন "কূপমণ্ডূক" ছিলাম, সেই কূপই আমার সারাৎসার শান্তি স্থল বোধ হইত, কূপের বাহিরে সংসারের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিতাম না, ভিন্ন প্রকৃতির সংঘর্ষে আসিয়া জগতের অভিজ্ঞতা লাভ করিতে জানিতাম না। সাহস সহিষ্ণুতা অধ্যবসায় ব্যতিরেকে জীবনের উন্নতি হয় না—ইংরাজ স্বদেশে স্বজাতি ত্যাগ করিয়া 'সাত-সমুদ্র-তের-নদী' পারে কোথায় আসিয়াছেন, আমাদিগের মধ্যেও উন্নতিশীল সম্প্রদায় অধ্যয়ন, পরিভ্রমণ সন্তান-ইংরেজীকরণ (British-born subjects.) প্রভৃতি সদুদ্দেশ্য সংসাধনের জন্য কত দেশ-দেশান্তরে যাইতেছেন; কিন্তু তথাপি মন প্রবোধ মানে না, অতীতের স্মৃতি ছাড়িতে চাহে না,

প্রকৃতি সহজে নবীন সংসর্গে মিলিতে অগ্রসর হয় না। বহুদিন মিলিনের পর যে বিরহ সহিয়াছে, প্রাণের প্রাণ মনের মন যে একবার হারাইয়াছে, অতীতের সুখ-কল্পনা যাহাকে একবার পাগল করিয়াছে, সেই বুঝিবে এই পরিবর্ত্তনের কি যন্ত্রণা, সেই জানিবে, এই নব অনুরাগেও পূর্ব্বস্মৃতি কি দারুণ মর্ম্মপীড়ক।—উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকই যথার্থ বুঝিয়াছিলেন "সেই মুখখানির" কি মূল্য—"ভুক্তভোগী জনে জ্ঞাত, অন্যে জ্ঞাত কদাচন।"

এই পরিবর্ত্তনের মূলে দাসত্বের দৃঢ় দণ্ড অন্তর্নিবিদ্ধ। সেই দণ্ড ভয়েই প্রাণের অধিকতর ব্যাকুলতা। আমরা পরাধীন ভগ্নোৎসাহী জাতি, দাসত্বের পন্থা ব্যতীত জীবনোপায়ের গত্যন্তর বুঝি না,—আশ্রিত সদাভীত—সেই ভীতিবিহ্বল হৃদয়ে পরপদ-সেবা ভিন্ন সার কর্ম্ম চিনি না, চিনিতে চেষ্টাও করি না। একবার ভাবিলাম, এই দাসত্বের অনুরোধে মনের বিরোধে আর প্রবাসে যাইব না, ভিক্ষা সার করিয়াও জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব—তথাপি দুশ্চিন্তার স্রোতে অঙ্গ ঢালিব না, নব প্রেমে নব সংসর্গে মিশিব না, সেই 'এক পুরাতনেই' অনুরাগী থাকিব। কিন্তু সে অনুরাগে নির্ব্বিকল্পতা নাই, আমি গৃহী, আমি সংসারী, আমি ঘোর পাপী, আমার চিত্তবৃত্তি সদাই চঞ্চল, আমার মনের দৃঢ়তা নাই, সেই নিত্য-পদার্থে সম্যক্ আত্মবিসর্জ্জন করিতে শিখি নাই—মন টলিল, কে যেন নিঃশব্দপদসঞ্চারে কর্ণকুহরে বলিল, "ভাই! তোমার কি স্মরণ নাই?—

মাতা নিন্দতি, নাভিনন্দতি পিতা, ভ্রাতা ন সম্ভাষতে,
ভৃত্যঃ কুপ্যতি, নানুগচ্ছতি সুতঃ, কান্তা চ নালিঙ্গতে।
অর্থ-প্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতে কুরুতেপ্যালাপমাত্রংসুহৃৎ তস্মাদর্থ মুপার্জ্জয়স্বচ সখে! হ্যর্থস্য সর্ব্বে বশাঃ।"

ভাবিলাম, সত্যই ত, এখন যাহারা আমাকে সোহাগের পুতুল করিয়া যত্ন করিতেছে, আমার সুখে দুঃখে সহানুভূতি দেখাইতেছে, কাল অর্থশূন্য হইল আর তাহারা আমার প্রতি চাহিয়াও দেখিবে না, আমার কষ্টের দীর্ঘশ্বাসে একবিন্দু অশ্রু মিশাইবে না। সুতরাং অর্থকরী দাসত্বের পথে, পরিবর্ত্তনের মুখে, অগ্রসর হওয়াই বিধি। চিন্তার উপর চিন্তা বাড়িল—এক দিকে প্রিয়জন-বিরহের চিন্তা, অন্যদিকে জীবনোপায়ের চিন্তা—চিন্তার ঘাত প্রতিঘাতে ক্ষুদ্র হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল, কিংকর্ত্তব্য অবধারণে অক্ষম হইয়া নীরবে রোদন করিতে থাকিলাম। এমন সময়ে কোন শ্রদ্ধাস্পদ বন্ধু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আদিষ্ট দুর্ব্বলের মহামন্ত্র আমার কর্ণে প্রবেশ করাইয়া দিলেন।

"বর্দ্ধিতা বর্দ্ধতে চিন্তা ত্যক্ত্বা নশ্যতি সত্বরং।
ঈদৃশেনাপি রোগেন দুর্ধীয়ঃ মরণং গতাঃ॥"

"চিন্তা (শোক ভয়) বৃদ্ধি করিলেই বর্দ্ধিত হয়, (জ্ঞান শক্তির দ্বারা) ত্যাগ করিলেই সত্বরে বিনষ্ট হয়। এমন (দুর্ব্বল বস্তু) চিন্তা-রোগে দুর্ব্বুদ্ধি লোক মরিতেছে। ভাই, মনকে সতেজ কর—মনই মনুষ্যের সুখ দুঃখের হেতু, কাতর হইও না, ঈশ্বর সঙ্গে আছেন, তুমি একা নহ, ভয় কি?"—আমার জ্ঞান-চক্ষু ফুটিল, ভগ্নপ্রাণেও ক্ষণিক নির্ভীকতার ছায়া পড়িল, বুক বাঁধিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলাম,—

আত্মীয়, বন্ধু, প্রিয় পরিজনের নিকট বিদায় লইয়া, একবার প্রেমগদ্গদ ভাবে সকলের সঙ্গে আলাপ আলিঙ্গন করিয়া,একবার উদাস-প্রাণে পরস্পর প্রেমাশ্রু বিনিময় করিয়া, বহুকালের লীলাভূমি পরিত্যাগ করিলাম।

ইংরাজ রাজের অনুগ্রহে বাষ্পরথা-রোহণে কত নদ-নদী অতিক্রম করিয়া, কত পাহাড় পর্ব্বত ভেদ করিয়া, কত ত্রিপ্রান্তর মাঠ দূরে ফেলিয়া, গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকিলাম। বিহার, বাঁকুড়া বর্দ্ধমান পশ্চাতে রাখিয়া ক্রমশঃ পূর্ব্ব-ভারত ও পূর্ব্ব-বঙ্গ রেলপথের সঙ্গমস্থলে আসিয়া পৌঁছিলাম। মধ্যে ‘একা নদী বিশ ক্রোশ’ পূর্ব্বে আরোহীবর্গকে নৌকাযোগে এই নদী পার হইতে হইত, এখন মাননীয় লেসলী বাহাদুরের অনুগ্রহে যাত্রীর আর সে কষ্ট নাই, বাষ্পরথারোহণে অনায়াসে ভাগীরথীর বক্ষের উপর দিয়া যাইতেছে। ভাগীরথীর এখন আর সে প্রতাপ নাই, সে তরঙ্গ-তেজের আস্ফালন নাই,—থাকিলেও যাত্রী তাহাতে দৃকপাত করে না; তিনি এখন লৌহ-নিগড়ে আবদ্ধা, বাষ্পরথের ঘর্ঘর ধ্বনি তাঁহার সে কলধ্বনি ভেদ করিয়া উঠিয়াছে, তিনি এখন কেবল আকুল প্রাণে কুল-কুল-তানে ক্রন্দন করিতেছেন, এক একবার প্রাণের যাতনায় তটের গায় আছড়াইয়া পড়িতেছেন। কাঁদ মা কাঁদ, এখন আর ক্রন্দন ভিন্ন তোমার অন্যবিধি কি?—“পরাধীন বন্দীভাবে র’য়েছ কখন!”

পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথে যাইতে ভয় করে, সদাই বিপদের আশঙ্কা,—সেই আড়ং-ঘাটার কীর্ত্তি স্মরণ হইল, প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, যাই কি না যাই অগ্রপশ্চাৎ খেলিতে লাগিলাম, ক্রমে Darjiling Mail আসিয়া পৌঁছিল, অগত্যা অনিচ্ছাতেও উঠিলাম, বিপদ-ভয়-বারিণীর নাম স্মরণ করিয়া নিঃশব্দে চলিলাম। ভাগ্যক্রমে, দুর্গতিনাশিনীর কৃপায়, কোন দুর্গতি ঘটিল না, পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়িয়া, পদ্মা পার হইয়া, উত্তরবঙ্গ পৌঁছিলাম। আসামের পথ বড় দুর্গম, ইংরাজরাজের সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও নানাস্থানে উঠা নামার যন্ত্রণা বিদূরিত হয় নাই। এই রূপ দুই তিন স্থানে উঠা নামার পর উত্তর বঙ্গ রেল-পথের আসাম প্রান্তস্থ শেষ সীমা যাত্রা-পুরে পৌঁছিলাম। সম্মুখে ব্রহ্মপুত্র ধীর গম্ভীর ভাবে প্রবাহিত—রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টিমার তীরে সংলগ্ন, রথ ছাড়িয়া পোতে উঠিলাম। পূর্ব্বে আসামের চা-বাগিচার জন্য কুলী-চালানের কথা শুনিয়া-ছিলাম, কাউনিয়া হইতে সেই অন্তর্ভেদী দৃশ্য সম্মুখে দেখিলাম। অগত্যা কুলী পশুপালের মত চলিয়াছে, সঙ্গে যমদূত-বিশেষ রক্ষকগণ বেত্রহস্তে ভ্রাম্যমান, সামান্য বা বিনা কারণে কুলীদিগের উপর অজস্র বেত্রবৃষ্টি করিতেছে; দলের মধ্যে বিসূচিকার ভীষণ প্রকোপ,—প্রাণ থাকি-তেই কত জননীর অঞ্চলের নিধি, কত স্ত্রীর জীবন-সর্ব্বস্ব স্বামী, কত ভগ্নীর ভ্রাতা, কত পুত্রের পিতাকে অঞ্চল হইতে কাড়িয়া পথে বিসর্জ্জন দিয়া যাইতেছে। এ দৃশ্য দেখিলে ঘোর পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রব হয়। আমার সহযাত্রী একজন সাহেব স্বয়ং কুলী-সংগ্রাহক (recruiter) হইয়াও বলিলেন,—**most pitiable sight, indeed**; পরিচয়ে বুঝিলাম, তিনি এ কার্য্যে এই প্রথম ব্রতী। পথে ধুবড়িতে এক দিন বিশ্রাম করিয়াছিলাম; এই স্থানেই এই

পরিণাম-বোধ-শূন্য, ব্যাধ-মন্ত্র-মুগ্ধ, সরল প্রাণ কুলীগণকে দাসখতে আবদ্ধ করিবার রঙ্গভূমি। এখানকার অভিনয় বড় চমৎকার। আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সমস্ত কুলীগণকে নূতন বস্ত্র, গাত্রাচ্ছাদন, পানাহারের তৈজসাদি এবং দুই সন্ধ্যা আহার দেওয়া হয়। যাত্রাপুর হইতে কুলী-বোঝাই ষ্টীমার প্রায়ই সন্ধ্যাকালে ধুবড়ি পৌঁছিয়া থাকে; সে রাত্রি তাহারা সেই স্থানে যাপন করে, পর দিবস প্রাতঃকালে তাহাদিগের দাসখতের বন্দোবস্ত হয়। অর্দ্ধ ঘণ্টা বা তন্ন্যূন সময়ের মধ্যে পাঁচ ছয় শত কুলীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা পূর্ব্বক তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া দাসখতের মন্ত্রপাঠ করান হয়। গয়াতীর্থে ফল্গু তীরে শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ দেখিয়া কতক বিস্মিত হইয়াছিলাম, এখানকার মন্ত্রপাঠ ততোধিক বিস্ময়জনক; সেখানে অর্থলোভী হীনস্বভাব ব্রাহ্মণগণ নগণ্য ইতরজাতীয় পাঁচ ছয় জন যাত্রীকে এক কালে শ্রাদ্ধের মন্ত্রপাঠ করায়;—এখানকার উচ্চপদারূঢ় ন্যায়বান পাশ্চাত্য পুরোহিত এককালে পাঁচ ছয় শত প্রাণীর দাসখতের মন্ত্রপাঠ সম্পাদন করেন। শ্রেণীর সম্মুখে সেই বেত্রধারী ভোজপুরী রক্ষকগণ দণ্ডায়মান থাকেন—চা-বাগিচার প্রভুদিগের প্রীত্যর্থে ইঁহারা আপন গৃহের গৃহলক্ষ্মীদিগকেও বাগানে পাঠাইতে কুণ্ঠিত নহেন—ইঁহারাই বিকট চীৎকারে সেই মহামন্ত্র পাঠ করেন, পশ্চাদ্বর্ত্তী কুলীগণ কেহ কেহ ঐ কলরবে যোগ দেয়, কি যে বলে, কিছুই বুঝা যায়না, হাঁ—না একই অর্থে গৃহীত হইয়া তাহারা সকলেই দাসখতে আবদ্ধ হয়। ছয় মিনিটের মধ্যে ছয়টী উত্তর প্রত্যুত্তরের দ্বারা এই অভিনয় শেষ হইয়া থাকে। এই মর্ম্মভেদী ব্যাপার চক্ষে দেখিয়া একবার নীরবে রোদন করিলাম, আর বায়ুর সঙ্গে দীর্ঘ-শ্বাস মিলাইয়া একবার অস্ফুট স্বরে বলিলাম—ভাই, "চির দাসখতে সমুদায় দিলে!"

ধুবড়ি হইতে আবার সেই ব্রহ্মপুত্র বক্ষে বাষ্পপোত আরোহণ করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। অগাধ-সলিল ব্রহ্মপুত্র আপন গৌরবে আসামের সমস্ত উপত্যকা-ভূমি বিধৌত করিয়া প্রবাহিত হইযাছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কলিকাতা হইতে আগমন কালে আসামের প্রথম সীমা যাত্রাপুর হইতে এই কল-কল-নাদী অনন্তকাল প্রবাহমান মহানদের অবিচলিত তরঙ্গ শোভা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার সে গৌরব হিন্দুর চক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর; তাঁহার জল হিন্দুর দৃষ্টিতে চিরদিন অপবিত্র, কেবল বৎসরের মধ্যে এক দিন—বাসন্তী মহাষ্টমীর দিন ইহাতে স্নান প্রসিদ্ধ, সেই স্নানে হিন্দুর সর্ব্ব পাপ বিনষ্ট হয়, স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হয়। শুনা যায়, ঐ দিবস মাতৃঘাতী পরশুরামের কুঠার তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। ব্রহ্মপুত্রোদকের অপবিত্রতা সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে;—ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নিঃসৃত হইয়া ব্রহ্মপুত্র যখন আপন বিক্রমে বহিয়া যাইতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে পরশুরামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়; পরশুরাম তাঁহাকে সেই স্থানে অপেক্ষা করিতে আদেশ করেন এবং বলেন "তুমি আর অগ্রসর হইও না, আমি তপস্যা করিয়া তোমার কীর্ত্তি জগতে অক্ষয় করিব, তোমার জল পরম পবিত্র দেববাঞ্ছিত হইবে, তোমার

জলে অবগাহন করিয়া লোকে মর্ত্ত্যধামে অমরত্ব লাভ করিবে।" ব্রহ্মপুত্র সেই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন, পরশুরামও প্রতিজ্ঞামত তপস্যা করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ক্রমাগত সহস্র বর্ষ-কাল ব্রহ্মপুত্র এইরূপে সে স্থানে অপেক্ষা করেন, তথাপি পরশুরামের প্রত্যাগমন সন্দর্শন না করিয়া তিনি তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিষয়ে সন্দিহান হইলেন। ও দিকে নবযৌবন-সম্পন্না যমুনা অদূরে নব রঙ্গভরে বহিয়া যাইতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রতি বিলাস কটাক্ষপাত করিতেছিলেন; যৌবন-মদান্ধ ব্রহ্মপুত্র আর ধৈর্য্য ধরিতে না পারিয়া তীব্রবেগে বহিয়া যমুনার সহিত মিলিত হইলেন। কিয়দ্দিন পরে পরশুরাম তপস্যাবলে আপন অভীপ্সিত কামনা সিদ্ধ করিয়া নির্দ্দিষ্টস্থানে ব্রহ্মপুত্র সমীপে তাঁহার প্রতিজ্ঞা পূরণ অভিপ্রায়ে সমাগত হইলেন; তথায় ব্রহ্মপুত্রকে না দেখিয়া তিনি অগ্রগমন পূর্ব্বক ব্রহ্মপুত্রের অবস্থান্তর বুঝিতে পারিলেন। তখন ক্রোধাবিষ্ট হইয়া তিনি ব্রহ্মপুত্রকে অভিসম্পাত পূর্ব্বক কহিলেন "তুই যেরূপ কামমোহান্ধ হইয়া আমার আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছিস্, তোর জল কুক্কুরের প্রস্রাব অপেক্ষাও হেয় হইবে।" ব্রহ্মপুত্র এই নিদারুণ অভিসম্পাতে নিতান্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া পরশুরামের বিস্তর স্তব আরাধনা করিতে লাগিলেন; তখন পরশুরাম কথঞ্চিত ক্রোধ সম্বরণ পূর্ব্বক, যে দিন তাঁহার হস্ত হইতে মাতৃহন্ত কুঠার ব্রহ্মকুণ্ডে পতিত হয়, কেবল সেই দিনের জন্য ব্রহ্মপুত্রোদকের পবিত্রতা বিধিবদ্ধ করিলেন। এই রূপকের অন্তরালে কি তত্ত্ব নিহিত আছে,তাহা পাঠকগণের বিবেচ্য।

ক্রমে ব্রহ্মপুত্র ত্যাগ করিয়া গৌহাটীর উপকূলে বাস্পপোত হইতে অবতরণ করিলাম। পুরাকালীন বিখ্যাত প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর অধুনা গৌহাটী নামে অভিহিত, ইহা এক সময়ে অহোমজাতির রাজপ্রতিনিধির এবং মগদিগের প্রভুত্ব কালে তাহাদিগের রাজ-পারিষদ ও সৈন্য সচিবদিগের বসতিস্থল ছিল। ইহা আসামের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান জনপদ কামরূপের রাজধানী। কামরূপ পূর্ব্বে চারিটী বিভাগে বিভক্ত ছিল — কামপীঠ, রত্নপীঠ, স্নুবর্ণপীঠ এবং সৌমরপীঠ এই চারিটী বিভাগের যেরূপ ভৌগোলিক সীমানির্দ্দেশ পাওয়া যায়, তাহাতে বোধ হয়, গৌহাটী স্বুবর্ণপীঠের সীমাভুক্ত। এই গৌহাটীতে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কামাখ্যাদেবীর মন্দির অধিষ্ঠিত। সহর হইতে ইহার ব্যবধান প্রায় তিন মাইল। প্রাচীন আখ্যায়িকা মতে কামাখ্যাদেবীর মন্দির কামপীঠের অংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু উপরি লিখিত সীমা নির্দ্দেশ অনুসারে উহা স্বুবর্ণপীঠের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বোধ হয়।

গৌহাটী হইতে পর্ব্বত-বিহারী অশ্ব-যান টোঙ্গা যোগে পর্ব্বতে উঠিতে থাকিলাম। ক্রমাগত ৬৩ মাইল এই টোঙ্গার আশ্রয়ে আসিয়া আসামের রাজধানী শিলঙে পৌছিলাম। ৮।১০ ঘণ্টার মধ্যে এই স্নুদীর্ঘ পথ আসা যায়। Planter's Stores and Agency Co. 'Ld' নামক কলিকাতাস্থ ব্যবসায়ী সম্প্রদায় পূর্ব্বে এই অশ্ব-যান পরিচালনের ঠিকাদার ছিলেন; সম্প্রতি শিলঙের প্রধান ব্যবসায়ী গোলাম হায়দার এবং তাঁহার পুত্রগণ ইহার অধ্যক্ষ হইয়াছেন। সাহেবদিগের সময়ে, শুনা যায়, কিছু স্বেচ্ছা-

চরিত্র ছিল, অধুনা এই মুসলমান সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষতায় এই সুদীর্ঘ পথে যাতায়াত পরম সুবিধাজনক হইয়াছে ; ইঁহারা স্বয়ং কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সর্ব্বদা তত্বাবধারণ করিয়া থাকেন, এবং আরোহীবর্গের সুখ স্বচ্ছন্দতা বিধানে যত্নের ত্রুটি করেন না। অপেক্ষাকৃত সুলভ ব্যয়ে আসা পক্ষে গো-যান অন্যতম উপায়।

আমাদের মধ্যে শিলং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান। স্বয়ং চিফ কমিশনার বাহাদুর এখানে স্বদলে বাস করিয়া থাকেন। ইহা খাসিয়া ও জয়ন্তী পর্ব্বতের সীমাভুক্ত। জয়ন্তী পর্ব্বত (Jaintia Hills) পৌরাণিক সময়ে জয়ন্তীপুর নামে আসামের একটী প্রধান জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। খাসিয়া পর্ব্বতের কথাও পুরাণে উল্লিখিত আছে ; উহা খস-দেশ নামে অভিহিত। এই নাম সম্বন্ধে এক হাস্যোদ্দীপক কিম্বদন্তী শুনা যায়। এই প্রদেশের রাজা পাণ্ডবদিগের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হইয়া ছিলেন, তথায় কথা প্রসঙ্গে ভীমের প্রতি অসজ্জনতা ও গর্ব্ব-প্রকাশ করাতে তিনি রোষ বশতঃ ঐ পার্ব্বত্য রাজাকে প্রস্তরোপরি ঘর্ষণ পূর্ব্বক নিধন করেন। এই ঘর্ষণ হইতে ঘষ, এবং তাহার অপ-ভ্রংশ খস। ঘর্ষণ দ্বারা রাজার মৃত্যু হওয়া বশতঃ এই দেশ ঘষ বা খস নামে অভিহিত! এই উদ্ভট উদ্ভাবনের কর্ত্তা কে, নির্দ্দেশ করা দুরূহ ; বস্তুতঃ ইহা কোন মস্তিষ্ক-পরিচালকের স্ব-কপোল কল্পনার ফল বলিয়া বোধ হয়। অতিথির বিনাশ করা দূরে থাকুক, হতাদর ক্ষত্রিয়ের এবং সমগ্র হিন্দুর কুল-ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ ; সত্য ও ধর্ম্মনিষ্ঠ যুধিষ্ঠির-প্রমুখ পাণ্ডবগণের রাজসূয় যজ্ঞে নিমন্ত্রিত রাজার বিনাশ নি না, আত্মীয় বন্ধু সাধিত হইবে, ইহা বিশ্বাসের -সকলেই কথা। অন্যতঃ, এরূপ নামকরণ সাধিত হওয়ার পূর্ব্বে, এ জাতির অবশ্য কোন আদিম নাম থাকা সম্ভব বোধ হয় ; কিন্তু উপস্থিত খাসিয়াগণের মধ্যে তাহা কিছুই শুনা যায় না। খাসিয়াগণ পূর্ব্বে নিতান্ত অসভ্য ছিলেন। অধুনা খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম-প্রচারকগণেব শিক্ষকতাগুণে এবং ইংরেজ ও বঙ্গবাসীর সংঘর্ষে সভ্যতার সুন্দর মূর্ত্তি ইঁহাদিগের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিতেছে। আদিম খাসিয়াবর্গের ধর্ম্মানুভূতি নিতান্ত কম ছিল ; ইঁহারা উপদেবতার উপাসক ছিলেন, এখনও অসভ্য ও অশিক্ষিত খাসিয়া সমাজে ঐ প্রেতোপাসকদিগেব (demon worshippers) সংখ্যাই অধি । অধুনা অনেকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছেন, কাহারও ব্রাহ্মধর্ম্মে কথঞ্চিৎ অনুরাগ, আবার কেহ বা হিন্দুধর্ম্মের দিকেও অল্পে অল্পে অগ্রসর।

পর্ব্বতের উপরিভাগে অবস্থিত বলিয়া শিলঙের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সহজেই চিত্তবিনোদনকারী ; চতুর্দ্দিকেই অভ্রভেদী শৈলমালা সদর্পে মস্তকোত্তোলন করিয়া বিরাজমান,—মধ্যে মধ্যে ময়ূরের কেকা, বনজ বিহঙ্গের কাকলি, নির্ঝরের কুল-কুল-ধ্বনি বড়ই শ্রুতিসুখাবহ। এখানকার জলবায়ু আসামের অন্যান্য স্থানাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর,—অধিক কি, ইংরাজেরা ইহাকে Paradise of Assam বলিয়া থাকেন। এখানে পর্ব্বতসুলভ প্রাকৃতিক শৈত্য চিরদিন বিরাজমান ; শীতের সময় নবাগত লোকের পক্ষে ইহা কতক কষ্টকর বোধ হইতে পারে, কিন্তু শিলং

জলে অবগাহন করিস্যতের প্রকোপ অধিক অসরত ল্যার ভাগ খুব এখানে অধিক; চিরা পুঞ্জি ভারতের মধ্যে বর্ষা-প্রধান স্থান— ইহার নিকটে অবস্থিত বলিয়াই, বোধ হয়, এখানে বর্ষার এত প্রকোপ। এখন এখানে বসন্তকাল,—নিম্ন-বঙ্গে মাঘের শেষে ও ফাল্‌গুণের প্রথমেই যেরূপ নাতি শীত, নাতি উষ্ণ ভাব, যেমন একটু প্রাণ-ভুলানি মন-মজানি ফুর-ফুরে বায়ু, প্রকৃতির যেমন একটু মনোমোহন দৃশ্য, এখানে এখন সেইরূপ। অধিকের মধ্যে কখন কখন বৃষ্টির ধারা; অভাবের মধ্যে কোকিলের কুহুধ্বনি—পাপিয়ার দিগন্তস্পর্শী অন্ত-র্ভেদী মধুর রব। শিলঙের অনতিদূরে একটী জলপ্রপাত আছে; ইহা (Beadon's fall) নামে প্রসিদ্ধ। অত্যুচ্চ পর্ব্বতের উপরি-ভাগ হইতে তুষার ধবল বারিপুঞ্জ অবিরাম গতিতে নির্ঝরিত—প্রকৃতির এই মর্ম্মোচ্ছ ভাব দর্শকের বড়ই চিত্তাকর্ষক, বড়ই নয়না-নন্দ বর্দ্ধক। শিলঙের সর্ব্বোচ্চ গিরি শৃঙ্গও (Shillong Peak) স্বভাবের অন্যতম নিদর্শন; ইহার উপরিভাগ হইতে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্রকে একটী সূত্রখণ্ডের মত দেখা যায়।

এখানে ইদানীং সভ্যতার ও বিলাসি-তার উপকরণ সমস্তই আছে। লাটের রাজভবন (Chief Commissioner's Re-sidency.) বিলাসীর বিলাস-কানন, ক্রীড়া-মত্তের ক্রীড়োদ্যান, উপাসকের প্রার্থনা-স্থান—কিছুরই অভাব নাই। Dak Bun-galow, Institute, Hotel, Museum, Church-yard—ইংরাজ-উপভোগ্য সকলই আছে; ডাক-ঘর, তার-ঘর ত থাকিবেই। Boy's school, Girl's school, Mission school-প্রভৃতিতে পাঠের বন্দোবস্ত আছে। বাঙ্গালীদিগের মধ্যেও এখানে এ সমস্ত বিষয়ে বিলক্ষণ উন্নতি দেখিতে পাওয়া যায়। অল্প সংখ্যক লোকের যত্নে এখানে ইংরাজি পড়িবার Reading Club, বাঙ্গালার সাহিত্য-সভা, বঙ্গ-বালিকা-বিদ্যালয়, উপা-সকের ব্রহ্ম-মন্দির, আমোদ-প্রিয়ের নাট্য-শালা প্রভৃতি অবশ্য-প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—ইহা নিরতিশয় প্রশংসার কথা। সকলই আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, একটী প্রধান জিনিস নাই— পরস্পর ঐক্য বা মনের প্রীতি এখানে সম্পূর্ণ বিরল। প্রবাসীর মধ্যে কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান শ্রীহট্ট, আসাম ও ঢাকা-নিবাসী লোকই অধিক;—ইঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে একতার সম্পূর্ণ অভাব, এমন কি, এক স্থানীয় লোকের মধ্যেও অনেক স্থলে মনোমালিন্য লক্ষিত হয়। বঙ্গবাসীর এই অপবাদে প্রায় সর্ব্বস্থান কলুষিত;—একতার অভাবে বঙ্গভূমি অনু-ক্ষণ লাঞ্ছিত, বিধ্বস্ত ও বিদলিত হইতেছে— ইহা দেখিয়াও বঙ্গবাসী একতা শিখিতে পারিলেন না, ইহা সামান্য পরিতাপের কারণ নহে। বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক কত দিনে ঘুচিবে, অন্তর্যামী ভগবানই জানেন। ঐ রূপ সভ্যতার নানারূপ সমাজের প্রতিষ্ঠা না করিয়া যদি অত্রত্য প্রবাসীগণ পবিত্র একতার সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতেন, তাহা হইলে সমাজের সার্থকতা হইত, দেশের উন্নতির পথ পরিষ্কৃত হইত, অন্তরে শান্তির সুবিমল জ্যোতি উদ্ভাসিত হইত।

শিলঙের এবং সমস্ত আসামের অন্যান্য কথা বারান্তরে বলিবার ইচ্ছা রহিল। এখন নিজের কথা আর একবার, বলি।

দাসত্বের বিনিময়ে, জীবনোপায় নির্দ্ধারণে, বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে এই প্রবাসের পথে আসিলাম বটে, কিন্তু এখনও ত কৈ মন স্থির করিতে পারিলাম না, অতীতের স্মৃতি এখনও ত অলক্ষ্যে মনকে আলোড়িত করিতে ক্ষান্ত থাকে না, নবীনের আকর্ষণী এখনও ত মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিল না!—কিন্তু হায়! ভ্রান্ত মন এই সামান্য প্রবাসের যন্ত্রণায় অধীর; এই "সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে" মন যে অনুক্ষণ 'দিশেহারা' তাহা ত একবার ভাবি না, সেই অনন্ত সুখসঙ্গম "নিজ নিকেতনে" কিরূপে ফিরিয়া যাইব,—একবার ভ্রমেও ত চিন্তা করি না, আত্মীয় বন্ধু প্রিয় পরিজন, স্বার্থের অনুরোধে সকলেই প্রবাস হইতে প্রবাসান্তরে যাইতে বলে, কৈ কেহ ত সেই স্বদেশে পরমধামে যাইবার পথ চিনাইয়া দেয় না। ভাই, তোমাদের আত্মীয়তায় নমস্কার!—আমার নবীনে প্রয়োজন নাই, আমার সেই পুরাতনই ভাল, যদি কেহ পার, আমাকে সেই পুরাতন চিনাইয়া দাও, সেই সচ্চিদানন্দের শান্তিধামের পথ দেখাইয়া দাও, আমি মনের সুখে স্বদেশে ফিরিয়া এই মনুষ্য-জনম সফল করি।

শ্রীপাঁচকড়ি ঘোষ।

প্রেম-লীলা।

আ।

আহ্বান

বেহাগ,—যৎ

নয়নের জলে ভিজেছে কথা,
কে বুঝিবে এই হৃদয়-ব্যথা!
মুছেছে যেথান,
বুঝেছে সেথান,
কোথা হেন শ্রোতা,—পিরীতি-জ্ঞাতা?

কৈশোরের প্রেম-চিন্তা।

পূরবী,—খেম্‌টা।

যখন জানিনে প্রেম, ভাবিতাম মনে মনে,—
না জানি কেমন প্রেম, ফোটে কোন্ ফুল-বনে!
না জানি কেমন সুরে,
বাজে বাঁশী কোন্ দূরে!
না জানি কেমন চাঁদ, খেলে কোন্ মেঘ সনে!

দর্শনে।

কালাংড়া,—পোস্তা।

কি তুমি—জানি না, প্রিয়ে!
রূপের ঢেউয়েতে আমি গিয়েছি ভাসিয়ে!
প্রাণ করে টলমল,
নয়নে ভ'রেছে জল,
বুকে আর নাহি বল, দেখিতে ভাবিয়ে!

মিলনে।

ভৈরবী,—আড়া।

প্রিয়ে, এ সুখ-মিলন,—
এক দিন হবে যেন সুদূর স্বপন!
কণ্ঠ-লগ্ন বাহু-লতা,
এ হবে মরম-ব্যথা!—
হেরিলে কনক-লতার মধুর কম্পন!
এ আঁখি, সরমে নত,
জাগাবে যাতনা কত!
হেরিলে হরিণী-বালার তরল লোচন!
এ আদর, কথা-আধ,
ঘুচাবে সকল সাধ!—
শুনিলে কমল-বনে অলির গুঞ্জন!

সমাজ-ভয়ে।

ভৈরবী,—কাওয়ালি।

কথা কওযো না রে আর!
অপমানে আঁখি তুলে চাওয়া হবে ভার!
সুধু—চেয়ে যাও চ'লে!
অশ্রু থাক্ আঁখি-কোলে!
অধরে মলিন হাসি, প্রাণে হাহাকার!

আশাবাড়ী, —যৎ।

দাও, দাও, খুলে দাও, হাসির এ স্বর্ণ-জাল!
আবার এসেছি আজ, আসিব না ব'লে কাল!
আজো আমি বুঝিতেছি,
কোথায় কি খুঁজিতেছি!
এই বোঝা, এই খোঁজা, ঘুচে যেতে পারে কাল!

অভিমানে।

ঝিঁঝিট-খাম্বাজ,—দাদ্রা।

যাব না, যাব না করি অভিমানে আছি বসি,
পূরবে মেঘের কোলে ফোটে ফোটে আধ শশী!
মৃদুল বহিছে বায়,
ডাকে বাঁশী আয় আয়!
ফোটে তারা গায় গায়, মান বুঝি যায় খসি!

মিলনান্তে।

দেশ,—আড়া।

হ'লে না আমার যদি, যাই, তবে কেঁদে যাই।
যার থাক', সুখে থাক', এ বিনা কামনা নাই!
নাই বা ফুটিল হাসি,
নাই বা বাজিল বাঁশী,
(সুধু) দিনান্তেও একবার দেখে যেতে যেন পাই!

বিদায়ে।

ললিত,—একতালা।

তবে—দাঁড়াও, দাঁড়াও।
কি বাসনা পূরিল না যাও ব'লে যাও!
সারাটা জীবন রহিয়াছে প'ড়ে,
ভাবিতে কাঁদিতে কথা ধ'রে ধ'রে!
কি কথা ধরিয়ে কাঁদিতে হবে রে
দাও, ব'লে দাও।

প্রবোধে।

গৌরী, —একতালা।

কি জানি কি ক্ষণে, সণে, দেখেছিনু আঁখি তার!
গেছে মান, অভিমান, যাহা কিছু আপনার!
যবে থাকি কাছাকাছি,
ভাবি চির-জন্ম বাঁচি!
চোখের আড়ালে ভাবি, মরণ কি নাই আমার!

বিরহে।

টোরী,—যৎ।

কোথা সে!
আসি ব'লে গেছে চ'লে, এখনো কেন না আসে!
ভাবে মন বার বার,
সকলি চাতুরী তার!
সদা যাতে ভাবি তারে, তাই গেছে বেঁধে আশে!
আসিবে না সে কি আর,
ঘুচাইতে এ বিকার?
বুঝাইতে—দেরী তার, হ'য়েছে কপাল-দোষে!
আঁখিতে রাখিলে মন,
হ'তে হয় জ্বালাতন,
বুঝাবে না মিলনেও—তাই আঁখি জলে ভাসে!

বেহাগ,—কাওয়ালি।

দুদিনের প্রেম-খেলা, কে জানিত হায়!
তা হ'লে এ বিষ-লতা কে পরে হিয়ায়?
হাসিয়া পিরীতি করি,
অবশেষে কেঁদে মরি
সংসারে কলঙ্ক-ডালি লইয়া মাথায়!

টোরী,—কাওয়ালি।

না বুঝিয়ে মন দিয়ে, ভাবিয়ে কাঁদিয়ে সারা!
নিজ দুখে, নিজ চুকে, জগতে আপনা-হারা!
কেন মন দিনু ভুলে,
কপট-সোহাগে ভুলে!
সব ভুল ঘোচে কালে, এ ভুল কি কাল-ছাড়া!

বিরহান্তে।

মুলতান,—আড়া।

এই কি বিরহ সেই, লোকে যার কথা কয়।
ঝটিকার পরে যেন ভাঙা ভাঙা সমুদয়!
সুখ, দুখ, আশা যত,
সবে পরিশ্রান্ত মত!
তবু ভাবিতেছি কত, কত কথা মনে হয়!

ভৈঁরো,—যৎ।

(বুঝি) কমিয়া আসিছে দুখ।
ঝটিকার পরে যেন আছে রে আলোর মুখ!
প্রকৃতি নিঝুম মত,
ছাড়া-ছাড়া মেঘ যত;
চাহিলে হৃদয়-পানে কেঁপে শুধু ওঠে বুক!

বিরহে শিক্ষা-লাভ।

সারং,—কাওয়ালি।

না না, দেখো না তাহারে!
রমণী কুহকিনী কখন বধে কাহারে!
দেখিতে দেখিতে প্রেম হবে,
প্রেম-কথা কবে,
অবশেষে কত সবে হাহা রে!

বহু পরে।

ভৈরবী,—আড়া।

প্রেমের বাঁধন কিরে ছেঁড়ে না কখনো হায়!
কোথায় প'ড়েছি গিয়ে কালের করাল ঘায়!
কথা যদি তোলে কেউ,
এখনো যে লাগে ঢেউ!
চোখে যেন আসে জল, সে মুখ ফুটিতে চায়!
অদৃষ্টে ভাসিয়া যাই,
পিছনে কেন রে চাই?
পিছনে আলোক র'লে সমুখে কি হবে তায়?

পুনর্দর্শনে।

মিশ্র বেহাগ-খাম্বাজ,—আড়খেম্‌টা।

এতদিনে কি বুঝেছি, কি মন বেঁধেছি রে!
যতদূর সহিবার, সবি তো স'য়েছি রে!

ঘুচাতে আশার ঘোর,
সবি তো ঘুচেছে মোর ;
ছিঁড়িতে প্রেমের ডোর,সবি তোর ছিঁড়েছিরে !
আজি কতদিন পরে,
চলেছি আপন তরে
রে !—
অমনি নামটি ধ'রে,
ডেকেছে করুণ-স্বরে !
জেনে ভুল্ বুঝিতে চাই,—
বুঝি দুখ দিয়ে যাই !
গিয়েছি না যেতে আছি,ফিরেছি ফিরেছিরে !

পুনর্মিলনে।

কালাংড়া.—আড়খেম্টা।

জানি নে আছি কোথায় !
কি যেন আকুল স্রোত, চারিদিকে উথলায় !
জানি না ডুবে কি ভেসে,
রহিয়াছি কোন্ দেশে !
প্রাণ যেন সিন্ধু-শেষে কাঁপিতেছে জোছনায় !
যেন কতদিন পরে
বসন্ত এসেছে ঘরে !
পরাণ উড়িছে কোথা—ফুল-রেণু মত বায় !

ওঁ শান্তি।

পিলু,—পোস্তা।

এখন যা আসে, বলি, ভেবোনা সকল !
তুমি যে আমার এক, আমি যে পাগল।
তোমারেই ল'য়ে খেলা,
তাই মাঝে হেলা-ফেলা ;
নিয়মে কাটে না বেলা, খেয়ালে কেবল।

শ্রীঅক্ষয়কুমার বড়াল।

ঘোড়ানাচের ভগ্নাবশেষ।

যশোহরের অন্তর্গত মাগুরা মহকুমার মধ্যে যে সকল ভগ্নে পরিণত ইষ্টকালয় দৃষ্ট হয়, তন্মধ্যে ঘোড়ানাচের ভগ্নগুলি দেপাল রাজার ভগ্নবাটী বলিয়া কথিত। শুনা যায়, বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত দেবগ্রাম নামক গ্রামে তাঁহার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ একটী ভগ্নবাটীর অবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। দেবগ্রামের ভগ্নগুলি সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না।

ঘোড়ানাচের ভগ্নাবশেষ মাগুরা মহকুমা হইতে তিন ক্রোশ দক্ষিণে। উহার খানিকাংশ আবাদ হইয়াছে এবং ভগ্নগুলি মাটীর নীচে প্রোথিত অবস্থায় আছে। যে স্থান হইতে মৃত্তিকা খনন করা যায়, সেই স্থান হইতে রাশি রাশি ইষ্টক উঠে।

মাগুরা মহকুমার মধ্যে ৭টা পুরাতন ভগ্ন দৃষ্ট হয়। (১) ঘোড়ানাচের ভগ্নাবশেষ (২) ভীমের টীলা (৩) রায় নগরের ভগ্ন পঙ্করত্ন (৪) চতুর্থ বড় উদয়ের ভগ্ন কৃষ্ণ মন্দির ও জোড় বাঙ্গলা (৫) মহম্মদপুর, হরিহর নগর, সূর্য্যকুণ্ড ও শ্যামনগরের সীতারামের ভগ্নবাটী (৬) ঘুল্যার সরল খাঁর ভগ্নবাটী (৭) নারায়ণপুরের কবির দেওয়ানের ভগ্নবাটী।*

*এতদ্ভিন্ন সিঙ্গা বা সিংহগ্রামে অতল ভেদী রাজার বাটী আছে। উহা নড়াল মহকুমার মধ্যে কিন্তু মাগুরার সীমাপ্রান্তের অন্তরবর্ত্তী।

সপ্তম—ইহা নারায়ণপুর গ্রামে স্থিত, এবং ৮০।৯০ বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। ইহা একজন ফকিরের বাটী, এই পর্য্যন্ত কিম্বদন্তী।

ষষ্ঠ ও পঞ্চম—এই ভগ্নগুলি সীতারামের ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্রিত এবং সীতারাম শীর্ষক প্রস্তাবে তৎসম্বন্ধীয় মন্তব্য প্রকাশিত হইবে।

চতুর্থ—কৃষ্ণ মন্দির। তদুপরি যে কবিতা লিখিত ছিল, তাহা নিম্নে দিতেছি :—

খবেদ রসচন্দ্রশ্বশকে (শ্রীভগবদ্যোহং ?)
অকারি নরসিংহেন তুষ্ট্যর্থে দেবচক্রিনঃ।

ইহা ঐতিহাসিক নহে। তবে ১৬৪০ শকে (১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে) নির্ম্মিত। প্রবাদ এই, নলডাঙ্গার রাজা রঘুদেব রায় ইহার চক্রান্তে কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন।

তৃতীয়—এই ভগ্নটী একটী উৎকৃষ্ট এবং বিবিধ খোদিত ছবিবিশিষ্ট পঞ্চরত্নের উত্তর ও পশ্চিমের ভিত, ইহা মুচী-খালী নদীর নিকটবর্ত্তী রায় নগর গ্রামে ৺ দেবনাথ ভট্টাচার্য্যের বাটীতে স্থিত। দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দিকের ভিত ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। গুম্বজ গুলিও নাই ! এই রায় নগরে হাম্বদ্দি সংগ্রাম সাহার বংশজ এক ঘর বৈদ্য বাস করিতেছে। যে দুটী ভিত দণ্ডায়মান আছে, তাহা কৃষ্ণ বিগ্রহের ছবিতে পরিপূর্ণ। যাঁহারা মহম্মদপুরের হরেকৃষ্ণ রায়, লক্ষ্মী নারায়ণ এবং দশভূজালয় মন্দিরের ইষ্টকে খোদিত ছবিগুলি মনোযোগের সহিত দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই ভগ্নভিতের ইষ্টকে যে সকল ছবি আছে, তাহা বুঝিতে পারিবেন। এই ছবিগুলিতে তদানীন্তন সমাজের অবস্থা অনেক পরিমাণে উপলব্ধি করা যায়। সীতারাম শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। এস্থলে এই মন্দির নির্ম্মাণ সময় নির্ণয় করা যাক্। ইহার সময় নির্ণয়ের উপর ঘোড়ানাচের ভগ্নগুলির সময় নির্ণয় নির্ভর করিতেছে। তদ্ভিন্ন অন্য উপায় দেখিতেছি না।

এই ভগ্নের উত্তরের ভিতের বহির্ভাগে অতি উচ্চে যাহা লিখিত ছিল, তাহার যতদূর পাঠ করিতে পারিয়াছি, তাহা অবিকল নিম্নে লিখিতেছি।*

উর্দ্ধ কবিতা।

"ব—বেঙ্গ—ঙ্গবেদ—পি—গোকু—দর্পি।—
স্বা—নাদ———————————
শকে—ত্যা—বোব—সবিস্ম—ঙ্গ—স্তক—হ,
—ব—স্থাক—যানিব—মনস্য—সিংঘু—"

নিম্ন কবিতা।

"শকে ব্যামামৃতকর শর ক্ষোণি সংপাদিতেঽস্মিন্—দোয়ং ব্যরচি মহতা বিশ্বনাথান্বিতেন।
—স্থির প্রতিহত মৃগ—শ তসদে—
।-বে-ত-ন-মৃত-বি স ব এ হ পুন্যখবে।"
"১৫৫০"

এই দুই কবিতা যদি কেহ পাঠ করিতে পারেন এবং তাহা নব্যভারতে প্রকাশ করেন, বড় বাধিত হইব। যে স্থানটীতে এই ভগ্ন পঞ্চরত্ন আছে, তাহা মথুরাপুরের নিকটবর্ত্তী এবং পঠিত হইলে সংগ্রাম সাহার ইতিহাসের সহায়তা করিতে পারে। ঐ কবিতাদ্বয় যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা

* শুনা যায় ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে ৺রামতর্ক পঞ্চানন এই কবিতা পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কি পাঠ করিয়াছিলেন, তাহা কেহ আমাকে বলিতে পারিল না।

পড়িবার সময় আমাকে অতি ঊৰ্দ্ধে উঠিতে হইয়াছিল, এবং যাহা দেখিয়াছি, তাহাই পেন্সীলের দ্বারায় লিখিয়াছিলাম। আমার লেখাতেও যে ভুল নাই, একথা আমি বলিতে পারি না

যাহা হউক, পঞ্চরত্ন নির্ম্মাণের সন পাওয়া গিয়াছে। উহা ১৫১০ শকাব্দা। ঐ সন বুঝিতে আর কিছুই সন্দেহ থাকে না। "শকেব্যোমামৃতক শরক্ষোণি" বাক্যে ১৫১০ শকাব্দা বুঝায়। অঙ্কে যাহা লেখা আছে, তাহাতেও ১৫১০ই পড়িতে হয়। তবে '৫' এই অঙ্কটির কিঞ্চিদংশ ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় উহা আপাততঃ ৬ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু কবিতায় 'শর' শব্দটী স্পষ্ট থাকায় ৫ ই পড়িতে হইবে। সুতরাং এই পঞ্চরত্ন ১৫১০ শকাব্দায় (১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। সুতরাং উহা সীতারামের হরেকৃষ্ণ রায়ের মন্দিরের ১১৭ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী।

দ্বিতীয়—ইহা "ভীমের টীলা।" ইহা ফটকে নদীর তীরবর্ত্তী টীলা গ্রামে স্থিত। ঐ "ভীমের টীলা" হইতেই গ্রামের নাম টীলা হইয়াছে। "ভীমের টীলা" প্রায় ৩৫ হাত ব্যাসের একটী গোলাকার মনুমেন্টের ন্যায় ইষ্টকালয় এবং যতদূর উপরে দৃষ্ট হয়, তাহা নিরেট। ৪।৫ হাত ভিন্ন অবশিষ্টাংশ মাটীর নীচে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। লোকে বলে ইহা "ভীমের টীলা", স্মরণ হইতেছে বান্ধবে পড়িয়াছি, দিনাজপুরে "ভীমের পান্টী" আছে। ভীমের পান্টীর" সহিত ভীমের টীলার কোন সংস্রব আছে কি না কে বলিবে? কিম্বদন্তী বলিতেছে, পাণ্ডবভ্রাতা ভীম এস্থান দিয়া যাইতেছিলেন। এক দিন এই স্থানে বাস করিতে হইয়াছিল। তখন ঐ টীলা (উচ্চ স্থান) বিধায় আবাস স্থান মনোনীত হইল। সেই স্থানে সকলের রান্না করিয়া খাইতে হইল। যেস্থানে অঙ্গার ফেলিয়াছিলেন, সেই স্থান আড়দায়দহ নামে খ্যাত হইল ইত্যাদি।

প্রথম—ঘোড়ানাচের দেপাল রাজার বাটী এবং আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়। এই বাটী কালীগঙ্গা* (বর্ত্তমান শুষ্ককলেবরা) নদীর তীরস্থ ঘোড়ানাচ গ্রামে স্থিত। উহা এইক্ষণ অনেক আবাদ হইয়াছে। কতকগুলি ইষ্টক স্তূপ এবং দীঘি পুষ্করিণী ভিন্ন আর কিছুই দেখা যায় না। গ্রামে মাটী খনন করিলে, স্থানে স্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

পূর্ব্বোক্ত'ভীমের টীলা,'হীরানটীর বাস্তা† এবং আরো কতকগুলি পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন

* মহম্মদপুরের নিকট যে কালীগঙ্গা ছিল, এও সেই কালীগঙ্গা।

† জগদল, ছোমপুরের মধ্য দিয়া মরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক কালীশঙ্করপুরের দিকে চলিয়াছে। রাস্তাটি কালী গঙ্গার তীরবর্ত্তী;

(ক) কালীজীর বিলে শানবাঁধা ঘাট।

(খ) লস্করপুরের দীঘি।

(গ) বলেশ্বরপুরের দীঘি ও পুষ্করিণী।

(ঘ) সাচনার ভিটা—ভগ্ন।

(ঙ) লস্করপুরের জহিরউদ্দিন বিশ্বাসের বাটীর আড়া খননকালে যে প্রাচীর প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

(চ) ঘোড়ানাচের দিল্লী চক্রবর্ত্তীর পুষ্করিণী খননকালে যে প্রাচীর ও প্রস্তর নির্ম্মিত জল-চৌকী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল।

(ছ) ধনহারা গ্রামে কোটের বাড়ীর ভগ্নাবশেষ যাহা মৃত্তিকার নীচে দেখা গিয়াছে।

(জ) ধনহারা গ্রামে ইষ্টকনির্ম্মিত গোড় বা কবর মধ্যে ২৫ বৎসর হইল যে, নরকঙ্কাল দেখা গিয়াছে।

সকলেই ঘোড়ানাচ গ্রামের নিকটবর্ত্তী এবং যতদূর জানা যায়, তাহাতে সমকালবর্ত্তী বলিয়া বোধ হইতেছে। এই চিহ্নগুলি এত পুরাতন যে, অনেক চিহ্ন বিলুপ্তপ্রায়। কতকগুলি প্রাচীরাদি মাটীর নীচে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে। যদি হরেকৃষ্ণ রাঁমের মন্দির অপেক্ষা, রায়নগরের ভগ্ন পঞ্চরত্ন ১১৭ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়, তবে রায়নগরের পঞ্চরত্ন অপেক্ষা ঘোড়ানাচের ভগ্ন ভীমের টীলা, হীরানটীর রাস্তা প্রভৃতি চিহ্নগুলি তাহার দ্বিগুণ সময় অথবা ততোধিক কালের পূর্ব্ববর্ত্তী হইবে সন্দেহ নাই। যদি তাহা হয়, ঘোড়ানাচের ভগ্নগুলির নির্ম্মাণ সময় ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে কিম্বা মোটামোটী বলিতে গেলে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম অর্দ্ধাংশে বলিতে হইবে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমাংশে পশ্চিম বাঙ্গালা মোসলমানদিগের অধীনতা স্বীকার করে। আরো এক শত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় অধীনতা আরম্ভ হয় নাই। বক্তিয়ার খিলজী আসিতে আসিতে পশ্চিম বাঙ্গালা অধিকৃত হইয়াছিল, কিন্তু শতাধিক বৎসরেও পূর্ব্ব বাঙ্গালার মস্তিষ্ক দমিত হইয়াছিল না। যাঁহারা বলেন, অধীনতার মর্ম্মন্তুদ বেদনা বাঙ্গালী শরীরে প্রবেশ করে না, তাঁহারা পূর্ব্ব বাঙ্গালার ভগ্নাবৃত ইতিহাস অন্বেষণ পূর্ব্বক পাঠ করুন—দেখিবেন, শত শত ব্যক্তি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া যখন স্বাধীনতা রক্ষণে বিফল-মনোরথ হইয়াছেন, তখন সপরিবারে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন; তথাচ অধীনতা স্বীকার করেন নাই। আমাদের বর্ত্তমান প্রস্তাব তাহার একটী দৃষ্টান্ত।

ঘোড়ানাচের দেপাল রাজা পরতন্ত্র পাঠান শাসনকালে প্রাদুর্ভূত। যখন ফিরোজ সাহার পুত্র বাহাদুর সাহা পূর্ব্ব বাঙ্গালা জয় করিতে আরম্ভ করেন, তৎকালে কিম্বা তাহার অব্যবহিত পরে দেপাল রাজত্ব করিতেছিলেন। যদি বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত, দেবগ্রাম গ্রামের ভগ্নগুলি তাঁহারই বাটীর ভগ্নাবশেষ হয়, তবে বর্ত্তমান যশোহর জেলার প্রায় অধিকাংশ তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল।

দেপাল সম্বন্ধে যাহা জানা যায়, তাহা অতি অল্প। তাঁহার কুম্ভকার বংশে জন্ম, এইরূপ জনশ্রুতি। কুম্ভকার যে রাজা হইতে পারে না, তাহা নহে, কিন্তু ইহাও হইতে পারে যে, 'পাল' উপাধি বশতঃ কিম্বদন্তীর হাতে পড়িয়া ঘোড়ানাচাধিপের কুম্ভকার হওয়া বিচিত্র নহে। যাহাই হউক, সেই মনোমোহিনী দেবীর কথা উপেক্ষা করিতে পারি ক? তাহার কথানুসারে, দেপাল এক জন সন্ন্যাসীর নিকট একখণ্ড স্পর্শমণি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা যে লৌহে স্পর্শ করাইতেন, তাহাই স্বুবর্ণ হইত। সীতারামের পাঠকেরা শুনিয়াছেন যে, সীতারাম ভূমি খনন করিলেই ধন পাইতেন। দেপালকে আর মাটী খনন করিতে হইত না, স্পর্শমণি দ্বারায় তিনি যত লৌহাস্ত্র ছিল, সব স্বর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার দা, কোদালী প্রভৃতি ত অতি সত্বরই স্বর্ণ হইয়াছিল, আরো কত বস্তু স্বর্ণ হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা হয় না। এই প্রকারে তিনি অর্থবান হইয়া রাজা হইলেন।

রাজা হইলে মোসলমান সৈন্য আসিয়া তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া যায়। যাওয়ার সময় তিনি কতকগুলি কপোত সঙ্গে করিয়া গিয়াছিলেন এবং পরিবারবর্গকে বলিয়া গেলেন, যদি রাজ্যের স্ববন্দোবস্ত করিয়া

আসিতে পারি,তবে কপোত ছাড়িব না, আর যদি না পারি তবে কপোত আসিয়া সংবাদ দিবে এবং তৎক্ষণাৎ তোমরা ডুবিয়া মরিও। দেপাল রাজ্যের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু বিপদ এমন যে পথের মধ্যে কপোতগুলি পলাইল এবং ঘোড়ানাচে পৌছিল। কপোত আসিবামাত্র দেপালের কন্যা প্রভৃতি রাজপরিবারবর্গ দালানের উপর দিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া মরিলেন। যে স্থানে তাঁহার কন্যার মৃত্যু হয়—উহা "কন্যাদহের দোয়া" বলিয়া খ্যাত! ২৩ দিনের মধ্যে দেপালের নৌকা মহা সমারোহে কালীগঙ্গার অনুকূল স্রোতে ঘাটে পৌছিল। কিন্তু শুনাগেল, তাঁহার কন্যার মৃত্যু হইয়াছে। বোধ হইতেছে, দেপালের পুত্র ছিলনা। দেপাল ইহা শুনিয়া নৌকায় কুঠারাঘাত পূর্ব্বক নিজেও ডুবিয়া মরিলেন। তিনি যে স্থানে ডুবিয়াছিলেন, তাহার নাম ডিঙ্গীবুরো বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত। যাঁহারা ফ্রাঙ্ক জর্ম্মানযুদ্ধে কপোত দ্বারায় সংবাদ বহন কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছেন, তাঁহারা দেখিলেন, বঙ্গদেশে অতিপূর্ব্বে ঐ প্রথা প্রচলিত ছিল।

উপরোক্ত কিম্বদন্তী ভিন্ন আর কিছুই জানা যায় না। তবে ঘোড়ানাচের নিকটবর্ত্তী কতকগুলি গ্রামের নাম আছে,—শত্রুজিৎপুর, ভাটপাড়া,রাজাপুর,রাজপাঠ, রাজাগঞ্জ ইত্যাদি এই গুলিও যে কোন রাজার নামের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। দেপালও রাজা বলিয়াই খ্যাত। তিনি যে কতক পরিমাণে প্রবল হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে অল্প সন্দেহ আছে। তিনি যে স্থানে পরাজিত হন বা পরাজয় করেন,সেই স্থানের নাম হয়ত শত্রুজিৎপুর। ভীম, বোধ হয়, তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিল। হীরানটী বোধ হইতেছে তাহার নগরের প্রধানা ব্যবসায়িনী রমণী ছিল। ঘোড়ানাচ, বলেশ্বরপুর, ধনহারা গ্রামে ভূমি খনন করিলে একটী ভগ্ননগর প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া অসম্ভব নয়।

দেপালকে পরাজয় করিতে কতক প্রয়াস পাইতে হইয়াছিল। দেপালের পরাজয়ের পর ঘোড়ানাচের নিকটবর্ত্তী ধনহারা গ্রামে একটী আফিস স্থাপিত হইয়াছিল। যে যে স্থানে প্রবল শত্রু বিনষ্ট হইয়াছে, সেই সেই স্থানে কতক দিনের জন্য সৈন্য রাখিতে হইয়াছে, ইহার প্রমাণ বিস্তর পাওয়া যায়। ধনহারা "কোটের বাড়ী" বলিয়া যে মোসলমান সময়ের এক আফিস বাড়ী নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার স্থাপনের আবশ্যকতা যে অন্যবিধ নহে, নিকটবর্ত্তী গ্রামের ইতিহাসে ইহাই প্রমাণ করে। তদ্ভিন্ন প্রায় ২৫ বৎসর গত হইল, উক্ত গ্রামের গোপাল মিত্রের ঘরের নিম্নে ইষ্টক-নির্ম্মিত কবরের মধ্যে পাঁচ হস্ত পরিমিত এক নরকঙ্কাল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। এই নরকঙ্কাল দেখিয়াছেন, এমন লোকের সহিত আমি কথোপকথন করিয়াছি। এই নরকঙ্কাল কোন বীরপুরুষের, সন্দেহ নাই। ইহা সম্ভবতঃ ভীম বা ভীমের শত্রুর কঙ্কাল হইবে। সে যাহাই হউক, দেপাল পরাজিত হইয়া দিল্লীতে (সম্ভবতঃ গৌড়ে) নীত হইয়াছিলেন এবং পরিণাম যাহা হইয়াছিল, পূর্ব্বেই তাহা বলা হইয়াছে।

আমাকে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিতে হয়। দেপালের মত অনেকে অধীনতার ভয়ে বা অত্যাচার বশতঃ জলে ডুবিয়া মরিয়াছেন এইরূপ গল্প বিস্তর শুনি। বিবা-

ডিভারিজ সাহেব লিখিয়াছিলেন, পটুয়াখালী মহকুমার অন্তর্গত একজন রাজোপম ব্যক্তি, অধীন হইতে হইবে দেখিয়া উচ্চ ছাদের উপর হইতে প্রথমে নিজের সন্তানগুলিকে স্বহস্তে নিক্ষেপ করত অধীনতার ভাবী দাহন হইতে মুক্ত করিয়া শেষে নিজে পতন পূর্ব্বক আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বাঙ্গালায় এইরূপ অলিখিত ইতিহাস আরো আছে। যাঁহারা ভাবেন, যাহাকে বাঙ্গালা বলে, তাহা অতি সহজেই মুসলমানদিগের হস্তগত হইয়াছিল, তাঁহারা পূর্ব্ব বাঙ্গালার প্রকৃত ইতিহাস জানেন না, ইহার কোন স্থানই বিনাযুদ্ধে মোসলমানের হস্তগত হয় নাই। যে প্রকারে রাজপুত রমণীরা অগ্নিকুণ্ডে দেহ সমর্পণ করিয়া স্বাধীন জীবনকে কলুষিত হইতে দেয় নাই, সেই প্রকারে পূর্ব্ব বাঙ্গলায় শত শত রমণী হিন্দুত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য পবিত্র নদীজলে জীবনলীলা শেষ করিয়াছেন।

এই প্রস্তাবে আর কোন ফল হউক আর না হউক, বোধ হয় ইহা প্রতিপন্ন হইবে, যে ভূভাগ সীতারামের রাজ্য বলিয়া কথিত, তাহা হিন্দুরাজত্ব কালে পাতালভেদী রাজার রাজ্য ছিল। ইনি সিংহগ্রামে বাস করিতেন এবং সেখানে "পাতালভেদী" রাজার বাড়ী বলিয়া একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তৎপরে সেই ভূভাগের কতকাংশ দেপাল রাজার অধিকৃত হয়। তদ্ভিন্ন তাঁহার আরো অধিকার থাকে। এই দেবপাল ও পালবংশীয় দেবপাল এক ব্যক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে না। দেপালের পরে কতক সময় কিরূপ অবস্থা ছিল, বলা যায় না। তৎপরে উক্ত ভূভাগের উত্তরাংশ সংগ্রাম সাহার রাজ্য বলিয়া কথিত। সংগ্রাম সাহার পরেই সীতারাম। সীতারামের পর রাজা রামজীবন এবং পলাশীর যুদ্ধের সময় রাণী ভবানী।

শ্রীমধুসূদন সরকার।

যাত্রা ও থিয়েটার।

১। যাত্রা ও থিয়েটার এদেশের একটা জাতীয় আমোদ। কোন একটা জাতির সভ্যতা নির্ণয় করিতে হইলে, অনেক সময় তাহাদের ক্রীড়া ও আমোদের অনুসন্ধান লওয়া হইয়া থাকে; ইহার দ্বারা জাতীয় উন্নতির মাত্রা যে বহুল পরিমাণে অবধারিত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।

২। এক্ষণ কথা হইতেছে, আমরা যে প্রকার থিয়েটার ও যাত্রা করিতেছি, ইহা যুক্তি সঙ্গত হইতেছে কি না। ইহার দ্বারা জাতির কোন উন্নতি হইতেছে কি? যাঁহারা এই সকল দলের অনুষ্ঠানকর্ত্তা, তাঁহারা জাতীয় উন্নতির লক্ষ্য করিয়া থাকেন, কি অর্থোপার্জ্জন উদ্দেশ্যে করিয়া থাকেন? সাধারণের মনে পরিবর্ত্তন উপস্থিত করিতে তাহাদিগের যে অসাধারণ শক্তি আছে, তাহা তাঁহারা জানেন কি? শ্রুত ও দৃষ্ট বিষয় হইতে যেরূপ সহজে জ্ঞান লাভ হয়, ও তাহা যেরূপ সাধারণের পক্ষে সম্ভব, পুস্তক পড়িয়া জ্ঞান লাভ করা তাদৃশ সুসাধ্য

নহে। পিতামহীর কথিত সুয়া দুয়া রাণীর উপকথা যেমন মনে আছে, মার্শ-ম্যানের সম্রাট আকবরের জীবনবৃত্ত সেরূপ মনে নাই।

তাই বলি, লোকের রুচি পরিবর্ত্তন করিতে যাত্রা ও থিয়েটার দলের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে। কিন্তু হস্তী যেমন নিজের সামর্থ্য জানে না, তাঁহারাও সেইরূপ আত্মবিস্মৃত। কেহ দশ বর্ষ ধরিয়া প্রহ্লাদ চরিত্র গাইতেছে। কেহ দক্ষযজ্ঞ দেখাইতেছে, এই প্রকার বিষয় লইয়া অনেককে মত্ত দেখি; কিন্তু একতারার সুর চিরকাল ভাল লাগে কি? আর ইহাতে কি মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইবার আশা আছে? যদি সেই মূর্খ কৌপিন-বস্ত্র বৈষ্ণব এ সকল দলের অধিকারী হইত, তাহা হইলে কোন আপত্তি ছিল না। ভাবিতাম, ইহা ভিন্ন জানে না, ইহা ভিন্ন মাথায় নাই, কোথা হইতে গাইবে?।

দেখিতেছি, এক্ষণকার ঐ সকল উদ্যোগের মূলে প্রায়ই সুশিক্ষিত লোক। তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা এরূপ পর্য্যুষিত বিষয় পাইয়া সন্তুষ্ট হইতে পারি না। সেই মান্ধাতার সময়ের মানভঞ্জন যদি অক্ষয় অব্যয় ভাবে রহিয়া গেল, তবে শিক্ষায় হইল কি? মহাভারত রামায়ণ হইতেই যে, বিষয় লইতে হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই। ঐ সকল বিষয় সত্য হইলেও অত্যন্ত পুরাতন ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রত্যক্ষকরা লোক আমরা দেখি নাই, আমাদিগের পিতামহেরাও দেখেন নাই। এজন্য তুমি যতই বল, উহা কাণে স্থান পায় না। ধর্ম্মের রসান দেওয়া আছে বলিয়া ভক্তেরা শুনে বটে, কিন্তু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। আর সেইরূপ ভক্তই বা কয়জন মিলে? এজন্য বলি, পুরাণাদি হইতে আখ্যায়িকা লইবার প্রয়োজন নাই।

বর্ত্তমান অথবা জাজ্জ্বল্যমান ঐতিহাসিক ঘটনা আশ্রয় করিয়া যাত্রার সূচনা কর। ভাব, যদি তুমি কোন একটী থিয়েটারে পার্লেমেণ্টের সভার কোন একটা বিলের আন্দোলন অভিনয় কর; কাউন্টিতে কাউন্টিতে ইলেকসন দেখাও, মহারাণীর সহিত ইংরাজদিগের সম্বন্ধ দেখাইয়া দাও, তাহা হইলে কতদূর জ্ঞান বিস্তারের সম্ভাবনা। যদি রুষ তুরস্কের যুদ্ধ, সিবাষ্টপোলের সমবেত ইংরাজ ফরাসির ও রুষিয়ার যুদ্ধ-কাহিনী বিবৃত কর; ফরাসী প্রুসিয়ার যুদ্ধ দর্শাও, মিশরে ইংরাজের ব্যবহার দেখাও, রুসিয়ার সহিত ইহাদিগের সম্বন্ধ প্রদর্শন কর, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের গঠন ও কার্য্য-প্রণালী দর্শাও, তাহা হইলে, কলঙ্কভঞ্জন ও প্রহ্লাদচরিত্র অপেক্ষা অধিক ফল হয় না কি? কটন ডিউটি কি, তাহা কয়জন জানে? আর-মস্ য়্যাক্ট কি, তাহা কয়জন জানে? লোকাল-সেল্‌ফ গবর্ণমেণ্ট আইন ও ইলবার্ট বিল কি, যদি কখন নাট্যশালায় প্রবেশ করিত, তাহা হইলে প্রজা সাধারণে লর্ড রিপণের হৃদয় চিনিত। ল্যাঙ্কাসায়ারের কলওয়ালাদিগের সহিত এদেশের তন্তুবায়-দিগের যে খরতর অথচ অদৃশ্য যুদ্ধ চলিতেছে, ইহা একটী উপযুক্ত রঙ্গ-ভূমির বিষয়। ইয়াকুবের নির্ব্বাসন, আবদুর রহমানের রাজ্যলাভ, ছিটেওয়ের ও থিবর পতন, সুন্দর অভিনয়ের সামগ্রী।

কোন কোন বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের আপত্তি হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যদি বিষয়কে অতি রঞ্জিত না করা যায়, ঠিক যেরূপ

সংবাদ পত্রে আলোচিত হইয়া থাকে, যথাযথরূপে তাহাই প্রদর্শিত হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেন্টের বিশেষ কোন আপত্তি হইতে পারে না। প্রজাকে গবর্ণমেন্টের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করা গবর্ণমেন্টের অনভিপ্রেত; কিন্তু তাই বলিয়া প্রজার শিক্ষা বিধান, অন্ধতা-মোচন আপত্তি-জনক নহে। যদি ইতিহাস অবলম্বন করিয়া আমেরিকার ইতিবৃত্তের অভিনয় কর, বীরবর ওয়াসিংটনের জীবনবৃত্ত দর্শাও, তাহাতেই বা আপত্তি কি? রাজশাসন ধ্বংস করিয়া ফরাসিরা যেরূপ প্রজা সমিতি সূচনা করিয়াছিল ও তদীয় সেনাপতি নেপলিয়ন বোণাপার্টি ইউরোপে যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা প্রদর্শনে দোষ কি? দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ, মানভঞ্জন ও গোপিনীর বস্ত্রহরণ প্রভৃতি কেবল এ জাতির নীচতা ও নির্লজ্জতার পরিচায়ক। তাই বলি, যাহা পুরুষোচিত, যাহা জ্ঞান-বিস্তারক, যাহা সমবেদনা-সূচক, তাহারই অভিনয় কর। তুমি পতিত, পরাভূত; তোমার অযৌক্তিক নৃত্য গীত বাতুলতা। সঙ্গত পথে বিচরণ করিয়া দর্শাও, সঙ্গীত কি পরম পদার্থ, - থিয়েটার যাত্রা জাতীয় রুচি পরিবর্ত্তনের কি পরাক্রান্ত যন্ত্র।

শ্রীগণেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

গুরুবাদ ও প্রচার-বাদ।

"চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা"—আমাদের দেশের একটী প্রচলিত কথা। কথাটী সাধারণ শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচলিত, কিন্তু হইলে কি হয়, ইহা অতি সুন্দর কথা, ইহার ভিতরে অতি গভীর ধর্ম্মতত্ত্ব নিবদ্ধ। এই প্রতারণা এবং চটুলতাপূর্ণ পৃথিবীতে আমি যত বড় ভণ্ড হই না কেন, আমি সর্ব্বদাই অন্যকে সতর্ক করিতেছি, অন্যকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত রহিয়াছি,—কিন্তু নিজে যে আঁধারে, সেই আঁধারে! অন্যকে ভাল করার ইচ্ছা মন্দ নয়, কিন্তু যতক্ষণ অন্যকে ভাল করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছি, ততক্ষণ নিজে ভাল হইলে দোষ কি? সকলেই যদি নিজে নিজে ভাল হইত, তবে এ কলুষময় পৃথিবী স্বর্গধাম হইত। কিন্তু তাহা মানুষ হয় না, হইতে চায় না। ধর্ম্মটা যেন নিজের জন্য নয়, অপরের জন্য। এ পৃথিবীতে কত শত ব্যভিচারী ব্যক্তি যে অন্যের ব্যভিচারের নিন্দা রটাইয়া ফিরিতেছে, কত শত চরিত্রহীন ব্যক্তি যে অন্যের চরিত্র-হীনতার নিন্দা ঘোষণা করিয়া ফিরিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। দেখিয়া শুনিয়া এমনই বোধ হইতেছে, বিধাতার যেন কি একটা বাদ রহিয়াছে, মানুষ নিজে ভাল হইবার জন্য চেষ্টা করিবে না, ধর্ম্মকে গুরু পুরোহিতের মস্তকে চাপাইয়া রাখিবে এবং অন্যকে ভাল করিবার চেষ্টা করিবে! অন্ধ অন্ধকে পথ দেখাইবে, ইহা যেমন অসম্ভব, চরিত্রহীন অধার্ম্মিক ব্যক্তির পক্ষে অন্যকে ধার্ম্মিক ও চরিত্রবান করিতে পারাও তেমনি অসম্ভব। মানুষ এ সহজ কথাটাও বুঝিতে পারে না। সে

দিবানিশি হই-চই-পূর্ণ আস্ফালন হাঁকিয়া অন্যকে উদ্ধার করিতেই বাধিত হইবে!! "চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা"—কাজেই লোকেরা বিরক্ত হইয়া অবশেষে এই কথা বলিতে বাধ্য হয়।

ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া এ পৃথিবীতে যত লোক বাহিরে মাতামাতি করিয়া ফিরিতেছে,বাস্তবিক ইহাদের মধ্যে প্রকৃত ধার্ম্মিক কয়টী? অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে দলের পর দল উজাড় হইয়া যায়, একটীও প্রকৃত নিষ্ঠাবান ধার্ম্মিক মিলে না। চরিত্রে যে অটল, ধর্ম্মবিশ্বাসে যে পাষাণ-ভিত্তি, প্রেম-ভক্তিতে যে কুসুমনিভ,—এমন মধুর, এমন তেজিযান, এমন কোমল সচ্চরিত্র মানুষ অতি বিরল। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তির পরিচয় কিসে পাওয়া যায়? সাধুতা বা সচ্চরিত্রতা কি বলিয়া না বেড়াইলে প্রকাশিত হয় না? বলিয়া যে বেড়ায়,তার সাধুতার নিতান্ত অভাব। প্রকৃত চরিত্রের পরিচয় পাইবার আর কোন উপায় নাই,—তবে সচ্চরিত্রতার-সৌরভ তাঁর অন্তরগত ধর্ম্মভাব প্রকাশ করে। যে ব্যক্তি ভিতরে সৎ, বাহিরে তার আচার ব্যবহার সৎ হইয়া গিয়াছে। এ ভিন্ন চরিত্রের আর পরিচয় নাই। প্রকৃত ধার্ম্মিক ব্যক্তি মুখে চটুল ব্যক্তিগণের ন্যায় অনর্গল ভাষা-বমন করেন না, উচ্চ ধার্ম্মিকতার ভাণ করেন না,কিন্তু তাঁর মুখে চক্ষে বিনযের লেখা;—সদা মৃদু মধুর প্রসন্ন বদন-শোভা, তাঁহার মিষ্টালাপ,—তাঁহাকে এই সংসারের অতীত স্থানে সর্ব্বদা রক্ষা করিতেছে। তিনি নামাবলী বা গৈরিক বস্ত্রে শরীরকে আচ্ছাদিত করেন না, অথচ বৈরাগ্যরূপ নামজ্যোতির অপূর্ব্ব শোভা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভেদ করিয়া যেন বাহির হয়। তিনি হবিষ্যান্ন গ্রহণ করেন না, অথচ জীবের প্রতি তাঁহার দয়ার অবিরাম স্রোত চলিয়াছে! প্রাণগত এ সকল ভাব ভাষায় প্রকাশ করিতে হয় না। তিনি জানেন, বিধাতা যেমন রাখেন,তেমনি থাকিব,বিধাতা যা দেন,তাহাই খাইব। অবশ্য ও অট্টালিকা, উপবাস ও মিষ্টাহার, এ সকল তাঁহার নিকট কোন গণনার বিষয় নয়। তিনি এমন এক অটল স্থানে জীবন-ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, যেখানে এ সকল চঞ্চলতা কিছুই নাই। তিনি অন্যের মুখে বিধাতার নাম শুনিয়া সুখী নন, আপনি দিবারাত্রি নাম জপেন। একের ইচ্ছাকেই তিনি জীবনে পূর্ণ হইতে দেন, আর সকল বাহিরের চিন্তা পরিহার করেন। তোমার পৃথিবীর উপায় কি হইবে, সে গণনা তাঁহার নাই। তিনি জানেন, যে বিশ্ববিধাতা তাঁহাকে রাখিয়াছেন, তিনিই জগৎকে রাখিবেন। যা করিবার, তিনিই করিবেন। কিন্তু এরূপ তিনি-সর্ব্বস্ব-ময় ধার্ম্মিকের সংখ্যা এই পৃথিবীতে কত বিরল!!

আমরা সাধারণ লোক, আমাদের ধারণা এই, বিধাতা এখন যেন এ সংসারে নাই, এখন আচার্য্য বা প্রচারককেই ধর্ম্মের পাণ্ডাগিরি করিতে হইবে! তাঁহারা তাঁহাকে প্রকাশ না করিলে তিনি যেন অপ্রকাশিত থাকিয়া যাইবেন! আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের নীতি-পুণ্য—এখন সব গুরু পুরোহিতের হস্তে! তাই দেখ, দলে দলে প্রচারকেরা পৃথিবীতে ধর্ম্ম সমাজ গঠন করিতেছে, ধর্ম্মকে সংরক্ষণ করিতেছে, ধর্ম্ম প্রচার করিতেছে;—মানবের পরিত্রাণের পথ খুলিয়া দিতেছে!—ইহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবে?—পৃথিবীর পুরোহিত-

কুল, গুরুকুল, প্রচারককুলের রোষ-কষায়িত দৃষ্টি তোমাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে—পৃথিবীর অসংখ্য সম্প্রদায় তোমাকে গিলিয়া ফেলিবে! চতুর্দ্দিক এই কথাই শুনা যাইতেছে। একই রূপ কথা, একই রূপ ভাষা, একই রূপ শাস্ত্র চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইতেছে। মানুষ, মানুষকে বল পূর্ব্বক ধর্ম্মের কথা শুনাইয়া ছাড়িয়া দিতেছে। ধর্ম্মের কথা শুনিয়াই এখন লোকেরা নিরস্ত হইতেছে; ধর্ম্ম যে জীবনে পালন করিতে হয়, সে কথা ভুলিয়া যাইতেছে। ধর্ম্মকথা শুনাইবার কত বিধি প্রণালী আবিষ্কৃত হইতেছে, কত আদব্‌কায়দা বাহির হইতেছে। পৃথিবীর রাজা এইরূপ ধর্ম্ম প্রচারের সহায়তা করিতেছেন, পৃথিবীর সমাজ এইরূপ প্রচারের পথে অনুকূল-বায়ু প্রবাহিত করিতেছেন। কত প্রচারক, কত গুরু, কত পোপ, কত শ্রমণ, কত ভিক্ষুক, কত আচার্য্য পৃথিবীর অর্থে পরিপুষ্ট হইয়া বাজারে বাজারে ধর্ম্ম হাঁকিয়া ফিরিতেছেন। ধর্ম্ম-ব্যবসায়ীর পরিচ্ছেদ স্বতন্ত্র, ভাষা স্বতন্ত্র, আহার বিহার সবই যেন কেমন কেমন! তাঁহারা যেন এ পৃথিবীর লোক নন্। তাঁহাদের স্বর ঘানি-টানা স্বরের সহিত তুলিত, তাঁহাদের ভাষা যেন সপ্তম স্বর্গের তুলিকায় অঙ্কিত, তাঁহাদের উপবেশনাদি, সে সকলই যেন কিরূপ বিকৃত! কেন বলত? না—তাঁহারা যে স্বর্গের লোক,—ইহালোকের লোক ত নন্! ভালই। কাম ক্রোধাদি সম্বন্ধেও কি তাঁহারা বীতস্পৃহ? বিধাতা ক্ষমা করুন, বিধাতার সৃষ্টি রক্ষা হেতু জীবলীলায় প্রকৃতি পুরুষের মিলন একান্ত প্রয়োজন, ঐরূপ প্রশ্ন মুখেও আনিও না। এইরূপ ভণ্ড প্রচারকের সংখ্যা যে পৃথিবীতে কত আছে, তাহার সংখ্যা নাই। চিরকাল একটা শ্রেণীকে সংসার হইতে পৃথক করিয়া ধর্ম্মের উচ্চ স্থানে বসাইয়া রাখিলে তাহারা কিরূপে ভাল থাকিবে, বলত? তাহাদেরও ত রক্ত মাংসের শরীর! সেই জন্যই বলি, এই সকল দল তুলিয়া দিলে কি পৃথিবীর কল্যাণ হয় না? প্রত্যেক দলের মূলে দুই চারিজন ভাল লোক আছেন, কিন্তু তাঁহারা নীরব, দেখিয়া শুনিয়া অবাক! অল্প জলের পুঁটী মাছই অধিক চড়বড় করে;—গভীর জলের রুই মৎস্য স্থির, অচল—গম্ভীর। যখন চলিয়া যায়, একটুও শব্দ শুনা যায় না,—একটুও আড়ম্বর নাই। আর চুণা পুঁটীদের কথা?—কত শব্দ,—কত আড়ম্বর,—কত কেলি,—বার মাস যেন কি একটা উৎসব লাগিয়া রহিয়াছে! এই ভারতবর্ষে কত শত যোগী ঋষি, জীবনের আসক্তি ডুবাইয়া, গভীর গহন গিরি-গুহায় গভীর সমাধিতে নিমগ্ন রহিয়াছেন, কেহ তাঁহাদের খোঁজও রাখে না,—আর ধর্ম্মের পাণ্ডা একজন রেভারেণ্ড, একজন তর্কচূড়ামণি, একজন গোস্বামী তোমার বাড়ীতে পা ফেলুন, আর অমনি পৃথিবী তোলপাড় হইয়া যাইবে,—মহা উৎসব, মহা কেলী, মহা ধুম ধাম! বলি ধর্ম্মটা কি এমনই ঠুঁঠা জিনিস যে, হাসাহাসি নাচানাচি করিলেই তাহা উপার্জ্জিত হয়? কে না জানে যে, ঈশ্বর নিরাকার, অব্যক্ত, অনন্ত। আর কেই বা না জানে যে, মানুষ ক্ষুদ্র, সাকার, সীমাবদ্ধ, ব্যক্ত। মানুষের যতই শক্তি বিকশিত হউক না কেন, মানুষ মনুষ্যত্ব ছাড়াইয়া দেবত্ব লাভে অধিকারী হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু ঈশ্বরত্ব লাভে কখনই অধিকারী নন। মানুষ অনন্তকাল-

উন্নতিলাভ করিলেও ঈশ্বরত্বে, অর্থাৎ পূর্ণ জ্ঞানে, পূর্ণ ভাবে পৌছিতে পারিবে না। নিমাই চৈতন্য লাভ করিতে পারেন, শাক্য-সিংহ বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইতে পারেন, যিশু খ্রীষ্টত্বে পৌছিতে পারেন, আর না—মানুষের উন্নতির চরম অবস্থা ঐ খানে। আজ পর্য্যন্ত সেই অব্যক্তকে কেহই ব্যক্ত করিতে পারে নাই, কখনও পারিবে না। সেই ভূমা মহানকে কেহই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে বা দেহ-পিঞ্জরে আজ পর্য্যন্ত ধারণ করিতে পারে নাই—কেহ পারিবেও না। সেই অনন্ত অপারের কেহ কূল কিনারা করিতে পারে নাই - কেহ পারিবেও না। সহস্র বৎসর, লক্ষ বৎসর আয়ু পাও, আর লক্ষ বৎসর তপস্যা কর,—ফল একই—আপনি আপন চেষ্টায় কখনও সেই পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী হইবে না। যিনি আপনি যে ধর্ম্মের ঘর বাঁধে, তার নিকট হইতে বিধাতা অনেক দূর। আপনি যে কর্ত্তাগিরি করে, বিধাতা তাকে লাথি মারিয়া ভূতলে ফেলিয়া দূরে, অতিদূরে, চলিয়া যান। আর যে অনন্যগতি হইয়া তাঁর চরণে পড়ে, তিনি তাহাকে কৃপা করেন। তিনি কৃপা করিয়া মানুষকে যতটুকু তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে দেন, ততটুকু পর্য্যন্ত মানুষ বুঝিতে পারে, আর এক চুলও না। তাঁহাকে পাইবার তিনিই পথ, তাঁর রাজ্যের তিনিই প্রচারক, তাঁর সেবা বা পূজার তিনিই গুরু। আর পথ নাই, প্রচারক নাই, গুরু নাই। এখানে কথা এই, তাঁর কৃপায় তাঁকে যে লাভ করিয়াছে, সেও কি তাঁর কথা বলিতে অধিকারী নয়? আমরা বলি, অধিকার, অনধিকার, কৃপা-প্রার্থীর পক্ষে উভয়ই সমান; অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রচার না করিলেও বিধাতা তাহার চরিত্রের সৌরভে প্রকাশিত হইতেছেন। আর একটী কথা এই, সকলেই তাঁর কৃপার অধিকারী, সকলের জীবনেই তিনি প্রকাশিত। এ হিসাবে সকলেই তাঁহার প্রচারক। আমরা বলি, এক হিসাবে সকলেই গুরু বা প্রচারক, আর এক হিসাবে তিনি ভিন্ন আর কেহই নয়। মানুষ মধ্যে থেকে কেন চিহ্নিত বংশ বা চিহ্নিত ব্যক্তির মস্তকে টিকি বা ফুল-মালা চড়াইয়া পুরোহিত, আচার্য্য বা প্রচারকরূপ অপকৃষ্ট দলের সৃষ্টি করে কেন, আমরা মোটেই বুঝিনা। তবে ইহা জানি যে, মানুষ অন্যের উপরে ধর্ম্মের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে চায়! সেই জন্যই কি এইরূপ হয়?

কোটী কোটী বৎসর পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, কোটী কোটী লোকের অভ্যুত্থান হইয়াছে;—কোটী কোটী ধর্ম্ম সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে, কোটী কোটী প্রচারক-গোষ্ঠী নিযুক্ত হইয়াছে, কোটী কোটী শাস্ত্র প্রচারিত হইয়াছে --কিন্তু পৃথিবীর আজ কেন এরূপ অবস্থা? "ধর্ম্ম নাই, ধর্ম্ম নাই" - চতুর্দ্দিকে কেবল এই এক নিদারুণ কথা শুনি কেন? ইহার কারণ এই, মানুষ গুরু পুরোহিতের উপর ধর্ম্মের সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সংসারের পাপের সেবা করে। পূজার সময় পুরোহিত আসিয়া পূজা করিয়া গেল;—ব্রতাদি বা উপাসনার সময় আচার্য্য আসিয়া মনের আবেগে দশটা মন্ত্র বা কথা আওড়াইয়া গেল;—আর সংসারের লোক যেমন ছিল, তেমনি থাকিল! ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্যের উপর নির্ভর করিলে কখনও চরিত্র বা জীবনলাভ হয় না। আর সাধারণের

চরিত্রে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত না হইলেও ধর্ম্ম টিকে না। এজন্যই দেখা যায়, এক সময়ে যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের ষষ্টি-সহস্র প্রচারক ছিল, সে ধর্ম্ম আজ কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। খ্রীষ্ট-ধর্ম্মে সহস্র সহস্র প্রচারকের চেষ্টা এখন অরাণ্য জঙ্গলে লয় পাইতেছে- আর শঙ্করা-চার্য্যের বা চৈতন্যদেবের পবিত্র অদ্বৈত-বাদ ও প্রেমবাদ- কালের মহাকবলে লুক্কায়িত হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম আজ কাল শাঁক ঘন্টার আওয়াজে, মেষমহিষাদি বলিময় উৎসবে, গৈরিক বস্ত্রে,—বাহ্য ঘনঘটায়! শাক্তধর্ম্মের নামে আজ লোক ব্যভিচারের পোষকতা করে, চৈতন্যের প্রেম-ধর্ম্মের নামে আজ কাল সংসার স্ত্রী পুত্র ছাড়িয়া লোক বৈষ্ণবীর স্মরণ লয়। 'আর অহিংসা পরম ধর্ম্মের' নামে আজ আর্য্যাবর্ত্তে সুদের সুদ তস্য সুদ আদায় করিয়া দরিদ্র প্রজাগণের সর্ব্বনাশ করে। আর খ্রীষ্টধর্ম্মের নামে—"শূকরমণি ও ক্ষান্তমণিদের" পবিত্র রক্তে ধরা প্লাবিত! হা ঈশ্বর, কোথায় তুমি, ধর্ম্মের নামে পৃথিবীতে কি বীভৎসব্যাপার চলিতেছে, তুমি একবার দেখ। দেখ, তোমার নামে কেমন আশ্চর্য্য ধর্ম্ম প্রচার হইতেছে!!

গুরু পুরোহিতের চেষ্টা এইরূপই ব্যর্থ হয়;—চিরদিন হইবে। সামান্য ধূলির কীটানু হইয়া এত আস্পর্দ্ধা, বামন হইয়া স্বর্গের চাঁদ স্পর্শের সাধ, কখনই পূর্ণ হইবে না, কখনও হয় নাই। খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, মহম্মদ এই সকল পুরুষ-রত্নের চেষ্টা ও তপস্যার ফল কালের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। চন্দ্র সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, এখন জোনাকী বাতি জ্বালে! যত বড় লোকই হউক না কেন, আপন শক্তিতে কেহই সেই দেবাদিদেব মহা-দেবকে প্রচার করিতে পারে না। তিনি আপনি প্রকাশমান—চিরদিন, চিরকাল। মানুষ-সাধারণ তাঁহাকে দেখিবে না, চরিত্রে ধরিবে না, তবে কেমনে তাঁর ধর্ম্ম টিকিবে?

যে কথা বলিতেছিলাম। মানুষের প্রচারে কেবল মতামতের ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িকতা প্রচারিত হইয়া থাকে; তাহাতে প্রকৃত ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক গুণও পৃথিবীর উপকার হয় নাই। তাঁহারা ধার্ম্মিক ছিলেন, সে কিন্তু স্বতন্ত্র কথা। তাঁহারা বিধাতার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন, ঐ পর্য্যন্ত শেষ। মানুষের প্রতি জনের জন্য বিধাতা আপনি খাটিতেছেন, অন্ন পরিবেশন করিতেছেন—ঘরে ঘরে ফিরিয়া অভাব মোচন করিতেছেন। "তোমার দ্বারা কি তাঁহার ধর্ম্ম প্রচার করিবেন,—ধর্ম্ম তোমার একচেটিয়া পত্তনি মহাল," তোমার এ অহঙ্কার পূর্ণ কথা তিনি পূর্ণ হইতে দিবেন না। কেন, তাঁহার কি নিজের শক্তি নাই? তাঁহার এই অনন্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের কি গূঢ় অভিপ্রায় নাই? তিনি অনন্ত প্রকৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া দিবানিশি আপন তত্ত্ব জগতে অনন্তরূপে ঘোষণা করিতেছেন। কেবল তিনিই তাঁর ধর্ম্মের প্রচারক। তাই দেখ, তোমার আমার, সকলের ধর্ম্ম-প্রচারের ধুয়া, সকলের হই-চই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, বিস্মৃতির মহা আঁধারে সব গিলিয়া ফেলিতেছে, আর পূর্ণচন্দ্র ঘটনার অন্তরাল ভেদ করিয়া আপনি চিদাকাশে প্রকাশিত হইতেছেন। বিধাতা এইরূপ আপনি প্রকাশিত না হইলে কেহ তাঁহাকে প্রকাশ করিয়া দেখাইতে পারে না। তিনি কি মানুষের হাতের ক্রীড়ার পুতুল যে,

ধরিয়া তাঁহাকে দেখাইবে ? তাহা অসম্ভব। কিন্তু তবুও ত মানুষের ভণ্ডামি দূর হয় না। পদে পদে মানুষের অহঙ্কার চূর্ণ হইতেছে, কিন্তু তবুও মানুষ সেই অরূপ অব্যক্তকে উপভোগের পরিবর্ত্তে প্রচার করিতে যায়! কাজেই লোকে বলে, "চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা।"

আপন তত্ত্ব মানুষ জগতে প্রচার করিতে পারে, কিন্তু তাঁর তত্ত্ব প্রচারে অধিকারী নয়। অধিকারী নয়, কেবল ইহা নয়, তাঁর তত্ত্ব প্রচারে মানুষ সমর্থ নয়। তিনি ত কেবল আমাতে নন, তিনি তোমাতেও। তোমাতে আমাতে তাঁহার যেমন করুণা প্রকাশ, এই অনন্ত পৃথিবীতে তাঁহার সেইরূপ করুণার অনন্ত অংশ বিদ্যমান। অনন্তের লীলা অনন্ত অণুপরমাণু-ব্যাপী। আমি যে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র। আমি তাঁর অনন্ত তত্ত্ব কিরূপে প্রচার করিব? করিতে কি পারি ? তাহা অসম্ভব। মানুষ তাঁর কৃপায় তাঁহাতে ডুবিতে পারে, কিন্তু তাঁর তত্ত্ব প্রচার করিতে পারে না। যদি বল, তাঁর কৃপা হইলে পারিবে না কেন ? কারণ এই, স্বরূপতঃ তিনি অন্যকে দেখা না দিলে অন্যে তাঁহাকে দেখাইতে পারে না। কথাটা আর একটু বিশদ করিয়া বলি। একজন সন্দেশ খাইয়াছে, আর এক জন খায় নাই। যে খাইয়াছে, সে, যে খায় নাই তাহাকে, সন্দেশের মিষ্টত্ব কিছুতেই বুঝাইতে পারিবে না। যদি বল, যে খাইয়াছে, তাহাকে ত বুঝাইতে পারিবে ? আমরা বলি, যে সন্দেশ খাইয়াছে, তাহাকে বুঝাইবার কোন প্রয়োজন নাই। এই জন্যই দেখা যায়, সন্দেশের মিষ্টত্ব কেহই প্রচার করিয়া বেড়ায় না। মধু সন্দেশ অপেক্ষা সহস্র গুণে অধিক মিষ্ট। কাহার নিকট ? যে তাহার আস্বাদন লইয়াছে। যে আস্বাদন লয় নাই, তাহাকে কি ঐ মিষ্টত্ব বুঝাইতে পারিবে ? না, তাহা অসম্ভব। ঈশ্বরকে স্বরূপতঃ যে না দেখিয়াছে, তাহার নিকট তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করিতে মানুষের কোনই শক্তি নাই, কোনই অধিকার নাই।

আর যে ধর্ম্মের আস্বাদন পাইয়াছে, তাহার নিকট ধর্ম্মপ্রচারের ত কোন প্রয়োজনই নাই। তবে কেন ধর্ম্মপ্রচারের এত চেষ্টা? আমাদের বিবেচনায় ধর্ম্ম কেবল উপভোগের জিনিস, প্রচারের জিনিস মোটেই নয়। প্রচারে ইহার মিষ্টত্বের হানি হয়, কিছুই মিষ্টত্ব বাড়ে না,--কিছুই প্রকাশ হয় না। আর একটী কথা এই, সকল ব্যক্তি কিছু একই রূপ মিষ্টত্ব অনুভব করিতে পারে না। শরীরের পার্থক্যে, মানুষের ইন্দ্রিয়াদি সকলই বিভিন্ন প্রকার। একটা ফুল তুমি যেমন দেখ, আমি ঠিক তেমনি দেখি না। একটা জিনিসের তুমি যেরূপ আস্বাদন পাও, আমি কিন্তু সেরূপ আস্বাদন পাই না। সন্দেশের মিষ্টত্ব, ফুলের সৌরভ, চাঁদের জ্যোতি—এ সকলই অনন্ত লোকমণ্ডলীর নিকট অনন্ত রূপ। এক জনেরটী আর এক জনেরটীর সহিত মিলে না। ইহাকেই বলে, অনন্তের ব্যাপার—অনন্তের লীলা! আমি আমারটী তোমাকে বুঝাইতে পারি না, তুমি তোমার মতনটী আঁকিয়া দেখাইতে পার না। কেন ?—না—তাহা হইলে অনন্ত যে ধরা পড়ে, অনন্ত যে সনন্ত হইয়া যায়।

অনন্তকে সনন্ত করিতে মানুষ কিন্তু দিবানিশি ব্যস্ত। আমি আমার ঈশ্বরকে দেখাই,

তুমি তোমার ঈশ্বরকে দেখাও।—এইরূপ কত জনে কত জনের ঈশ্বরকে দেখায়! বস্তুত, ঈশ্বর একজন, না বহুজন? পৃথিবীতে যেরূপ ভাবে ঈশ্বরতত্ত্ব প্রচারিত হইতেছে, তাহাতে যেন বহুজন বলিয়াই মনে হয়। সহস্র ব্যক্তির, সহস্র প্রচারকের, সহস্র রূপ ঈশ্বর। খ্রীষ্টানের গড্, য়িহুদীদের জিহোবা, মুসলমানের আল্লা, হিন্দুর হরি—এ সকলই যেন পৃথক পৃথক। এক ঈশ্বরের কত নাম, কত রূপ! এক ঈশ্বরের কত অসংখ্য সম্প্রদায়! সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে কত মারামারী, কাটাকাটী!! এক ঈশ্বর কত বিকৃতরূপে জগতে বিঘোষিত হইতেছেন, দেখ। কেন এরূপ হইতেছে? না,—মানুষ আপনার খামখেয়ালীমত দ্বারা ঈশ্বরকে নির্ম্মাণ করিয়া জগতে প্রচার করিতেছে বলিয়া। মানুষ কল্পনার পূজা করে, করুক, ক্ষতি নাই, কিন্তু কল্পনার প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া—অনন্তকে সান্ত রূপে প্রকাশ করিয়া, সেই মহান ঈশ্বরের যে অবমাননা করিতেছে,—তাঁহার অনন্ত সৌন্দর্য্য যে খর্ব্ব করিতেছে, তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। ঈশ্বরের কৃপা হইলে মানুষ তাঁর অনন্ত স্বরূপের কিছু কিছু রূপ দেখিতে পারে বটে, কিন্তু তাহা তুলিকায় আঁকিতে গেলেই আপনার কল্পনা-জড়িত হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ বিকৃত হইয়া যায়! সে অরূপ কোটী তুলিকায়ও রূপ ধরেন না,—শত চেষ্টায়ও ভাষায় ব্যক্ত হন না। ঈশ্বরকে মানুষ যদি কেবল উপভোগ করিয়া ছাড়িয়া দিত, তবে বুঝি বা ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য এত খর্ব্ব হইত না,—ধর্ম্মকে লোকে অবহেলা করিত না, ছেলে খেলার ন্যায় এত অসার মনে করিত না, এবং ধর্ম্মের নামে এত অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইত না। ধর্ম্মটা কাল সহকারে মানুষের স্বেচ্ছার একটা খেয়াল বিশেষ হইয়া পড়াতেই নানা সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে, এবং ধর্ম্মের আচ্ছাদনে ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হইতেছে বলিয়াই ধর্ম্মসমাজে মারামারী কাটাকাটী চলিতেছে! এই ব্যক্তিত্ব যদি লোপ পাইত, তাহা হইলে ধর্ম্মের নামে একটা ব্যবসা চলিত না,—বিধাতার নামের স্থানে লোক-শাস্ত্র, পোপ, পাদ্রি, প্রচারক, আচার্য্য, গুরু, পুরোহিত পূজিত হইত না, ঈশ্বরকে ছাড়িয়া মানুষ বুদ্ধ, চৈতন্য বা খ্রীষ্টের চরণে ভক্তির অঞ্জলি দিত না। অতএব বুঝিতে আর বাকী নাই যে, ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা না করিয়া যদি মানুষ তাহা কেবল উপভোগ করিত, তবে ব্যবসাদারি ধর্ম্মপ্রচার বা গুরুগিরি পৃথিবীতে আর প্রশ্রয় পাইত না,—সাধারণের চরিত্রে ধর্ম্ম চিরকাল সমুজ্জ্বল থাকিত;—ধর্ম্মের নামে জাল জুয়াচুরি বা ব্যক্তিত্বের খেয়াল জগতে বিঘোষিত হইত না। কিন্তু যাহা হইবার, তাহা হইয়াছে,—পৃথিবীর বাজারে ধর্ম্মটা এখন টাকার দ্বারা ক্রীত বিক্রীত হইতেছে। যার দশটাকা আয় আছে, সেই একজন গুরু বা প্রচারকের প্রতি ধর্ম্মাধর্ম্মের ভার দিতে পারিতেছে। তাহাদিগকে ঘরে আনিয়া টাকার বিনিময়ে ধর্ম্মের মিষ্ট কথা শুনিতেছে, দশটা ব্যভিচারাদি অপকর্ম্ম করিয়াও টাকার বিনিময়ে সুযশ কিনিতেছে। আর নিরন্ন অর্থহীন দরিদ্র,—পৃথিবীর মত এই, ধর্ম্ম যেন তাহাদের জন্য নয়, নির্দ্দোষী হইয়াও তাঁহারা অকূল ধর্ম্মহীন অপযশের সমুদ্রে ভাসিতেছে! কি অলীক কথা!! টাকা, প্রকৃত ধার্ম্মিককে অধার্ম্মিক বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, ভণ্ড ব্যভিচারীকে ধর্ম্মের উচ্চসিংহাসন দিতেছে। যার

ঘরে যাগযজ্ঞ, আড়ম্বরময় পূজা অর্চনা, গুরু পুরোহিতের অধিষ্ঠান—সেই নাকি পৃথিবীতে বড় ধার্ম্মিক!! যে যত টাকা ব্যয় করিয়া ভোজাদি দিয়া অন্যের মনের তুষ্টি সাধন করিতে পারেন, সেই নাকি বড় ধার্ম্মিক!! ধর্ম্মের পবিত্র মস্তকে যদি কাল সহকারে এতই কলঙ্ক চাপিল, "তবে বল মা এখন দাঁড়াই কোথা!!"

বড় আশা ছিল, ব্রাহ্মসমাজ লৌকিক ধর্ম্ম এবং পুরোহিতের মূল উচ্ছেদ করিয়া ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকত্ব, বিশ্বজনীন উদারতা আবার জগতে বিঘোষিত করিবে! ভণ্ডামি, প্রতারণা, আবার ভয়ে কম্পিত-কলেবরে পলায়ন করিবে। কিন্তু মাটীর দোষ, আশা করিলে কি হয়! যে দেশ গুরু পুরোহিতের অপ্রতিহত অত্যাচারে ধর্ম্মহীন হইয়া মানুষের স্বেচ্ছা বা খেয়ালের ক্রীড়া স্থান হইয়া পড়িয়াছে, সেই দেশে আবার আচার্য্যবাদ, গুরুবাদ বা ভণ্ডামি-বাদ বিঘোষিত হইতেছে; আবার দীক্ষা-প্রণালী রটিতেছে, আবার ধর্ম্মের নামে ব্যক্তিত্ব প্রশ্রয় পাইতেছে; আবার টাকার দ্বারা ধর্ম্ম ক্রীত বিক্রীত হইতেছে! "আবার জোর যার মুল্লুক তার" এই কথা যেখানে সেখানে প্রশ্রয় পাইতেছে। "বল মা এখন দাঁড়াই কোথা?" কেবল ইহাই নয়। এই সমাজের অর্থে পরিপোষিত হইয়া এমন দুই একজন সাধক নাকি আবির্ভূত হইয়াছেন, যাঁহারা অন্যের ভিতরে স্বেচ্ছাক্রমে শক্তি-সঞ্চার করিয়া ধার্ম্মিক করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারেন! দলে দলে লোক 'রাতারাতি ধার্ম্মিক হইবার জন্য' সেই দিকে ছুটিতেছে! পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, শ্রীরামপুরের কেশব কর্ম্মকারই নাকি পরমাত্মাকে নিমেষের মধ্যে দেখাইতে পারে। এখন এ আবার কি শুনিতেছি? নানা বুজরুকির দেশে আবার কত অভিনব গুলিখোরের আড্ডার বুজরুকির মানে ন্যায় কথা শুনিতেছি! যে দেশে সহস্র সহস্র মূর্খ চরিত্রহীন ব্যক্তি কেবল গায়ে ভস্ম মাখিয়া বৃক্ষতলে অগ্নিকুণ্ডের পার্শ্বে উপবেশন করিয়াই কোটী কোটী লোকের পূজার উপহার বা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া আপন উদর পূর্ণ করিতে সমর্থ হইতেছে, সেই হতভাগ্য দেশে, অনন্ত ঈশ্বর-সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়াছি বলিয়া সভ্য সমাজের দুই এক জন লোক অন্যের ভিতরে শক্তি সঞ্চার করিতে চাহিলে, ধন জন লইয়া লোক যে সেই দিকে ছুটিবে, এটা বড় একটা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়! আজ আর তাঁদের শিষ্যের অভাব নাই—সুতরাং অর্থের মোটেই অভাব নাই—শিষ্যেরা চতুর্দ্দিকে পত্র লিখিয়া টাকার অভাব মিটাইয়া দিতেছে। যে যত টাকা দিতেছে, সে তত বড় ধার্ম্মিক বলিয়া পরিগণিত হইতেছে! সাধুত্বের নামে এ দেশে চির আদর, সুতরাং সকলেই অম্লানচিত্ত অর্থ ঢালিয়া দিতেছে! আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে—দেবলীলা আরম্ভ হইয়াছে!! অর্থের বিনিময়ে মানুষ দীক্ষা-মন্ত্র লইয়া সানন্দে ঘরে ফিরিতেছে। তার পর যার যা খুসি, সে তাহাই করিতেছে। ধর্ম্মের নামে আর একটা নূতন ব্যবসা আরম্ভ হইয়াছে। ব্রাহ্মসমাজ কিন্তু তবুও সতর্ক হইতেছেন না। ব্রাহ্মসমাজ বলিলেও যা বুঝি, তাতেও কতকটা এইরূপ লীলাই দেখি, কিন্তু কিছু নিষ্প্রভ। বাড়ীতে একটা অনুষ্ঠান হইবে, প্রচারক বা আচার্য্য না আসিলে সব যেন মাটী হইয়া যায়! সমাজে উপাসনা হইবে, বড় আচার্য্য না আসিলে অনেকের উপাসনাই হয় না! কাজেই এখানেও ধর্ম্মটা ক্রমে ক্রমে

আচার্য্যগত বা প্রচারকগত হইয়া উঠিতেছে, সাধারণের যে ইহাতে অধিকার আছে, সকলেই যে ঈশ্বরসাধন বা ঈশ্বর পূজার অধিকারী, এ মতটা চলিয়া যাইতেছে। সমাজের সাধারণ লোকের এমন একটা মত দাঁড়াইতেছে যে, প্রচারক বা আচার্য্য হইলেই যেন সচ্চরিত্র থাকিতে হইবে, আর সব লোক যেমন তেমন হউক, দোষ নাই। সাধারণ লোকের চরিত্রে, তাই দেখিতেছি, ধর্ম্মটা যেন উপরিভাগে ভাসিয়া রহিয়াছে, ভিতরে স্থান পাইতেছে না। ব্রাহ্ম-সমাজ এখনও এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। এই গুরুবাদের মূলবীজ কোথায়, প্রত্যেক ব্রাহ্মের একবার ধীরচিত্তে অনুসন্ধান করিয়া দেখা উচিত। একজনকে বর্জ্জন করিয়া আর দশ জনকে প্রচারক বা গুরুর পদে বরণ করিলে, গুরু পুরোহিতের দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে বই কমিবে না। সুতরাং খুব সতর্ক হওয়ার সময় উপস্থিত হইয়াছে। দীক্ষা-প্রণালী সমাজ হইতে একেবারে তুলিয়া দিয়া, সকলেই সকলের গুরু, সকলেই সকলের আচার্য্য, সকলেই বিশ্বেশ্বরের স্বতঃপ্রবৃত্ত ধর্ম্ম-প্রচারক, এই কথা বিঘোষিত করা হউক। অথবা ধর্ম্মসমাজে আবার গুরু ও প্রচারকেরই বা কি আবশ্যক? ধর্ম্মের প্রচারক একমাত্র বিশ্ববিধাতা, দীক্ষার গুরু একমাত্র জগতের ঈশ্বর। তিনি ভিন্ন তাঁর ধর্ম্ম আর কে প্রচার করিবে,—কে বা পারে? প্রচারকশ্রেণী তুলিয়া দিয়া তাঁর পবিত্রধর্ম্মকে জীবনে পালন করিবার জন্য সকলে বদ্ধ-পরিকর হউন। তাঁর পবিত্র ধর্ম্মের আভাস প্রতিজনের নিকট তিনিই প্রকাশ করিতেছেন। ধর্ম্মপ্রচার হওয়া যদি তাঁহার ইচ্ছাকৃত হয়, আপনি হইবে;—তাঁহার ইচ্ছা না হয়,—হইবে না। জগতের লোক ধার্ম্মিক হউক বা না হউক, সে দিকে দৃষ্টি না দিয়া, আমি কেমনে তাঁহাকে পাইব, এই চিন্তা দিবানিশি অন্তরে জ্বলুক;—হৃদয়ে গভীর অনুতাপাগ্নি প্রজ্বলিত হউক। ঘরে ঘরে উপাসনার রোল উঠুক। অন্যের উপায় কি হইবে, এ ভাবনা না ভাবিয়া কিসে নিজে পরিত্রাণ পাইব, এই চিন্তা জীবনের সার হউক। ব্রাহ্ম-সমাজ এখন প্রচার-ব্রত পরিহার করিয়া প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভে চেষ্টিত হউন, বিনীত প্রার্থনা। ষষ্টি সহস্র বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক ধর্ম্ম-হীনতায় ভারতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মকে স্থায়ী রাখিতে পারে নাই। কোটী কোটী গুরু পুরোহিত বিদ্যমান থাকিতেও সনাতন হিন্দুধর্ম্মের অঙ্গ-বৈলক্ষণ্য বা রূপ-বিকার উপস্থিত হইয়াছে;—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রশ্রয় পাইয়াছে। আবার কেন প্রচারের কথা! ধর্ম্মপ্রচারের কথা ভুলিয়া কি করিলে ধর্ম্ম উপভোগ করা যায়, সেই চেষ্টায় দিবানিশি ব্যস্ত হও। এস ভাই, প্রচার-বাসনাকে বিসর্জ্জন দিয়া ধর্ম্ম উপভোগ-বাসনাকে জীবনের সার করি। আপনি ধার্ম্মিক হইলে, চরিত্রবান হইলে কথা মুখে না বলিলেও দৃষ্টান্তে ধর্ম্মের মহিমা প্রচারিত হইবে। চরিত্রে যেমন ধর্ম্ম প্রচার হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কিসের ধর্ম্ম প্রচার, কিসের কি, আপনি মানুষ হও। "চাচা আপনার প্রাণ বাঁচা"—এই উপদেশ কি সুন্দর, কি জীবনপ্রদ; কি মধুর!!

কুমারিল ভট্ট।

(গত প্রকাশিতের পর।)

সুধন্বা নরপতির রাজশক্তির অন্তরালে স্থিতি করিয়া কুমারিলভট্ট বৌদ্ধদিগকে অত্যন্ত পীড়ন ও সর্ব্বতোভাবে পরাভূত করেন, এবং দক্ষিণাপথ হইতে সৌগতগণকে বহিভূর্ত করিয়া দেন। রাজা সুধন্বা সে সময়ে বৌদ্ধদিগের সংহার কামনায় যে আদেশ-লিপি প্রচার করেন, আমরা মাধবাচার্য্যের গ্রন্থ হইতে-নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"আসেতোরাতুষারাদ্রে র্বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকং।
ন হন্তি যঃ স হন্তব্যো ভৃত্যা নিত্যম্ব শাস্তৃপঃ॥"

রাজা স্বীয় ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন, এক দিকে সেতুবন্ধ অপর দিকে হিমালয় পর্ব্বত, ইহার মধ্যে বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত যত বৌদ্ধ আছে, সকলকে বিনাশ কর। যাহারা অপরের প্রাণসংহার করে না, তাহাদের প্রাণসংহার কর।

কুমারিল প্রথম জীবনে বেদ অধ্যয়ন করিয়া অতীব বেদভক্ত হন। ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হইয়াও বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন। বৌদ্ধগণ কর্ত্তৃক সেই বেদের অবমাননা হইতেছে দেখিয়া তিনি মর্ম্মাহত হন। কিসে বৌদ্ধদিগকে পরাজয় করিব, এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া, বৌদ্ধশাস্ত্র যথারীতি অধ্যয়ন করেন, এবং সেই শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া রাজা সুধন্বার সভায় বিচারে বৌদ্ধগণকে পরাজয় করেন। তাঁহার অধ্যবসায়কে শতবার ধন্যবাদ।

বৌদ্ধগণ তাঁহার প্রতি ভীষণ-অত্যাচার করিয়াছিল। সেই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্যই তিনি মহম্মদের ন্যায় বেদ ও অসি, উভয়ের বলে বলীয়ান হইয়া বৌদ্ধবিনাশ সাধনে কৃতসংকল্প হন।

মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত তদীয় ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে লিখিয়াছেন, শঙ্করাচার্য্যের এক শতাব্দী পূর্ব্বে কুমারিল বর্ত্তমান ছিলেন। তাহা হইলে আনন্দগিরি-কৃত শঙ্কর-দিগ্বিজয় গ্রন্থে লিখিত কুমারিলের সহিত শঙ্করাচার্য্যের পরস্পর সাক্ষাৎ এবং কথোপকথন ইত্যাদি সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করিতে হয়। কেবল উৎপত্তি গ্রন্থে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্যের এক শত বর্ষ পূর্ব্বে কুমারিল প্রাদুর্ভূত হন। দত্তজ মহাশয়ও প্রমাণ স্বরূপে সেই গ্রন্থের নামই উল্লেখ করিয়াছেন।

লোচনদ্বয় বন্ধন করিয়া অন্ধকার গহ্বরে রত্ন আহরণার্থে গমন করিলে, ঠিক বর্ত্ম ধরিয়া যে যাইতে পারিবে, একবারও পদস্খলন হইবে না, একবারও বামে কি দক্ষিণে বিপথে পাদ-বিক্ষেপ করিবে না, একথা কে সাহস করিয়া বলিতে পারে ?

কুমারিল বৌদ্ধ-সংহার প্রভৃতি গুরুতর পাপের অভিনয় করিয়া জীবনের শেষ দশায় তুষানল-প্রায়শ্চিত্ত করিতে উদ্যত, এমন সময়ে তাঁহার সহিত তরুণ যুবক শঙ্করাচার্য্যের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় কুমারিলকে যদি কিঞ্চিদধিক অর্দ্ধ শতাব্দী-পূর্ব্ববর্ত্তী বলা যায়, তাহা হইলে উভয় মতের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়।

শঙ্করাচার্য্য কোন্ সময়ে স্বীয় মত প্রচারে প্রবৃত্ত ছিলেন, তাহার আলোচনা করিলেই আমরা কুমারিলের কাল-নির্ণয়ে কিয়ৎ পরিমাণে সমর্থ হইব।

খ্রীষ্টের জন্মের ৫৪৩ পাঁচশত তেতাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বৈশাখীয়-পূর্ণিমা-রজনীতে শাক্যসিংহের মৃত্যু হয়। তৎপর কিঞ্চিদধিক সহস্র বৎসর পর্য্যন্ত বৌদ্ধ-ধর্ম্ম ভারতে অসাধারণ আধিপত্য বিস্তার করে। পুরাতত্ত্ব-বিৎ ডাক্তার ডব্লিউ, ডব্লিউ হণ্টার এবং এইচ,টি,কোলব্রুক সাহেব দ্বয়ের মতে খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন। সুবিজ্ঞ বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় শঙ্করাচার্য্যের যে জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে ৭১০ সাত শত দশ শকাব্দে শঙ্করাচার্য্য স্বীয় মত প্রচারে প্রবৃত্ত থাকেন, লিখিত আছে। মৃত মহাত্মা অক্ষয় কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় ভাগের শৈব সম্প্রদায় প্রবন্ধেও মহামনা হণ্টার সাহেবের মতই সমর্থিত হইয়াছে। কেবল বোম্বাই-বাসী ভণ্ডারকার মহাশয় ৬০২ ছয় শত দুই শকাব্দে শঙ্করাচার্য্য প্রাদুর্ভূত হন, লিখিয়াছেন। কিন্তু একথা প্রতিপন্ন করিতে তিনি বিশেষ কিছু প্রমাণ প্রয়োগ করেন নাই।

শঙ্করাচার্য্যের অভ্যুদয়ের সময় খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ ধরিয়া লইলে, কুমারিলকে উক্ত খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগের লোক বলিলে অসঙ্গত হয় না। কুমারিল যে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী, এ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ নাই।

শঙ্করাচার্য্য অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, মণ্ডনাচার্য্য ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি মহা মহা পণ্ডিতগণকে বিচারে পরাস্ত করিয়া এবং ভারতের চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে স্বীয় মত প্রচার করিয়া তিনি দিগ্বিজয়ী হন। তিনি একটী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের সংস্থাপক*। আর কুমারিল মহা পণ্ডিত হইলেও রাজা সুধম্বার সভা ব্যতীত অন্যত্র স্বীয় বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া যান নাই। সর্ব্বাগ্রে বৌদ্ধধর্ম্মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেও স্বয়ং কোন নূতনধর্ম্মমত প্রচার করেন নাই। সেই জন্যই কুমারিল ভস্মাচ্ছাদিত রহিয়াছেন।

কিন্তু যিনি বৌদ্ধধর্ম্মের সেই প্রবল আধিপত্যের সময়ে নির্ভয়ে সেই ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, তিনি যদি ধর্ম্ম-বীর নন,তবে ধর্ম্ম-বীর কে ?

এ সম্বন্ধে আর আমরা কিছু না বলিয়া, এক জন চিন্তাশীল লেখক কুমারিল সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"The Budhists and the Jainas overcome in argument, had their heads struck off with the axe, and crushed in a mill, and in this man-

* শঙ্করাচার্য্য শৈব সম্প্রদায়ের সংস্থাপক হইলেও শিবোপাসনার প্রবর্ত্তক নহেন। তিনি যে কাশীধামে যাইয়া শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছিলেন, সেই কাশীধামের বিশ্বেশ্বর (শিব মূর্ত্তি) বহু পূর্ব্ব হইতেই তথায় স্থাপিত রহিয়াছেন। দশ শত চব্বিশ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানাধম সুলতান মামুদ সোমনাথের শিব মন্দিরের ও শিবের যে দুরবস্থা করেন, ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন। মামুদের আক্রমণের বহু পূর্ব্বে সোমনাথ-শিব তথায় স্থাপিত ছিলেন। শিবের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বহুল প্রমাণ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

ner had their mischievous views suppressed." But Bhattapada was only an unworthy precursor of a grander movement led by the subject of our lecture, and if I should compare this, with the great Christain movement, Bhattapada might take the place of John the Baptist.*

সম্পূর্ণ।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর আচার্য্য চৌধুরী।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা।

রোগ-শয্যায়।

১

এই রুগ্ন শয্যা'পরে, পড়ে আছি সকাতরে,
পীড়িত দুর্ব্বল দেহ ধমনী অচল।
সহসা শোণিতে হেন, তড়িত পশিল কেন,
কেনরে অলস হিয়া হইল চঞ্চল!
নীরব নিশায় আজি, গগনে তারকারাজি,
অযুত অযুত কিবা ধিকি ধিকি জ্বলে।
বসি সবে স্থানে স্থানে, চেয়ে চেয়ে মোর পানে,
নীরব ভাষায় তারা কি জানি কি বলে॥
জীবন-প্রভাতে মোর, আসিছে কি নিশি ঘোর,
মিশাইতে প্রাণ দিবা মরণ-আঁধারে?
ক্ষীণ কায়া জীব-নদী, বহিতেছে নিরবধি,
একি ভাবে একি দিকে, আজি কি তাহারে
রোধিবে কালের শিলা, ফুরাবে লহরী-লীলা,
রবেনা একটী চিহ্ন বিপুল ধরায়?
হৃদয়ের লুব্ধ আশা, সুগভীর ভালবাসা,
সবই কি বিলীন হবে নীরব নিশায়?

২

ওই যে সুনীলাকাশে, অগণিত তারা হাসে,
একটী খসিয়া যদি পড়েরে তাঁহার;
কাহার কি ক্ষতি হবে? কেহ নাহি খোঁজ লবে,
কোথায় মিশিয়া যাবে কোলে নীলিমার॥
বিশাল জাহ্নবী নীরে, উঠে পড়ে ভেসে ধীরে,
বহে যায় কত বীচি কে করে গণন?
এক যায় আর আসে, আবার লহরী ভাসে,
সলিলের শোভা কিরে ফুরায় কখন?
অনন্ত জীবের ধাম সংসার, একটী প্রাণ
যদি গেল, কিবা ক্ষতি হইবে তাহার!
একাকিনী নিরজনে, বন-ফুল ফুটে বনে,
পড়িছে ঝরিয়া বক্ষে নীরব নিশার॥
বিস্মৃতি প্রবাহ মোরে, ভাসা'য়ে কি লবে ধীরে,
মিশে যাবে পরমাণু জাহ্নবী-সৈকতে;
থামিবে জীবন-বীণা, সাধিলেও বাজিবে না,
নীরবে বিদায় হব জগত হইতে?

শ্রীমতী বিনয় কুমারী বসু।

মলিনা।

১

নিতি এসে নিতি যেত ফিরে,
একাকিনী রূপসী কিশোরী।
নিবিবিলি পুকুরের তীরে,
আনমনে বেড়াইত ঘুরি'।

২

পুকুরে ফুটিত শতদল—
দেখিত না বালিকা তাহায়।
ভাসা ভাসা নয়ন যুগল,
কি জানি কি খুঁজিয়া বেড়ায়।

* See Sarva Series No. 2, P.4.

৩

ছোট দুটি কোমল চরণ
মাটী যেন ছুঁইতে না চায়;
ছাড়ি এই মানব-ভবন,
চায় যেন যাইতে কোথায়।

৪

বিষাদেতে মাখান মুখানি,
বেড়িত সোহাগে কেশ পাশি।
ব্যস্তভাবে লুটায়ে ধরণী,
ঢাকিয়া রাখিত রূপরাশ।

৫

প্রদোষেতে তারাটি সন্ধ্যার,
ফুটিত গগনে সমুজ্বল।
এক মনে মুখপানে তার,
অনিমিষে চাহিত কেবল।

৬

কামিনীর ডালেতে হেলিয়া,
কি ভাবিত মনেতে আপন।
অশ্রুজল মাটীতে ফেলিয়া,
চ'লে যেত কোথায় তখন।

৭

নিতি এসে নিতে যেত ফিরে;
একদিন দেখিনু না তা'য়।
দেখিনু না পুকুরের তীরে,
দেখিনু না কামিনী তলায়!

৮

শূন্য মনে চলিনু ভবনে;
দেখিলাম তারাটি সন্ধ্যার।
থাকিত চাহিয়া যার পানে,
আঁখি দুটি মলিনা বালার।

* * * * * *

৯

কোথা হ'তে বিষাদের গান,
ছুঁয়ে গেল পরাণ আমার:—
"দেখিব না, হায়, সে বয়ান!
ফুট না রে এ জগতে আর।"

শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র দাস।

—গোর

প্রেম।

অনুরাগ আশা প্রীতি স্নেহ খ্যাতি মান
প্রাণের লাবণ্যকর যত স্পর্শ আছে
কিছু নাহি প্রয়োজন, না আসুক কাছে
তুমি যদি হৃদয়েতে থাক বর্ত্তমান।
মনে হয় যেন কবে বসন্ত-সন্ধ্যায়
মলয়ের প্রীতিকর সুধীর সমীরে
দেখিতে ছিলাম বসি কেমনে তিমিরে
প্রকৃতি, সাজান ধীরে তারকামালায়।
উজ্জ্বল নক্ষত্র এক হৃদয়-গগনে
আচম্বিতে সেইদিন উঠিল ফুটিয়া,
উঠিল বসন্তে হর্ষে পিক কুহরিয়া,
আহুতি দিলাম প্রাণে নির্ম্মল কিরণে।
বস্তুগত প্রেম হ'তে এই ধ্যানময়
চিন্তাময় যোগময় প্রেমের উদয়।

শ্রীবেনোয়ারিলাল গোস্বামী।

প্রভাত।

আসিল প্রভাত,
জাগিল জগত,
গাইল পাখী মোহিল মন,
ফুটিল মুকুল,
বহিল অনিল,
নাচিল লতা—কুসুম বন!
উঠলো আমার
মেয়েটী সোণার—
উঠলো শরত প্রিয়ধন!
বাল-আঁখি দিয়া,
দেখালো চাহিয়া,
প্রভাতে প্রকৃতি সুষমা কেমন!

শ্রী—দেবী।

অমানিশা।

দিগন্ত আঁধার ক'রে
এসেছে তামসী নিশি,
অনন্ত আকাশ কোলে,
হাসেনা তারকা শশী ;
দাঁড়ায়ে কাতর প্রাণে
পরিয়ে মলিন বাস,
তারাশূন্য চাঁদশূন্য
অনন্ত গভীরাকাশ,
ঝরিছে শিশির জল
নয়ন হইতে তার,
মেঘেতে ঢেকেছে মুখ
লুকা'তে সে দুখভার ,
ধরণী ব্যথিত হ'য়ে
কাঁদিছে তাহার সনে,
চাঁদের বিরহে নিশি
কাঁদিছে আকুল প্রাণে
মৃদু কুলু কুলু রবে
বিষাদের গান গেয়ে,
আঁধারে ঢাকিয়ে মুখ .
তটিনী যেতেছে ব'য়ে ;
নিশিথিনী কাণে কাণে
ঝিল্লি শুধু ঝিঁ ঝিঁ স্বরে,
সান্ত্বনা করিতে তায়,
কি কহিছে বারে বারে।
আঁধারেতে মিশাইয়ে
নীরবে মৃদুল স্বরে,
বহিতেছে নৈশবায়
প্রকৃতি গভীর ক'রে ;
মরি কি বিষাদে আজ
ছে'য়েছে জগত প্রাণ,
আঁধারের মাঝে শুধু
উঠিছে বিলাপ তান।

শ্রীপ্রমীলা বসু।

প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা।

১। **পুরুষকার ;**—প্রথম ভাগ, মহাবীর গারফীল্ড। শ্রীউমাপদ রায় সঙ্কলিত ;মূল্য ৮০। পুস্তকখানির ছাপা অতি পরিষ্কার, বাঁধা বড়ই সুন্দর। কিন্তু ইহাতে পুস্তকের সৌন্দর্য্য কিছুই প্রকাশিত হইল না। মহাত্মা গারফীল্ড উনবিংশ শতাব্দীর একজন চরিত্রবান পুরুষপ্রধান ব্যক্তি। সামান্য কৃষকের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া, অতি শৈশবে পিতৃহীন হইয়া, মাতা এলিজার মাহাত্ম্যে এবং যত্নে পরিপালিত হইয়া অধ্যবসায় সহকারে গারফীল্ড আমেরিকার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া গিয়াছেন, ইহা মনুষ্যের পক্ষে অল্প সৌভাগ্যের কথা নয়। কিন্তু ইহাও গারফীল্ডের প্রকৃত মহত্ত্ব নয়। চরিত্র ও ধর্ম্মে গারফীল্ড উনবিংশ শতাব্দীর অদ্বিতীয় ব্যক্তি। এলিজা বাল্যকালে তাঁহার মনে যে ধর্ম্মের বীজ রোপণ করিয়া দিয়াছিলেন, কাল সহকারে তাহাই তাহার মহত্ত্বের দৃঢ় ভিত্তি হইল। তাঁহার জীবন আদর্শ জীবন। তিনি আমেরিকার গৌরব। এই পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবীরের জীবনচরিত বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করিয়া উমাপদ বাবু সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। অনুবাদ বলিয়া যে কেহ পুস্তকখানিকে তুচ্ছ করিবেন, সে যো নাই। ইহার ভাষা সরল, সরস, সুন্দর ভাবপূর্ণ। পড়িবার সময় অনুবাদ পড়িতেছি বলিয়াই বোধ হয় না। পুস্তকখানি

এত সুন্দর হইয়াছে যে, পড়িতে পড়িতে অনেকবার আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে, চক্ষু হইতে জল পড়িয়াছে। আমরা দেখিতেছি, উমাপদ বাবুর ভাষা জীবন-চরিতের নিতান্ত অনুকূল। আমাদের বিবেচনায়, এইরূপ সুন্দর পুস্তক স্কুলের পাঠ্যশ্রেণীতে ভুক্ত হওয়া উচিত। প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের উপায় কি, এই পুস্তক পাঠে সে শিক্ষা অতি সুন্দর রূপ হয়। স্কুলের ছাত্রেরা যে সকল ছাই পাশ ঘাটিয়া মরে, তাহার স্থানে এইরূপ সুন্দর পুস্তক কেন পড়ান হয় না; আমরা বুঝি না। পুস্তকখানিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য-লিষ্ট ভুক্ত করা একান্ত উচিত। কিন্তু এ কথা শুনিবে কে ?—অনুরোধ উপরোধে যে দেশে নানাপ্রকার পচা মাল কাটিয়া যায়, সে দেশে এরূপ জিনিসের আদর হইবে কেন ? ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়, সন্দেহ নাই। স্কুলে না পড়াইলেও, বাড়ীতে ছেলে মেয়েদিগকে এই পুস্তক খানি পড়ান উচিত। কেবল, ছেলে মেয়ে কেন, প্রবীণ লোকেরাও ইহাতে যথেষ্ট শিক্ষা পাইতে পারেন। যাঁহারা ইংরাজি-শিক্ষায় ধুরন্ধর হইয়াছেন, বাঙ্গালা পুস্তক ঘৃণায় স্পর্শও করেন না, তাঁহাদিগকেও এ পুস্তক খানি পড়িতে অনুরোধ করিতে পারি। গারফীল্‌ড ও ম্যাট্‌সিনি প্রভৃতির ন্যায় চরিত্রবান রাজনীতিজ্ঞের জীবনচরিত বর্ত্তমান সময়ে ঘরে ঘরে অধীত হয়, প্রার্থনীয়। উমাপদ বাবুকে এই কার্য্যের জন্য শত শত ধন্যবাদ।

পুস্তকখানির দুই চারি স্থানের ভাবা কিছু অস্পষ্ট হইয়াছে। গারফীল্‌ডের দুঃখের দিনে তাঁহার ভ্রাতা টমাস এবং জননী এলিজার কত কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছে; কিন্তু সৌভাগ্যের দিনে, অর্থাৎ গারফীল্‌ড যখন বিবাহ করিতেছেন, স্কুলে অধ্যক্ষ হইয়াছেন, তারপর যখন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছেন, সে সময়ে দুঃখী ভাই এবং দুঃখিনী জননীর কোন কথাই নাই। ইহাতে পুস্তকখানিকে বড়ই অসম্পূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। আহত শরীরে মৃত্যু-শয্যায় গারফীল্‌ডের সহিষ্ণুতা, মাতার শুশ্রূষা, স্ত্রীর পাতিব্রত্য এ সকল ছবি এ পুস্তকে মোটেই নাই। প্রথম অংশ যেরূপ হইয়াছিল, শেষাংশ যদি সেইরূপ হইত, তাহা হইলে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাসের ন্যায় ইহা সর্ব্বত্র আদৃত হইত, সন্দেহ নাই। আশা করি, উমাপদ বাবু এ সকল বিষয়ে ভবিষ্যতে দৃষ্টি করিবেন। এই দোষগুলি চাঁদের কলঙ্কমাত্র।

২। শ্রুবারি।—পুস্তকে গ্রন্থকারের নাম নাই, মূল্যও নির্দ্ধারিত হয় নাই। বোধ হয় এখানি সাধারণের জন্য নয়; সুতরাং সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

৩। মিঠেকড়া।—রাহুরচিত, মূল্য এক আনা। এখানি ব্যঙ্গ কাব্য—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্র নাথের 'কড়ি ও কোমলের' সংক্ষিপ্ত অথচ তীব্র সমালোচন। গ্রন্থকার নিজের ভাষায় বলেন—"সে যে রবি,—আমি রাহু

তুল্য মূল্য সবাকার
ধনী সে—দরিদ্র আমি
সে আলো—এ অন্ধকার!"

লেখক 'কড়ি ও কোমলের' যে সকল দোষ ধরিয়াছেন, তাহা সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকারের ব্যঙ্গকাব্য লিখিবার বেশ শক্তি আছে।

৪। কবিতা পাঠ।—এস, কে, লাহিড়ী কর্ত্তৃক প্রকাশিত—মূল্য ৴০। পুস্তক খানি অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু তবুও ভাল হয় নাই।

৫। সুলহরী।—প্রথম ভাগ—সখা যন্ত্রে মুদ্রিত, মূল্য ।० আনা। পুস্তক খানিতে "সু" বলিতে যাহা বুঝা যায়, তাহা কিছুই নাই;—না আছে ছন্দ, না আছে যতি, না আছে ভাব, না আছে রস। অথচ এখানি সুলহরী! "কাণা ছেলের নাম পদ্মলোচন আর কি!"

৬। ক্রিড়া ও কৌতুক।—তাহিরপুর,—প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা। এখানি ক্ষুদ্রাবয়ব মাসিক পত্রিকা। লেখা বেশ হইতেছে। পাঁচ অধ্যায়ে যে একটী ক্ষুদ্র উপন্যাস লেখা হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে।

৭। সতী বিপুলা।—শ্রীযাত্রামোহন দাস দ্বারা প্রকাশিত, মূল্য ।/०, চট্টগ্রাম। সতী বেহুলার কথা আমাদের দেশে কে না জানেন? বেহুলার নাম গ্রন্থকার [illegible]পুলা রাখিয়াছেন; যাহা হউক, এইরূপ [illegible]র জীবন কাহিনী পাঠে সকলেরই লাভ আছে। অনেকগুলি অস্বাভাবিক ঘটনার উল্লেখ করায় গ্রন্থখানির সৌন্দর্য্য কিছু খর্ব্ব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তবুও বলি, এ গ্রন্থ পাঠে অনেকবার আমাদের শরীর রোমাঞ্চিত হইয়াছে,—অনেকবার অশ্রুপাত হইয়াছে।

৮। শ্মশান সঙ্গীত।—প্রথম ভাগ শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক বিরচিত। বগুড়া সুতরাপুর হইতে প্রকাশিত, মূল্য ৵০ আনা। পুস্তকখানিতে অনেকগুলি সরস সঙ্গীত আছে। আমরা পড়িয়া সুখী হইলাম।

৯। অমৃত-পুলিন।—উপন্যাস। এক জন পরিব্রাজক প্রণীত, মূল্য এক টাকা মাত্র। সচরাচর বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র হইতে কথা [illegible] "উপন্যাস" বলিয়া প্রকাশিত হয়, এখানি তাহাদের অপেক্ষা ভাল। গ্রন্থকার যিনিই হউন, বাঙ্গালা ভাষার উপর তাঁহার বিলক্ষণ অধিকার আছে। গ্রন্থের অনেক স্থলের বর্ণনা যারপর নাই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি চরিত্র ইতিহাস হইতে গৃহীত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেগুলি গ্রন্থকারের হস্তে পড়িয়া একেবারে মারা গিয়াছে। চাঁদ সুলতানা ও রাণা প্রতাপ সিংহ আমাদের কথার সাক্ষী। লেখক অনেক স্থলে ঐতিহাসিক সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই। এই গ্রন্থে দেখিতে পাই, চাঁদ বিবি কলঙ্কিনী,—তিনি নীচ স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া,ক্ষমতা সত্বেও মোগলগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন; প্রতাপ সিংহ আকবরের আহ্বানে কলের পুত্তলির ন্যায় মোগল ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন ইত্যাদি। বাস্তবিক এই উপন্যাস পড়িতে বেশ আমোদ আছে। গ্রন্থকার কোথা হইতে এই সকল "সত্য" সংগ্রহ করিয়াছেন, দয়া করিয়া তাহা আমাদিগকে বলিয়া দিলে ভাল করিতেন।

১০। কারাস্থ বালরাজ।—বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক, হাবড়া জেলার স্কুল সমূহের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ইন্সপেক্টর শ্রীমাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত প্রণীত ও প্রকাশিত; মূল্য আট আনা মাত্র। গ্রন্থ খানি ইংরাজির অনুবাদ হইলেও সুখপাঠ্য হইয়াছে। ভাষা বেশ সরল ও মধুর। উপক্রমণিকায় ফরাসীরাষ্ট্রবিপ্লবের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা সংক্ষিপ্ত হইলেও সুন্দর। আমরা সকলকে ইহা এক একবার পড়িতে অনুরোধ করি।

কি ছিল, কি আছে, কি চাই।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

আমাদের দেশে রাজা ও প্রজার মধ্যে কি সম্বন্ধ ছিল এবং কিরূপ সম্বন্ধ আছে তাহা আমরা আলোচনা করিয়াছি, এক্ষণে কিরূপ সম্বন্ধ থাকা আমাদের অভিপ্রেত এবং সঙ্গত, আমরা তাহারই আলোচনা করিব।

কোন এক ব্যক্তিকে রাজা কর, কিম্বা একটী পঞ্চায়ত-সভাকেই রাজা কর, কোন এক ব্যক্তি অথবা ব্যক্তি-সমষ্টির হাতে সমাজের মধ্যস্থ শক্তি ন্যস্ত থাকা যে উচিত, পৃথিবীর মধ্যে নিহিলিষ্ট-সম্প্রদায় ব্যতীত আর কেহ আজ পর্য্যন্ত একথা অস্বীকার করিতে পারেন নাই। সুতরাং একথা একরূপ সর্ব্ববাদী সম্মত।

এক্ষণে এই মধ্যস্থ-শক্তি কিরূপ লোক অথবা ব্যক্তি-সমষ্টির হাতে থাকা প্রয়োজন, সে বিষয়ে অনেক বিবেচনার কথা আছে। যে বিষয়ে যিনি মধ্যস্থ বরিত হন, সে বিষয়ের সর্ব্বাঙ্গীন অবস্থা তাহার বিশেষ রূপে অবগত থাকা আবশ্যক। আর যদি নিজে অবগত হইতে না পারেন, তবে যাঁহারা বিশেষ রূপে অবগত আছেন, এরূপ উপযুক্ত লোকের সহযোগিতা গ্রহণ করা তাঁহার পক্ষে উচিত। রাজশক্তি সমাজের মধ্যবর্ত্তী শক্তি, সকলেই যে সে শক্তি পরিচালনের উপযুক্ত ব্যক্তি হইতে পারেন না, সে কথা তর্ক বিতর্ক করিয়া নির্দ্ধারণ করা অনাবশ্যক। মধ্যবর্ত্তিতা করা সকলের সাধ্যে কুলায় না। এ কথা সকলেই বুঝেন। রাজবংশে জন্মিলেই রাজোচিত গুণে সকলে তুল্যরূপে অলঙ্কৃত হন না, রাজকুলেও মূর্খ, অবিবেচক এবং অধর্ম্মপরায়ণের জন্ম হইয়া থাকে, সুতরাং রাজকুমারকেই রাজক্ষমতা অর্পণ করা যায় না। যিনি রাজকীয় ক্ষমতা পরিচালনের উপযোগী গুণে অলঙ্কৃত, তিনিই মাত্র রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারেন, এবং যিনি গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহাকেই প্রদান করা উচিত, তাহাতে জাতি [illegible] বংশ এ সমুদয় বিবেচনা নিষ্প্রয়োজন। এক ব্যক্তির দ্বারা যদি সমাজের অবস্থানুসারে এ রাজভার কুলন না হয়, বহুব্যক্তির হাতে এ ভার দাও। আজ এ রাজনৈতিক সত্য অল্পাধিক পরিমাণে পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই গৃহীত হইয়াছে, সংসারে এরূপ এক দিন আসিয়া উপস্থিত হইবে, যে দিন রাজশক্তি বংশপরম্পরাগত না হইয়া গুণপরম্পরাগত হইবে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থায় এ নীত্যনুসারে কাজ চলিতে পারেনা। আজ ইংলণ্ডের ভাগ্য এবং ভারতের অদৃষ্ট, যে কারণেই হউক, একসূত্রে গ্রথিত। এই সূত্র আজি বিচ্ছিন্ন হইলে [illegible] জাতিরই বিষম অনিষ্ট। ইংরাজ যদি বলেন, তিনি কেবল নিঃস্বার্থ লোক-হিতৈষণা-বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া মাতৃপিতৃ-সহবাসসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভারতের অসহ্য তাপে সোণার অঙ্গ কাল করিতেছেন, তবে তাহার সে কথাকে আমরা সত্য কথা বলিয়া মনে করিব না। ইংরেজ ভারতবর্ষের যে উপকার করিতেছেন, প্রতিদিন ভারতবর্ষ হইতে তদপেক্ষা কম উপকার প্রাপ্ত হইতেছেন না। ইংরেজ পরিশ্রমী, চিন্তাশীল, উত্থান-ক্ষম, শ্রম-সহিষ্ণু এবং অধ্যবসায়ী, কিন্তু এ সকল শক্তির ক্ষেত্র চাহি, নচেৎ ইহার বিনাশ হইতে [illegible] ভারতবর্ষ ইংল-

ণ্ডের সমুদয় শ্রমজাত পদার্থের গ্রাহী; ইংরেজ যাঁহার তন্তুনির্ম্মিত বসনাদি, কল-নির্ম্মিত অন্যান্য দ্রব্যাদি কিম্বা তাঁহার লবণাক্ত সমুদ্রের বিশুদ্ধ কর্দ্দমরাশি লইয়া যদি দেশান্তরে যান, সে স্থানে স্থানীয় প্রতিযোগিতা এবং অন্যান্য সমশক্তিশালী সমব্যবসায়ীর প্রতিযোগিতার সম্মুখে তাঁহাকে অনেক স্থানেই ক্ষতিগ্রস্ত এবং ভগ্নমনোরথ হইতে হয়, কিন্তু ভারতবর্ষে তাহার সে আশঙ্কা নাই, তিনি নির্ব্বিবাদে, নিজের শ্রমজাত পদার্থের বিনিময়ে জীবনের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া লইতে পারেন। ইংলণ্ডের মূলধন অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভারতবর্ষে নানা ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হইতেছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে এত ধন এরূপ ভাবে ব্যবহার করা নানা কারণে তত সুবিধাজনক হইত না, এ সমুদয় কথা ইংরেজকে স্বীকার করিতেই হইবেক। আবার অন্যদিকে ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের অবলম্বনে জ্ঞান বৃদ্ধি ও দিন দিন নিজের অবস্থাকে উন্নত করিতেছেন। এই নিমিত্তই আমরা বলিতেছি যে, এ দুই দেশের মধ্যে বর্ত্তমান সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে উভয় দেশেরই বিষম ক্ষতি।

যাহাতে বর্ত্তমান সম্বন্ধ বিনষ্ট হয়, এক্ষণে আমাদের এরূপ কিছুই করা উচিত নহে। শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পশ্চাত পশ্চাত জাতীয় সমরে অগ্রসর হইতে হয়। ইংলণ্ডের সন্তানের নিকট ভারতসন্তানের অনেক বিষয় শিখিবার আছে। ভারতবর্ষের জ্ঞানাচার্য্য আর্য্যঋষিগণের শিক্ষক আজিও কেহ ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন কি না, সে কথার কোন উত্তর আমরা এক্ষণে দিব না, না করিয়া থাকেন ভালই, কিন্তু তাহাতে আমাদের কোন ফল দর্শিবে না। আমরা ডালভাতের অথবা ডাল রুটির কাঙ্গালী, সাংখ্যযোগীর ন্যায় কেবল তত্ত্বান্বেষু হইলে আমাদের চলে কৈ? কাজেই যে উপায়ে আমরা শীতের সময়ে পিঠে কাপড় দিতে পারি, ক্ষুধার সময় নির্ব্বিবাদে পেটে ভাত দিতে পারি, নিজে সামান্য সম্পত্তি এবং গৃহ পরিবার অত্যাচারীর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি, আমাদের সেই সমস্ত উপায় অবলম্বন করা উচিত। অবস্থানুযায়ী এই সমুদয় প্রয়োজন-সাধনের উপযোগী উপায় অবলম্বন করা এক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের সাধ্যায়ত্ত এবং শক্তির অন্তর্গত নহে, কাজেই কোন এক ধনবান ও শক্তিশালী জাতির আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত আমাদের আর সম্প্রতি উপায়ান্তর নাই।

সকৃতজ্ঞ হৃদয়েই বলি আর আবশ্যকতার বশবর্ত্তী হইয়াই বলি, আমাদিগকে এ কথা বলিতে হইল, যে কি চাই, এ প্রশ্নের উত্তর—ইংলণ্ডের সহিত ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সম্বন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকা চাহি। ইংলণ্ডের রাজাই আমাদের থাকিবেন, একের অবলম্বনে অন্যে উপকৃত হইয়া উভয়ের অভাব উভয়ে পূরণ করিয়া লইবেন।

এ সম্বন্ধে এক্ষণে কথায় যে ভাবে আছে, কার্য্যে যদি সে ভাবে থাকিত, তবে আজ এরূপ প্রস্তাবের আলোচনার কথাও বোধ হয় কাহারও মনে পড়িত না। কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্যবশতঃ কথা এবং কার্য্য অনেক দিন হইতেই এক রাস্তায় হাঁটে না। এটী সভ্যতার ফল কি কিসের ফল, তাহা আমরা জানিনা, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যে সর্ব্বত্রই এই রূপ অবস্থা, তাহা বিশেষরূপ

অবগত আছি। সে যাহা হউক, এক্ষণে আমাদের বক্তব্য এই যে, একের অবলম্বনে অন্যে উপকৃত হইয়া উভয়ের অভাব উভয়ে পূরণ করিতে পারেন, এরূপ ভাবে ভারতবর্ষের রাজকার্য্য এক্ষণে পর্য্যালোচিত হইতেছে না। সে সমুদয় যে কেবল রাজকর্ম্মচারীগণের দোষ, সে কথা আমরা বলিতে পারি না। তাহারা শত জ্ঞানবান শত বুদ্ধিমান হইলেও বিদেশী লোক, আমাদের রীতি নীতি, জীবনের প্রয়াস অভাব, এ সমুদয়ই তাঁহাকে পুস্তক পড়িয়া জানিতে হয়। পুস্তকগত বিদ্যা আর ভুয়োদর্শনজাত বিদ্যার মধ্যে অনেক প্রভেদ। ভুয়োদর্শন ব্যতীত পুস্তক সাহায্যে কোন দিনই পদার্থ-জ্ঞান সম্ভবে না। কাজেই রাজপ্রতিনিধি এবং রাজসচিব ও রাজসদস্যবর্গ জ্ঞানী হইয়াও আমাদের অবস্থা এবং অভাব সম্বন্ধে অজ্ঞান। যিনি যে বিষয়ের অবস্থা অবগত নহেন, তিনি সে বিষয়ের ব্যবস্থা কিরূপে করিবেন? কাজেই ভারতবর্ষের রাজশক্তির ক্রিয়া অনেক সময় একদেশদর্শী হইয়া পড়ে।

এইরূপ একদেশদর্শিতার উদাহরণ আমরা কত স্থানে দেখাইব? সমাজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সম্বন্ধ নির্ধারক যত ব্যবস্থা এক্ষণে ভারতবর্ষে প্রচলিত, তন্মধ্যে প্রজা এবং ভূম্যধিকারীর সম্বন্ধ নির্ণায়ক ব্যবস্থাই সর্ব্বপ্রধান, কারণ আমাদের দেশে ৯৯ জনই প্রজা শ্রেণীভুক্ত, আর একজন মাত্র ভূম্যধিকারী। এই দুই শ্রেণী সম্বন্ধে ১৮৮৫ সালে যে ৮ আইন প্রচলিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা উভয় শ্রেণীর মধ্যে অসুবিধা বৃদ্ধি হইয়াছে, না হ্রাস হইয়াছে? আমরা, ১২৯১ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারতে এই আইন বিধিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বেই যে সমুদয় অসুবিধা হইবে বলিয়া আলোচনা করিয়াছিলাম, এক্ষণে দেখিতেছি, কার্য্যত তাহাই হইতেছে। দুই শ্রেণীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাব দিন দিন সমধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতেছে। অনেক স্থানের প্রজা নিজের রায়তি সত্ত্ব অর্থ লোভে অন্য ভূম্যধিকারীর নিকট বিক্রয় করিতেছে, তদুপলক্ষে নানাপ্রকার শান্তিভঙ্গ হইতেছে। পূর্ব্বে এই দেশে বিচার বিভাগ এবং রাজকার্য্য পরিচালন বিভাগ পৃথক পৃথক ছিল, বর্ত্তমান সময়ে উভয় বিভাগ একরূপ একত্র করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা বিচারকার্য্য যে কতদূর কলুষিত হইতেছে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এক ম্যাজেষ্ট্রেট সাহেবই দক্ষিণ মুখে বসিলে কালেক্টর, পূর্ব্ব দিকে মুখ রাখিলে জেলার পুলিসের অধিনায়ক, পশ্চিম দিকে ফিরিয়া বসিলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতির নিয়ন্তা, উত্তরমুখে বসিলে বিচারক। আমরা এরূপও দেখিয়াছি যে, ম্যাজেষ্ট্রেট যে পুলিস চালানি মোকদ্দমায় পুলিসকে আসামী চালান করিতে আদেশ দিয়াছেন, সেই মোকদ্দমা নিজে বিচার করিতেছেন, সেই আসনে বসিয়াই আবার সেই মোকদ্দমার কি ভাবে তদ্বির করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে পুলিসকর্ম্মচারীকে পরামর্শ দিতেছেন। এরূপ অভিনয় অনেক স্থানেই দেখা যায়। আমরা এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রত্যেক বিভাগে দেখাইতে পারি। কিন্তু আমাদের এ প্রবন্ধে সে বিষয়ের বহুল আলোচনা সঙ্গত নয়। আমরা যে দুইটী দৃষ্টান্ত দিয়াছি, তাহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, বিধান-কর্ত্তৃগণের ইচ্ছা যতই নিরপেক্ষ হউক না কেন, স্থানীয় অবস্থা বিশেষরূপে অবগত না থাকায় [illegible] তাঁহাদের

ব্যবস্থা অবস্থানুযায়ী অথবা সময়োপযোগী হয় না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, কেন ব্যবস্থাপক সভায় ত এ দেশীয় সভ্য আছেন, তাঁহারাও কি দেশের অবস্থা জানেন না? আমাদের দুঃখের সহিত এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইল, না তাঁহারাও জানেন না। যাঁহারা দেশের ধনী মানী (অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট) গণ্য এবং পরিচিত, তাঁহারাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বঙ্গদেশের অনেক লোকে তাঁহাদিগকে চিনেন না, কলিকাতা অথবা তাহার নিকটবর্ত্তী সমাবস্থাপন্ন ব্যক্তিদিগের সহিত তাঁহাদের আলাপ পরিচয়; তাঁহাদের অবস্থা, তাঁহাদের অভাব তাঁহারা যতদূর জানেন, পল্লীগ্রাম নিবাসী অপগণ্ড দরিদ্র কৃষকের অবস্থা বা অভাব তাঁহারা ততদূর অবগত নহেন। অনেকে বোধ হয়, কলিকাতা এবং তাহার নিকটবর্ত্তী দুই একটী স্থান ব্যতীত অন্যত্র গমনই করেন নাই। পত্রিকা এবং পুস্তকের পৃষ্ঠায় দৃষ্টি করিয়া স্থানীয় অবস্থায় অভিজ্ঞতা জন্মে না, সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার সভ্যগণের অভিজ্ঞতা যে অল্প হইবে, সে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

প্রকৃত প্রস্তাবে যাঁহারা দেশের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা বিশেষরূপে অবগত আছেন, এবং লোকেরা যাঁহাদিগের মতামত দ্বারা পরিচালিত হয়, সে সমুদয় ব্যক্তিগণের নামও হয় ত গবর্ণমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারীদিগের কর্ণে এক্ষণ পর্য্যন্ত প্রবেশ করে নাই। যিনি যে স্থানে আছেন, তাঁহার নিকটবর্ত্তী কতক পরিমাণ স্থান ব্যতীত অন্যত্র তাঁহাদিগের নাম তত পরিচিত হইবার সম্ভব নয়। তাঁহারা তাঁহাদিগের আড়ম্বরশূন্য জীবন, আড়ম্বর-শূন্য ভাবেই চালাইতেছেন; তাঁহারা দামামা বাজাইয়া কাঁদিতে শিখেন নাই, কি দেশস্থ দুঃখ-পীড়িত লোকদিগের দুঃখ দূর করিবার নিমিত্ত ভগবান তত শক্তি প্রদান করেন নাই, তারপর পিতৃপিতামহের নামে দেশে তত সুপরিচিত নন; এরূপ লোককে গবর্ণমেণ্ট চিনিবেন কিরূপে? যাহাদের মধ্যে এই সকল ব্যক্তি দিবা রাত্রি বিচরণ করেন, যাহাদের স্বভাব ইঁহাদিগের উপদেশ বা অনুকরণে কতক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহারাই মাত্র এই ব্যক্তিদিগকে জানেন, শ্রদ্ধা করেন, ভক্তি করেন এবং বিশ্বাস করেন; অন্যের নিকট এই সমুদয় ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে অপরিচিত।

আজ যদি ভারতবাসী প্রজামণ্ডলীকে জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তাহাদের অবস্থা বুঝিয়া কোন্ কোন্ ব্যক্তি উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারিবেন বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস? তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে, গবর্ণমেণ্টের নিকট দাখিলী তালিকায় তাহাদের নির্দ্দিষ্ট অনেক নামই দেখিতে পাওয়া যাইবেনা যাহাদিগের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও গবর্ণমেণ্ট এক্ষণ পর্য্যন্ত বিন্দুমাত্র অবগত নহেন।

উল্লিখিত প্রকারের ব্যক্তিগণের মধ্যে যে অনেকে ভারত সাম্রাজ্যের গুরুভার বহন করিতে অক্ষম, সে বিষয় বোধ হয় সকলেই সমস্বরে স্বীকার করিবেন। কিন্তু ভারত-শাসনের সহায়তা করিতে সক্ষম ব্যক্তি আজও ভারতবাসীর মধ্যে একান্ত বিরল নহে।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এক্ষণে যাঁহারা সামাজিক অথবা প্রদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হন, তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের লোকের প্রতিনিধি স্থানীয় নহেন। গবর্ণমেন্ট তাঁহাদিগকে প্রতিনিধিস্থানীয় লোক মনে করিয়া তাঁহাদিগকে মনোনয়ন করেন বলিয়াই তাঁহারা প্রজাপ্রতিনিধি স্বরূপ সদস্য সভার আসন প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এরূপ ভাবে সদস্য গ্রহণ করিলে সদস্য-গ্রহণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হয় না, স্থানীয় লোকের অভাব এবং আকাঙ্ক্ষা প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যবস্থাপক সভায় জ্ঞাপিত হইতে পারে না। সুতরাং আমাদের প্রার্থনা,—

সামাজিক এবং প্রদেশিক ব্যবস্থাপক সমিতিতে দেশীয় প্রজাদিগের কর্তৃক মনোনীত সদস্য গৃহীত হয়।

আমরা রাজার নিকট এক্ষণে আর কিছুই চাহি না, এই কার্য্যকরী শক্তি গঠিত হইলে, কার্য্য নিশ্চয়ই সম্পাদিত হইবে, তখন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা দ্বারা তৎকালীয় অভাবও নিশ্চয়ই দূর হইতে পারিবে। বিশেষ বিশেষ বিভাগে কি পরিবর্ত্তন আবশ্যক, সে বিষয়ের আলোচনা আজ এক দিকে যেরূপ নিষ্প্রয়োজন, অন্যদিকে সেইরূপ অসম্ভব। উন্নতিমুখে ধাবিত সমাজ, পরিবর্ত্তন হইতে পরিবর্ত্তনের মধ্যে যাইয়া পতিত হয়, এবং তাহার নূতন অবস্থায় তাহাকে নূতন প্রণালীতে পরিচালন করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা হইতে নানারূপ অসন্তোষ এবং অশান্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং নবজাত উচিত আকাঙ্ক্ষা যাহাতে পরিপূর্ণ হয়, সময়ানুযায়ী অভাব যাহাতে বিদূরিত হইতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা উচিত; আবার পক্ষান্তরে অনুচিত এবং অনিষ্টকর আকাঙ্ক্ষা যাহাতে কোরকাবস্থায়ও উৎপাটিত হয়, সেরূপ বন্দোবস্ত থাকাও আবশ্যক। এই প্রকার প্রজা-মনোনীত ব্যবস্থাপক সমিতির কোন্ বিষয়ে কতদূর ক্ষমতা থাকিবে, তাহার বিশেষ কোন কথার উল্লেখ করিতে চাহি না, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, এরূপ ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন যে, সদস্যগণ প্রত্যেক বিভাগের দোষগুণ অবগত হইতে পারেন, সমালোচনা করিতে পারেন, সংশোধনের প্রস্তাব করিতে ও সংশোধনের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারেন। যুদ্ধ এবং সন্ধি প্রভৃতি, যাহার প্রতি সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্ব নির্ভর করে, সে সমুদয় বিষয়ে, রাজপ্রতিনিধি, সদস্যগণের মত-নিরপেক্ষ হইয়া, আবশ্যকমত আজও যেরূপ কার্য্য করিতেছেন, অন্য সময়েও ঠিক সেইরূপই কার্য্য করিতে পারিবেন।

আমরা মোটের উপর এক্ষণে এই চাই,—

(ক) সম্রাজ্ঞী এক্ষণে যেরূপ ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী, তিনি এবং তাঁহার বংশধরগণ সেইরূপভাবে এ দেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়া, তাঁহার ইংলণ্ডীয় এবং ভারতবাসী প্রজার মধ্যে এরূপ ভাবে সম্বন্ধ স্থির রাখিবেন যে, একের ন্যায্য স্বার্থ এবং স্বত্ব অন্যের অন্যায্য ইচ্ছার তৃপ্তির নিমিত্ত উৎসর্গীকৃত না হইতে পারে। ভারতবাসী এবং ইংরেজ, উভয়ে উভয়ের অবলম্বনে নিজ নিজ অভাব ন্যায্যরূপে পূরণ করিয়া লইতে পারেন।

(খ) দেশের অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাদি প্রণীত হইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে সাম্রা-

জ্যিক ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় প্রজাগণ কর্তৃক মনোনীত সদস্য গৃহীত হয়।

(গ) এই সমুদয় সদস্য-সমিতিকে, বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সমিতির যে ক্ষমতা আছে, সে সমুদয় ক্ষমতা এবং তদতিরিক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের দোষ এবং ভ্রম-সংশোধনের উপায় উদ্ভাবন এবং অপনয়নের উপযোগী ক্ষমতা প্রদান করা উচিত।

জাতীয় মহাসমিতিতে প্রজাপ্রতিনিধি-সদস্য-সমিতি সম্বন্ধে বম্বে মহানগরীর অধিবেশনে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, সেই প্রস্তাবের সঙ্গে আমাদের প্রস্তাবের যে প্রভেদ আছে,সে সম্বন্ধে আমরা এক্ষণে কিছু বলিতে চাহি না। যদি ভগবান একরূপ দিন দেন যে, সেই প্রভেদের আলোচনা করাও আবশ্যক হইয়া উঠে, তবে তখন তাহার আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষের শাসন প্রণালীর যে পরিবর্ত্তন করা একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা উদারচেতা ইংরাজ মাত্রই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন। ভারত-সাম্রাজ্যের ন্যায় বিস্তৃত রাজ্যের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইতেও পাঁচ বৎসরাপেক্ষা দীর্ঘকালের আবশ্যক, কিন্তু এক রাজপ্রতিনিধি এই পাঁচ বৎসরের মধ্যেই শাসনভার অপরের হস্তে প্রদান করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। প্রজার আকাঙ্ক্ষা তিনি পূর্ণ করিবেন, সে ত দূরের কথা, সম্পূর্ণরূপে অবগতও হইতেও পারেন না।

ব্যবস্থাপক সভার প্রতি প্রজাবৃন্দের যেরূপ আস্থা, তাহার কথা আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। একরূপ অবস্থায় নিতান্ত প্রয়োজন হইলেও, প্রজারা কষ্টে অন্তঃকরণে বর্দ্ধিত হারে কর দিতে কায়েই স্বীকৃত হয় না, এবং প্রত্যেক নূতন ব্যবস্থায় প্রতি নিতান্ত সন্দিগ্ধভাবে দৃষ্টি করিয়া থাকে।

যদি ভারতবাসী প্রজারা রাজকার্য্য পরিচালনের সহযোগিতা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইত, তবে অপরিহার্য্য ব্যয়ভার বহন করিতে তাহাদের কষ্ট হইলেও, কুণ্ঠিত বা অসন্তুষ্ট হইতে পারিত না। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় যে সমুদয় পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত করা আবশ্যক, তাহা অতি সহজেই প্রবর্ত্তিত হইতে পারিত। এ সমুদয় কথা কে স্বীকার না করিবেন?

এক শ্রেণীর ইংরাজেরা বলিয়া থাকেন বটে যে, ভারতবাসী মুখে যাহা বলে, তাহাদের অন্তরের কথা তাহা নহে, ভারতবাসীরা প্রকৃত প্রস্তাবে আয়র্লণ্ডের ন্যায় "হোম-রুল" চাহিতেছে। তাঁহাদের কথা যে নিতান্ত ভিত্তিশূন্য, সে সম্বন্ধে দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। আমরা ইংরেজী-ভাষা-অনভিজ্ঞ পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত তাঁহাদের কথাতেই এই বিষয়টীর আলোচনা করিলাম।

আয়ার্লণ্ডের অবস্থা আর ভারতবর্ষের অবস্থার মধ্যে অনেক প্রভেদ, আয়ার্লণ্ডের লোকেরা ব্রিটীশ সাম্রাজ্যের প্রধান সভায় নিজদিগের প্রতিনিধি পাঠাইতেছে, রাজকার্য্যে তাহাদের মতামত প্রকাশের অধিকার আছে। এই অধিকার ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড যে পরিমাণে ভোগ করিতেছেন, আয়ার্লণ্ড সে পরিমাণে ভোগ করিতে পারিতেছে না, তাই আয়ার্লণ্ড ক্ষুণ্ণ এবং দুঃখিত। আয়ার্লণ্ড যাহা ভোগ করিতেছে, তাহাতে সে সন্তুষ্ট নহে, আইরিসগণ অধিক ভোগের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষী। আর ভারতবাসীর কোন

অধিকার নাই, তাহারা নিজের শাসনভার নিজদিগের হস্তে চাহে না, কেবল নিজদিগের সুখ দুঃখের কথা, নিজদিগের অভাব দূর করিবার উপায় প্রভৃতি, রাজা এবং রাজপ্রতিনিধির নিকট নিবেদন করিবার অধিকার চাহিতেছে। তাহারা রাজশক্তির লোপ করিতে চাহে না, রাজপ্রতিনিধির ক্ষমতা খর্ব্ব করিতে চাহে না, তাহারা নীরব লোক, গরীবের ন্যায় তাহাদের আকাঙ্ক্ষা, গরীবের ন্যায় তাহাদিগের প্রার্থনা, সুতরাং আয়ালণ্ডের দাবি আর ভারতের প্রার্থনার মধ্যে কোন সামঞ্জস্যই লক্ষিত হয় না।

তারপর আইরিস লোকের স্বভাব আর ভারতবাসীর স্বভাব কি একরূপ? এক জাতি তেজস্বী এবং কলহপ্রিয়, আর এক জাতি ধীর, কলহপ্রিয়তাহীন এবং চিরদিনের রাজভক্ত। আয়ার্লণ্ডের রাজা সামান্য কৃষকের চক্ষেও তাহার সামাজিক শক্তির প্রতিনিধি মাত্র আর ভারতবর্ষের রাজা অধিকাংশ ভারত বাসীর নিকট এখনও দেবশক্তির প্রতিকৃতি।

সিপাহী বিদ্রোহ ভারত সাম্রাজ্যে ভারত বাসীর চিরস্মরণীয় কলঙ্ক, কিন্তু যদি অপক্ষপাতী বিচারক কেহ থাকেন, অথবা কেহ ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তিনি দেখিতে পাইবেন, সে কলঙ্কের কালিমায় কোন্ জাতি কলঙ্কিত। ভারতে সেই বিদ্রোহ ভারতবর্ষের অন্তরাগ্নি প্রসূত নহে জোর করিয়া কয়েক জন ভারতবাসীকে বিদ্রোহী করা হইয়াছিল। আবার একথাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই ভারতীয় অগ্নি যে কোন কারণ প্রসূত হউক না কেন, তাহা ভারতের জলেই নির্ব্বাপিত হইয়াছিল

আয়র্লণ্ডের অবস্থায় এবং আমাদের অবস্থায় কোন সামঞ্জস্য নাই। আয়র্লণ্ডের আকাঙ্ক্ষা ও অভিলাষের সহিতও আমাদের আকাঙ্ক্ষা এবং অভিলাষের কোন প্রকার সামঞ্জস্য নাই।

আর একদল লোক বলিয়া থাকেন, ভারতবাসী জিত, ইংরাজেরা জেতা, এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ দূর করিয়া সমাবস্থা স্থাপনের চেষ্টা করাই ধৃষ্টতা। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতবাসীরা জিত এবং ইংরেজ জেতাজাতি কি না, সে তর্ক আমরা একক্ষণে উত্থাপন করিতে চাহি না। আজি যখন আমরা ইংরেজের অধীন, তখন আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করি, ইংরেজ জাতি আজি আমাদের জেতা, অথবা আর যাহা বলিলে তাঁহারা খুসী হন, তাহা আমরা বলিতে এবং স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা আমাদিগকে অসংখ্য অধিকার প্রদান করিলেও—ইংলণ্ডের ইংরেজ প্রজা যে অধিকার ভোগ করিতেছেন, তদপেক্ষা অধিকতর অধিকার প্রদান করিলেও—ইংরেজ এবং ভারতবাসীর মধ্যে যে প্রভেদ আছে, সে প্রভেদ দূর হইবে না। যদি ইংরেজ কতক পরিমাণে স্বার্থত্যাগ করিয়াও ভারতবর্ষকে প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নত করিতে অগ্রসর হন, তবে সামান্য স্বার্থত্যাগ জনিত আশু ক্ষতি মনুষ্য সমাজে বাঞ্ছিত গৌরব দ্বারা সমধিকরূপে পূর্ণ হইবে। আবার প্রত্যেক স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্তে ভারতবাসীর কৃতজ্ঞ হৃদয় যে ইংরাজ জাতির প্রতি আকৃষ্ট হইবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভারতবাসীকে আর যাহা বলিতে হয় বলিতে পার, কিন্তু অকৃতজ্ঞতা-কলঙ্কে ভারতের হৃদয় আজিও কালিমাময় হয় নাই, এবং কোন দিন হইবে না। সুতরাং ভারত-

বর্ষের উন্নতিতে ইংরাজের ঈর্ষাপরায়ণ অথবা ভীত হওয়া কেবল অদূরদর্শিতার ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আর এক দল বলেন, "আগে উপযুক্ত হও পরে চাহিও।" এই কথাটী প্রকৃত প্রস্তাবে "আগে সাঁতার শিখ পরে জলে নামিও" গোছের একটা কথা। গবর্ণমেণ্ট আপনে আপনে মাটী ফাটিয়া উৎপন্ন হয় না, ইহার গঠনে মানুষের বিদ্যা বুদ্ধি এবং চিন্তার সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। মানুষ চেষ্টা করিয়া ভাল শাসন প্রণালীকেও আরো ভাল করিতে পারে। তবে এ কথা আমরা স্বীকার করি যে, জাতির স্বভাবে কতক পরিমাণ শক্তির সৃষ্টি না হইলে, কোন নিয়মতন্ত্র শাসন প্রণালী রক্ষিত হওয়া সেই জাতির মধ্যে সম্ভবপর নহে, কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালীর শাসন-নিয়মে কেবল সম্মত হইলেই যে যথেষ্ট হইল, এরূপ মনে করিতে হইবে না, যাহাতে সেই প্রণালী কার্য্যে পরিণত হইতে পারে, যাহাতে তাহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হয়, তৎপক্ষে চেষ্টিত হওয়াই সকলের কর্ত্তব্য। সুতরাং কোন প্রণালী নির্দ্ধারণ করা যেরূপ লোকের ইচ্ছার ফল, সেইরূপ নির্দ্ধারিত প্রণালীর কৃতকার্য্য হওয়ার আবার শক্তির আবশ্যক। অতএব কতক পরিমাণ উপযুক্ততার যে প্রয়োজন, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু পক্ষান্তরে আবার দেখা আবশ্যক, কার্য্য করিতে আরম্ভ না করিলে কার্য্যের উপযুক্ত হওয়া যায় না। এই নিমিত্ত বিখ্যাত দূরদর্শী ব্যবস্থাপকগণ ব্যবস্থা দ্বারা সমাজকে একরূপ আকর্ষণ করিয়া অগ্রসর করিয়া থাকেন।

ভারতীয় সমাজে এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা অন্য দেশাপেক্ষা অনেক বেশী। ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আশা দ্বারা ভারতীয় সমাজ গঠিত। এই সমাজে একটী সাধারণ ভিত্তি, একটী সাধারণ লক্ষ্য নির্দ্ধারণ করা এবং সেই লক্ষ্যে একটী সাধারণ পথাবলম্বনে উপস্থিত হওয়া কেবল স্বতঃপ্রবৃত্ত সামাজিক শক্তি দ্বারা সম্ভবে না। ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে ব্যগ্র হইয়াছে, উপায়ের সদাসৎ স্বভাব বিচার করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে, কিন্তু লক্ষ্যের নিমিত্ত ব্যগ্রতা সকলের হৃদয়েই বসতি করে। এরূপ সময়েই শাসন-শক্তি কর্ত্তৃক ব্যবস্থা দ্বারা রুদ্ধ-পথ উন্মুক্ত হওয়া উচিত, নচেৎ গোলযোগ উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে যে এই রাজভক্ত ভারতবাসী একবার বিদ্রোহের কলঙ্ক অঙ্গে লেপন করিয়াছে, তন্নিমিত্ত আমরা তৎকালীয় ভারতশাসন-কর্ত্তৃগণকেই দায়ী মনে করি এবং ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ পুরুষবর্গও বোধ হয় তাহাদিগকে এই দায়িত্ব হইতে মুক্তি প্রদান করিবেন না।

শ্রীকালীপ্রসন্ন দত্ত।

আরঙ্গজীবের রাজনীতি।

অনন্ত বাধা বিপত্তি, কূট-বুদ্ধির শাণিত অসিতে কর্ত্তন করিয়া আরঙ্গজীব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। সন্দেহ তাঁহার প্রধান মন্ত্রী এবং অসিই তাঁহার প্রধান সহায় ছিল। সন্দিগ্ধ-মনা আরঙ্গজীবের অসি পুত্র-হত্যা, ভ্রাতৃ-বধ এবং মিত্র সংহারেও কুণ্ঠিত হয় না। সাম্রাজ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় তিনি পরমারাধ্য জন্মদাতাকেও কারাগারে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

আরঙ্গজীব যদি বুঝিতেন যে, প্রজা-পুঞ্জের প্রীতি এবং অনুরাগই রাজ্যের অটল ভিত্তি, যদি বুঝিতে পারিতেন, নৈতিক বলের সুদৃঢ় আশ্রয় ব্যতীত কেবল বাহু-বলের উপর নির্ভর করিলে সে রাজার রাজত্ব কখনই স্থায়ী হয় না, তাহা হইলে তদীয় বংশধরগণ এত সহসা কখনই দিল্লীর ময়ূরাসন হইতে বিচ্যুত হইতেন না। যে অভেদ নীতির বলে মহামনা আকবর, ভারতবর্ষে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যে সুনীতির বলে রণ-নিপুণ মহা অভিমানী, স্বাবলম্বী রাজপুত জাতির হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া তাহাদিগকেও আয়ত্তাধীন করিয়াছিলেন, আরঙ্গজীব কর্ত্তৃক সেই সর্ব্ব-মঙ্গলপ্রদ অভেদ-নীতি অবহেলিত হইল। মহানর্থকর জিজিয়া করই মোগল-প্রভুত্ব বিলোপের মূলীভূত কারণ।

আর্য্যধর্ম্মের অবমাননা এবং শূন্য রাজ-কোষ পরিপূরণার্থ সম্রাট কর্ত্তৃক মুণ্ড-কর সংস্থাপিত হইল। আর্য্যগণ স্বীয় ধর্ম্মের অবমাননায় হৃদয়ে নিদারুণ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। এই কর-জনিত অত্যাচার জীবন্ত প্রেত-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ভারতের গৃহে গৃহে বিচরণ করিতে লাগিল। হিন্দু ও মুসলমানের নির্ব্বাপিত-প্রায় বিদ্বেষানল পুনঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। জননী জন্ম-ভূমির কাতর পরিবেদনে উত্তেজিত হইয়া মহারাষ্ট্র বীর শিবজী, রাজপুত বীর রাণা রাজসিংহ প্রভৃতি সমর-প্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হই-লেন। এই সকল মহাবীরগণের বীরাভি-নয়ে দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত কম্পিত হইতে লাগিল। মহাবীর শিবজীর পরবর্ত্তীগণ লুণ্ঠন-ব্যবসায়ী না হইয়া যদি স্বীয় অধিকৃত প্রদেশের দৃঢ়তা সম্পাদনে মনোনিবেশ করিতেন, দুরাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী না হইয়া উৎকৃষ্ট রাজ-নীতি পরিচালনে প্রকৃতি-পুঞ্জের কল্যাণ-সাধনে দৃঢ়-ব্রত হইতেন, তাহা হইলে হয়ত ভারত-বক্ষে আমরা ভিন্ন-বর্ণের পতাকা উড্ডীয়মান দেখিতাম। রাজনীতি-বিশারদ রণবীর রাণা রাজসিংহ, মুণ্ড-কর সংস্থাপিত হইলে সম্রাট আরঙ্গজীব সদনে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমরা সেই সুদীর্ঘ পত্রের শেষাংশ রাজস্থান হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

—"শোচনীয় রূপে দৈন্যদশাগ্রস্ত প্রজা-পুঞ্জের নিকট হইতে গুরুতর কর-সংগ্রহে যে রাজা নিজ ক্ষমতা পরিচালনায় মহা ব্যস্ত, সে রাজার সম্মান সংরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? এই পরিতাপজনক সময়ে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম প্রান্ত পর্য্যন্ত বিঘোষিত হইতেছে যে, হিন্দুস্থানের সম্রাট

দীন হিন্দুধর্ম্মাচারীদিগের প্রতি বিদ্বেষান্বিত হইয়া ব্রাহ্মণ, সানোরা, যোগী, বৈরাগী, সন্ন্যাসীগণের নিকট হইতেও রাজকর আদায় করিবেন; সুপ্রতিষ্ঠিত তৈমুরীয় বংশের মহৎ গৌরবের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনে নির্জ্জনবাসী নিরীহ সন্ন্যাসীর শিরে কর-ভার অর্পণে সমুদ্যোগী। যদি ধর্ম্ম-পুস্তকের উপরে আপনার কিছুমাত্র বিশ্বাস সংন্যস্ত থাকে, তাহা হইলে তৎপাঠেই বিলক্ষণ অনুধাবন করিতে পারিবেন যে, জগদীশ্বর কেবল একমাত্র মুসলমান জাতির নহে, সমগ্র মানব মণ্ডলীরই দয়াময় পিতা। তাঁহার নিকট মুসলমান এবং পৌত্তলিক, উভয়েই সমান। তাঁহার বিধানেই বর্ণ বিভেদের সৃষ্টি, তিনিই জীবের জীবন-রক্ষক। আপনাদিগের মস্‌জিদে তাঁহার নামে যেরূপ উপাসনা সংসাধিত হয়, শঙ্খ ঘণ্টা-নিনাদিত হিন্দুদিগের দেবমন্দিরেও তিনি সেই মত পূজা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অন্য জাতির ধর্ম্ম এবং ধর্ম্ম্য আচারের প্রতি ঘৃণা এবং নিন্দাবাদে সর্ব্ব-শক্তিমানের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ প্রকাশ পায় মাত্র। আমরা কোন এক খানি চিত্রকে বিক্রীত করিয়া ফেলিলে, স্বভাবতঃই চিত্রকরের বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়ি; এবং কবি যথার্থই বলিয়াছেন যে, সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের বিভিন্ন কার্য্যের সমালোচন বা অনুযোগে প্রবৃত্ত হইও না।

সাধারণ্যে হিন্দুদিগের নিকট হইতে আপনি যে কর-সংগ্রহে সমুদ্যোগী, তাহা সম্পূর্ণ ন্যায়-বিরুদ্ধ, সুশাসন নীতির একেবারেই বিপরীত, কারণ, ইহা দ্বারা সাম্রাজ্য নির্ধন হইয়া পড়িবে। অপর, এই মুণ্ড-কর সম্পূর্ণ অভিনব এবং হিন্দুস্থানের বিধানভঙ্গকারী। কিন্তু যদি স্বধর্ম্মানুরাগিতা দ্বারাই আপনি এরূপ ব্যবস্থা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সাম্যের নিয়মানুসারে হিন্দুদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপে সম্মানিত রামসিংহের নিকট হইতে সর্ব্বাগ্রে এই কর সংগ্রহ করা পরিকর্ত্তব্য। তৎপর আপনার এই সুভাকাঙ্ক্ষীর প্রতি সেই করভার অর্পিত হউক, এ সূত্রে ইহার নিকট হইতে আপনাকে আরও অল্প প্রতি-রোধ প্রাপ্ত হইতে হইবে। পিপীলিকা এবং মক্ষিকা উৎপীড়ন, বীর এবং সাধুহৃদয়ের অনুপযুক্ত। আপনার সাম্রাজ্যের মন্ত্রিগণ মহিমাবরকে সরলতা এবং সম্মানের প্রণালী শিক্ষাদানে এরূপ উদাসীন হইবেন, ইহা নিতান্ত পক্ষেই আশ্চর্য্যজনক।"

এই রাজপুতোচিত বীরত্বময় রাজনীতি-পূর্ণ পত্র, আরঙ্গজীবের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি আর ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া অবিলম্বে বীরসিংহ রাজসিংহের বিরুদ্ধে বিপুল সেনা সমবেত করিয়া অভি-যানোদ্যোগ করিলেন। যথা সময়ে মিবার ক্ষেত্রে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। এ সমরের পরিণাম ইতিহাসজ্ঞ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

পরাজিত আরঙ্গজীব ক্ষুণ্ণমনে, ভগ্নহৃদয়ে দিল্লীনগরী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহাতেও তাঁহার শিক্ষালাভ হইল না; তিনি সেই পাপময় সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন না। মত্ত মাতঙ্গদলনে অসমর্থ হইয়া মক্ষিকা-পীড়নে হৃদয়ের ক্রোধানল প্রশমিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার হিন্দুপ্রজাগণ ভয়ঙ্কর রূপে নিগৃহীত, যথেচ্ছাচারের মুখে নিষ্পে-ষিত এবং ভীষণতম উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতে লাগিল।